রাজবাড়ী জেলাঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য

এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ

২০০০

GIFT

382731

Dhaka University Library
382731

তাপস কুমার সরকার

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী জেলাঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য

এম. ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০০০

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ কে. এম. মোহসীন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

তাপস কুমার সরকার
গবেষক
তাপস কুমার সরকার
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মুখবন্ধ

একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় আঞ্চলিক ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা যেতে পারে আঞ্চলিক ইতিহাস ছাড়া জাতীয় ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। আঞ্চলিক ইতিহাসে একটি অঞ্চলের বিস্তৃত বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে।

ইতিহাস বিস্মৃত কোন জাতি মর্যাদাবান জাতি হিসেবে গণিগণিত হতে পারে না। যে জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস নেই সে জাতি মাথা উঁচু করে বিশ্ব সভায় দাঁড়াতে পারেনা। কেননা ইতিহাস জাতির অতীত কালের রেকর্ড। প্রামাণিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার মাধ্যমেই বর্তমান ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নির্মাণ করা যেতে পারে। তাই ইতিহাস সচেতনতা একটি জাতির জন্য অপরিহার্য। আর জাতীয় ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাস।

382731

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত একটি দেশের আঞ্চলিক নিজস্বতা থাকতে পারে। এই নিজস্বতা বা স্বকীয়তা আঞ্চলিক ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে আনা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত রয়েছে। যা স্বকীয় বৈশিষ্টে সমুজ্জল। অথবা বান্দরবন, রাঙ্গামাটি বা খাগড়াছড়ি-যা প্রধানত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, এখানে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা রয়েছে। এই সমস্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায়ই এই বিষয় সমূহ সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা সম্ভব।

নদ-নদী অধ্যুষিত আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উপর দিয়ে অসংখ্য নদ-নদী বয়ে গেছে। সু-প্রাচীন কাল থেকে উপমহাদেশে নদী প্রবাহ বিদ্যমান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা বা গঙ্গা অত্যন্ত প্রাচীন নদী। নদ-নদীর আধিক্যহেতু বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে নানাভাবে। বস্তুতপক্ষে, বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মাণে নদীর প্রভাব ব্যাপক। নদীকে আশ্রয় করে এদেশের কোন কোন অঞ্চলের সংস্কৃতি হয়েছে বেগবান। জারী, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গান নদী পথে যাওয়ার সময় গীত হয়। কখনও নদী অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। অনেক সমৃদ্ধ জনপদ আপন গর্ভে গ্রাস করে বিলীন করে দিয়েছে। বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী অনেক অঞ্চলে এজাতীয় ঘটনা ঘটেছে। নতুন করে জেগে ওঠা নদী তীরে বসতি স্থাপিত হয়েছে। গড়ে উঠেছে নতুন জনপদ। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এই ব্যাপক উত্থান-পতন আঞ্চলিক ইতিহাসে বিস্তারিত তুলে আনা সম্ভব।

আঞ্চলিক ইতিহাসে সাধারণতঃ-একটি অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান, পরিবেশ, নামকরণ, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ, জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠিত কৃতি সন্তান --- যাঁরা জাতি গঠনে অবদান রেখেছেন, দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রেখেছেন- তাঁদের পরিচয় সম্যক তুলে ধরা হয়। আঞ্চলিক ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধে ঐ অঞ্চলের ত্যাগ ও

Dhaka University Institutional Repository

অবদান তুলে ধরা সম্ভবপর। নদ-নদী, লোক সংখ্যা, প্রশাসনিক ইতিহাস, পৌরসভা, জেলাবোর্ড ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি সম্পদ, যাতায়াত ব্যবস্থা--সড়ক, রেল, নদীপথ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সন্নিবেশিত হয়।

আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা শ্রমসাধ্য কাজ। ইতিহাস রচনার উপাদান ও তথ্যপঞ্জি সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে ওঠে। কারণ সঠিক সংরক্ষণের অভাবে অনেক ঐতিহাসিক গুন সম্পন্ন দুষ্প্রাপ্য দলিল বিনষ্ট হয়ে যায়। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমণ করতে হয়। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও বিচার বিশ্লেষণের জন্য যেতে হয় নানাজনের কাছে। ইতিহাসের সূত্র অনুসন্ধানে অনেকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয়।

এ অভিসন্দর্ভে সাতটি অধ্যায় আছে---প্রথম অধ্যায় - ভৌগলিক অবস্থান, পরিবেশ ও নামকরণ। বিভিন্ন সময়ে যেভাবে জেলার সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে এবং রাজবাড়ী নামকরণ নিয়ে যে বিতর্ক ছিল এ অধ্যায়ে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ। জেলায় প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে যেন কতগুলো স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমে গোয়ালন্দ, তারপর রাজবাড়ী, বালিয়াকান্দি শেষে পাংশা থানার স্থানসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়- রাজনৈতিক ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব। রাজবাড়ী জেলা বরাবরই রাজনীতি সচেতন। এ অধ্যায়ে জেলার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস ও জেলার প্রয়াত প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়- প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এ অধ্যায়ে প্রশাসনিক বিবর্তন এবং জেলার বর্তমান প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগসমূহ ও কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়- শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জেলার অবস্থা এবং এর সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবদান এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়- অর্থনৈতিক অবস্থা। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জেলার সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র এ অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়- মুক্তিযুদ্ধে রাজবাড়ী জেলা। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিসহ এ যুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে জেলার অধিবাসীদের ত্যাগ ও অবদান এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। ভুল বোঝাবুঝি পরিহার করার লক্ষ্যে এ অভিসন্দর্ভে ব্যক্তিত্ব হিসেবে শুধুমাত্র জেলার প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডঃ কে, এম, মোহসীনের তত্ত্বাবধানে আমি এই অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রয়াস পেয়েছি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমার কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন। গবেষনার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি আমাকে নিরলসভাবে যে সাহায্য এবং সহযোগিতা দান করেছেন তার ফলেই আমার অভিসন্দর্ভটি বর্তমান রূপ পেয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

প্রখ্যাত চিকিৎসক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান, ঢাকাস্থ রাজবাড়ী জেলা সমিতির সভাপতি ডাঃ কে, এম, এইচ,

Dhaka University Institutional Repository

এস, সিরাজুল হক এ গবেষণার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন এ জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ গবেষণা কাজের শেষ দিকে ছয় মাস ঢাকায় থাকার জন্য রাজবাড়ী জেলা সমিতির পক্ষ থেকে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আমি এ আর্থিক সাহায্যের জন্য সমিতির সভাপতি ও কার্যকরী পরিষদের নিকট কৃতজ্ঞ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের মাননীয় সদস্য জনাব ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁকে আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। রাজবাড়ী জেলা বারের বর্তমান সভাপতি বাবু চিত্তরঞ্জন গুহ, জেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী ইরাদত আলী, রাজা সূর্যকুমারের উত্তরসূরি বাবু সমীরেন্দ্র মোহন গুহ রায় আমাকে তথ্যগত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রাজবাড়ী জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ, জেলা বিসিক কর্তৃপক্ষ, জেলা তথ্য অফিস কর্তৃপক্ষ, রেল কর্তৃপক্ষ, জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্তৃপক্ষ, জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ, জেলা শিশু একাডেমী, পৌরসভা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-জেলা ইউনিট কমান্ড কাউন্সিল, সরকারী বালক উচচ বিদ্যালয়- রাজবাড়ী, বালিয়াকান্দি কলেজ- বালিয়াকান্দি, হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ উচচ বিদ্যালয়- পাংশা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ তথ্য প্রদানে যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের কাছে আমি ঋণী।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গণ গ্রন্থাগার, ঢাকাস্থ ভারতীয় দুতাবাস গ্রন্থাগার ও রাজবাড়ী জেলা গণ গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যাঁরা আমাকে এ গ্রন্থাগারগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। থিসিসটি যত্ন সহকারে কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন "ওপিনিয়ন কম্পিউটার সিস্টেম" এর মোহাম্মদ আব্দুল হাসেম ও মোঃ জুলফিকার আলী ফিরোজ তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

382731

তাপস কুমার সরকার

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
জুলাই, ২০০০ ইং।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	I
সূচীপত্র	IV
সারণী সূচী	V
প্রথম অধ্যায়----ভৌগলিক অবস্থান, পরিবেশ ও নামকরণ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়---প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ	২০
তৃতীয় অধ্যায়---রাজনৈতিক ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব	৪২
চতুর্থ অধ্যায়----প্রশাসনিক ব্যবস্থা	৬০
পঞ্চম অধ্যায়---- শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি	৮২
ষষ্ঠ অধ্যায় --- অর্থনৈতিক অবস্থা	১১১
সপ্তম অধ্যায়----মুক্তিযুদ্ধে রাজবাড়ী জেলা	১৩১
উপসংহার	১৯৬
পরিশিষ্ট	১৯৭
গ্রন্থপঞ্জী	২৩০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সূচী

এক নম্বর সারণী -স্তম্ভ এবং লেখ চিত্রে গড় বৃষ্টিপাত এবং গড় সর্বোচ্চ, গড় সর্বনিম্ন ও গড় তাপমাত্রা (রাজবাড়ী জেলা)-২

দুই নম্বর সারণী-মাসওয়ারী গড় সর্বোচ্চ ও গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস) এবং বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)(গোয়ালন্দ থানা)-৩

তিন নম্বর সারণী- মাসওয়ারী গড় বৃষ্টিপাত এবং গড় সর্বোচ্চ, গড় সর্বনিম্ন ও গড় তাপমাত্রা(ডিগ্রী সেলসিয়াস) এবং বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার) (বালিয়াকান্দিথানা) -৪

চার নম্বর সারণী- রাজবাড়ী জেলার থানা ভিত্তিক আয়তন ও জনসংখ্যা -৬

পাঁচ নম্বর সারণী- প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব (১৯৫১-১৯৯১) -৬

ছয় নম্বর সারণী - ১৯৬১ সালে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমায় জনসংখ্যার সার্বিক চিত্র -৭

সাত নম্বর সারণী- ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে রাজবাড়ী জেলার ধর্মীয় জনসংখ্যা -৮

আট নম্বর সারণী- ১৯৫১ থেকে ১৯৯১সাল পর্যন্ত জেলার বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার -৮

নয় নম্বর সারণী - জেলার শহর ও গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যা -৯

দশ নম্বর সারণী- ১৯৯১সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজবাড়ী জেলায় ৫(পাঁচ) বছর এবং তদুর্ধ বয়সের মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্র -৮৯

এগার নম্বর সারণী - জেলার পাঁচ বছর বা তদুর্ধ বয়সের মানুষের শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষার বিবরণ -৯০

বার নম্বর সারণী - জেলার চার বছর এবং তদুর্ধ বয়সের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতি -৯০

তের নম্বর সারণী - জেলার পাঁচ থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্র- ছাত্রীদের বয়সের গ্রুপ ভিত্তিক স্কুলে উপস্থিতি ৯১

চৌদ্দ নম্বর সারণী- জেলার অধিবাসীদের বাড়ীর ধরন এবং শতকরা হার -১১৩

পনর নম্বর সারণী - জেলার জনগণের বাড়ীর প্রধান ঘর অথবা ওয়ালের নির্মাণ সামগ্রী, বাড়ীর সংখ্যা এবং শতকরা হার -১১৪

ষোল নম্বর সারণী- জেলার জনগণের বাড়ীর প্রধান ঘর অথবা ছাদের নির্মাণ সামগ্রী, বাড়ীর সংখ্যা এবং শতকরা হার-১১৪

সতের নম্বর সারণী- রাজবাড়ী জেলার অধিবাসীদের বাড়ীর হিসেবে আয়ের প্রধান উৎস, বাড়ীর সংখ্যা এবং শতকরা হার -১১৪

আঠার নম্বর সারণী- জেলার বিদ্যুৎ সংযোগযুক্ত ও সংযোগবিহীন বাড়ীর সংখ্যা এবং শতকরা হার -১১৫

উনিশ নম্বর সারণী- জেলার দ্বি -একক বিশিষ্ট বাড়ীর ধরন -১১৫

বিশ নম্বর সারণী- জেলার ৫ (পাঁচ) বছর বা তদুর্ধ বয়সের মানুষের প্রধান আর্থিক কাজের ক্ষেত্র এবং শতকরা হার- ১১৫

একুশ নম্বর সারণী- বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার কিছু নিত্য- প্রয়োজনীয় দ্রব্য- সামগ্রীর মূল্য তালিকা (১৮৬৬-১৯১১)-১১৮

বাইশ নম্বর সারণী বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার কিছু নিত্য- প্রয়োজনীয় দ্রব্য- সামগ্রীর মূল্য তালিকা (১৯৩৯-১৯৪৩)-১১৯

তেইশ নম্বর সারণী- বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার কিছু নিত্য- প্রয়োজনীয় দ্রব্য- সামগ্রীর মূল্য তালিকা(১৯৬৩)-১১৯

Dhaka University Institutional Repository

চবিবল নম্বর সারণী- ২০০০ সালে জেলার কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য- সামগ্রীর মূল্য তালিকা -১১৯
পঁচিশ নম্বর সারণী- জেলার (স্থান ও লিঙ্গ ভিত্তিক) অর্থনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা -১২০
ছাবিবশ নম্বর সারণী- বর্তমানে বিলুপ্ত জেলার মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম, স্থান ও অন্যান্য তথ্যাবলী-১২১
সাতাশ নম্বর সারণী- রাজবাড়ী জেলার সদর থানার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রের তালিকা-১২৩
আটাশ নম্বর সারণী-জেলার গোয়ালন্দ থানার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রের তালিকা-১২৪
উনত্রিশ নম্বর সারণী-জেলার বালিয়াকান্দি থানার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রের তালিকা-১২৪
ত্রিশ নম্বর সারণী- জেলার পাংশা থানার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রের তালিকা -১২৪
একত্রিশ নম্বর সারণী -জেলা সদরে অবস্থিত বিসিক শিল্প নগরীর প্লটের বিবরণ -১২৭
বত্রিশ নম্বর সারণী- শিল্প নগরীর পাওনা আদায় সংক্রান্ত তথ্য -১২৭
তেত্রিশ নম্বর সারণী- শিল্প নগরীর জনশক্তি সংক্রান্ত তথ্য -১২৮
চৌত্রিশ নম্বর সারণী- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথা পিছু আয়ের বৈষম্য (টাকার অঙ্কে)-১৩৬
পঁয়ত্রিশ নম্বর সারণী- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে নিত্য- প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহারে বৈষম্য (১৯৫১-১৯৬৪ সাল) -১৩৮
ছত্রিশ নম্বর সারণী- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামাজিক ও বাহ্য অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বৈষম্য-১৪০
সাঁইত্রিশ নম্বর সারণী- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য -১৪০
আটত্রিশ নম্বর সারণী- পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রের আঞ্চলিক উৎপত্তিস্থল- শতকরা কতজন বাঙালী -১৪২
উনচল্লিশ নম্বর সারণী- পাকিস্তানে আঞ্চলিক ব্যয় ১৯৫০/৫৭-১৯৬০/৭০ (দশ লাখ টাকার হিসেবে) -১৪৬
চল্লিশ নম্বর সারণী- পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর ১৯৪৮/৪৯-১৯৬৮/৬৯ (দশ লাখ টাকার হিসেবে)-১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভৌগলিক অবস্থান, পরিবেশ ও নামকরণঃ-

রাজবাড়ী জেলা ঢাকা বিভাগের পশ্চিমাংশে, ২২°৪০´ এবং ২৩°৫০´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯°১৯এবং ৯০°৪০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৪৬ ফুট উপরে অবস্থিত। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত রাজবাড়ী জেলা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি মৌসুম সহজে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণতঃ জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শতকরা ৮৬ ভাগ বৃষ্টিপাত এ সময় হয়। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বরে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারিতে। এমৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক, কখনো কখনো সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। মার্চ থেকে জুন এ চার মাস গ্রীষ্ম বা প্রাক বর্ষাকাল বলে গণ্য। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মার্চ ও এপ্রিলে মাঝে মাঝে বর্ষণ সহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে "কালবৈশাখী" বলা হয়। এ সময় কোন কোন বজ্র শিলা বৃষ্টিও হয়ে থাকে।

এ জেলায় ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে নিম্ন তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়, যার গড় প্রায় ১৮.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। চরম উষ্ণ তাপমাত্রা এপ্রিল/মে মাসে ৩৬.১ ডিগ্রী এবং চরমশীতল তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসে ৯.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে। শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত ৬৫ মি. মি. যা এ সময়ে বাষ্পীভবনের পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। দীর্ঘ মেয়াদি পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় যে, শীত মৌসুমে বছরের চার/পাঁচ মাস প্রায় শুষ্ক থাকে। আবার বর্ষা মৌসুমে কোন কোন মাসে মাত্রাধিক বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের হার ৭৫ মিলিমিটারের কম বলে এ মাসগুলোকে শুষ্ক মাস বলা হয়।[১]

১। ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (গোয়ালন্দ থানা), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩।

Dhaka University Institutional Repository

তন্ত এবং লেখচিত্র গড় বৃষ্টিপাত এবং গড় সর্বোচ্চ, গড় সর্বনিম্ন ও গড় তাপমাত্রা (রাজবাড়ী জেলা)

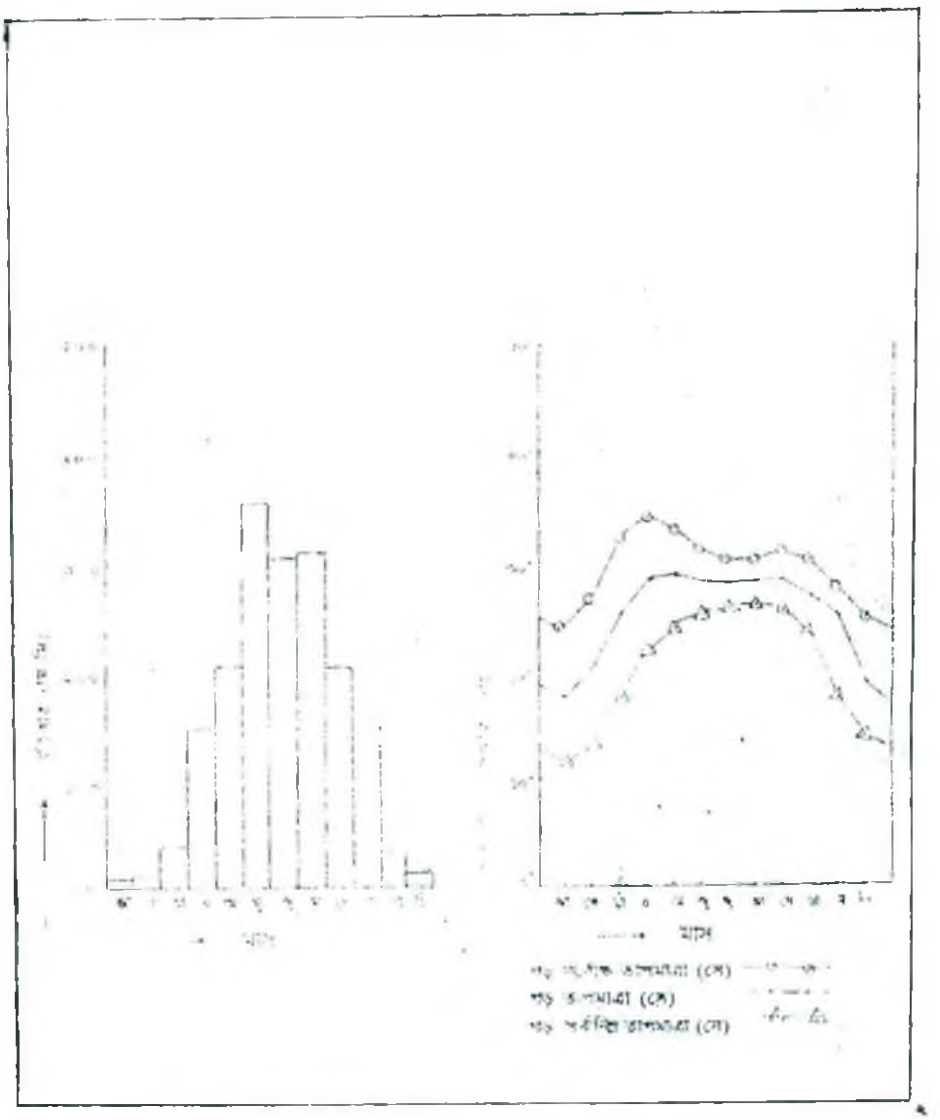

সারণী-১

---

২ । <u>ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা,</u> মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

মাসওয়ারী গড় সর্বোচ্চ ও গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস) [গোয়ালন্দ থানা]										
সাল	১৯৯১		১৯৯২		১৯৯৩		১৯৯৪		১৯৯৫	
মাস	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
জানুয়ারি	২৪.০	১২.৪	২৪.০	১১.৩	২৪.৩	১৯.৪	৩২.০	১২.৯	২৪১.৭৪	১১১.৭৪
ফেব্রুয়ারি	২.২	১৬.১	২৫.৮	১৭.২	২৮.৪	১৬.১	২৬.০	১৪.২	২৭২.১৭	১৪৬.২১
মার্চ	৩০.৮	২০.৪	৩৩.২	১৯.৮	৩১.০	১৭.৭	৩২.০	২৪.৪	৩৩০.৩২	১৮৫.১৬
এপ্রিল	৩৪.১	২৩.৩	৩৭.২	২৩.৪	৩৩.৬	২১.৬	৩৪.০	২২.৭	৩৬৮.৩	২৪২.৯
মে	৩২.৮	২৩.২	৩৩.০	২২.৯	৩২.০	২২.৫	৩০.৪	২৪.৬	৩৪৬.১৬	২৫৯.৩৫
জুন	৩০.০	২৫.২	৩৩.৩	২৪.৮	৩১.৭	২৪.৩	৩২.০	২৫.৬	৩২.৩৬	২৬.৪২
জুলাই	৩১.২	২৬.০	৩২.২	২৪.৪	৩১.৪	২৪.০	৩১.৭	২৬.১	৩১.২১	২৫.৭৩
আগষ্ট	৩১.৫	২৫.৬	৩১.৫	২৫.০	৩০.৭	২৪.২	৩১.৪	২৬.১	৩১.৮৮	২৬.৩৩
সেপ্টেম্বর	৩১.০	২৫.২	৩১.৭	২৪.৫	৩১.১	২৪.৬	৩২.২	২৫.৫	৩১.৮৪	২৬.১৩
অক্টোম্বর	৩১.১	২৬.৯	৩২.২	২২.৫	৩১.৫	২৬.৮	৩২.২	২০.৬	৩১.৬৯	২৪.৫৯
নভেম্বর	২৮.৪	১৭.৮	২৯.৪	১৭.২	২৯.১	২৫.৭	২৯.০	১৯.৩	২৮.৫৫	১৯.৯৫
ডিসেম্বর	২৪.৭	১২.৯	৩৫.৭	১১.৩	২৬.৬	১৪.৭	২৬.৬	১৩.১	২৫.৯৬	১৪.০৯

মাসওয়ারী বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)					
সাল/মাস	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫
জানুয়ারি	২৪	৯	৪	০	১৪
ফেব্রুয়ারি	৫৮	৬	৬	৩০	৬
মার্চ	৫৯	০	৫	৪৪	০
এপ্রিল	১০০	১	১৮	১৩	৪৪
মে	২৬৫	২২	১৩	১৯৯	২৮
জুন	১২	২৪	৫৩	২০৭	৩৯৫
জুলাই	৩০৫	৩০	২২	২০৩	৫০৭
আগষ্ট	৪৮৬	২১	৩৫	২৪৭	৩৬৮
সেপ্টেম্বর	৩৬০	১০	৪১	৩	২৫৬
অক্টোম্বর	৩৬৬	১২	২৮০	৫৭	৪২০
নভেম্বর	১	০	০	২	১৭
ডিসেম্বর	১০৩	০	০	০	২
বাৎসরিক	২১৩৯	১৩৫	৪৭৭	১০৯৮	২১৩৭

সারণী-২

৩। ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (গোয়ালন্দ থানা) (প্রথম অধ্যায়), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মাসওয়ারী গড় সর্বোচ্চ ও গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস) বালিয়াকান্দি থানা										
সাল	১৯৮৭		১৯৮৮		১৯৮৯		১৯৯০		১৯৯১	
মাস	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
জানুয়ারি	২৫.৮	১২.৪	২৫.৯	১৩.০	২৩.৬	১১.১	২৫.৪	১২.৯	২৪.০	১২.৪
ফেব্রুয়ারি	২৯.৪	১৫.৩	২৯.৪	১৫.৭	২৭.৯	১৪.৭	২৭.৮	১৬.৩	২৯.২	১৬.১
মার্চ	৩৩.১	১৯.৫	৩২.২	১৯.৭	৩২.৭	১৮.৬	২৯.২	১৯.০	৩২.৮	২০.৭
এপ্রিল	৩৩.৮	২২.৭	৩৫.২	২৪.১	৩৫.৭	২৫.৯	৩২.১	২২.৩	৩৪.১	২৩.৩
মে	৩৫.৩	২৪.৬	২৩.৯	২৬.১	৩৩.০	২৬.২	৩২.৭	২৪.০	৩২.৮	২৩.২
জুন	৩৩.০	২৬.৪	৩১.৬	২৫.৫	৩১.৮	২৬.২	৩২.৩	২৬.৩	৩১.৮	২৫.২
জুলাই	৩১.২	২৫.৬	৩১.৩	২৬.৭	৩১.৭	২৫.৪	৩১.১	২৫.৫	৩১.৬	২৬.০
আগষ্ট	৩১.২	২৬.৭	৩০.৫	২৬.৬	৩২.০	২৬.১	৩১.৯	২৬.১	৩১.৫	২৫.৮
সেপ্টেম্বর	৩১.৭	২৬.৮	৩০.২	২৬.৬	৩১.৯	২৫.৫	৩১.৯	২৫.৬	৩১.০	২৫.২
অক্টোম্বর	৩১.৬	২৫.০	৩১.১	২৩.৮	৩১.৪	২৪.৩	৩০.০	২২.৯	৩১.১	২৩.৯
নভেম্বর	২৯.৩	১৯.৯	২৯.২	১৯.৮	২৯.৩	১৮.৫	২৯.৮	২০.৪	২৮.৪	১৭.৮
ডিসেম্বর	২৬.৫	১৪.৭	২৬.০	১৬.০	২৪.০	১২.৯	২৬.৩	১৪.২	২৪.৭	১২.৯

মাসওয়ারী বৃষ্টিপাত (মি.মি.)

সাল	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১
মাস					
জানুয়ারি	০	০	০	০	২৭
ফেব্রুয়ারি	৮	৩৪	৫	৩৬	৫৮
মার্চ	৩৮	৯৮	৫	২১৫	৫৯
এপ্রিল	১০৫	১৩৩	১২৪	১৫৭	১০৩
মে	১৫৭	৫১০	৩২৮	৩১৫	২৬৫
জুন	৩৮৪	৪৬৮	২৬০	২৮৮	৩২২
জুলাই	৩৫১	২৪১	৩৯৩	৪০৩	৩০৫
আগষ্ট	৪০৯	২৪৩	৯৫	১৪০	১৮৬
সেপ্টেম্বর	৪৫৬	১২৮	২৪১	১৮৯	৩৬০
অক্টোম্বর	৪৭	১৬৯	১৭৮	১৬৮	৩৫০
নভেম্বর	৩	১৪৮	০	৪৮	১
ডিসেম্বর	২৩	০	৯	৪	১০৩
বাৎসরিক	১৯৮১	২১৭২	১৬৩৮	১৯৬৩	২১৩৯

সারণী-৩

৪ । ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (বালিয়াকান্দি থানা) (প্রথম অধ্যায়), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে যে এলাকা রাজবাড়ী জেলা হিসেবে পরিচিত, এটি পূর্বতন ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমা ছিল। ১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ এটি জেলায় রূপান্তরিত হয়। রাজবাড়ী জেলায় চারটি থানা-গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী (সদর), বালিয়াকান্দি এবং পাংশা। জেলায় ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা বিয়াল্লিশ, পৌরসভা দুইটি-রাজবাড়ী ও পাংশা এবং গ্রামের সংখ্যা ১০৩৬ টি। গোয়ালন্দ থানায় চারটি, রাজবাড়ী (সদর) থানায় চৌদ্দটি, বালিয়াকান্দি থানায় সাতটি এবং পাংশা থানায় সতেরটি ইউনিয়ন। জেলার মোট আয়তন ১১১৮.৮০বর্গকিলোমিটার (৪৩১.৯৭ বর্গমাইল)। এর মধ্যে ১০৭.৬৪ কিলোমিটার নদী।

সীমাঃ- রাজবাড়ী জেলার উত্তরে পাবনা, পশ্চিমে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলা, দক্ষিণে ফরিদপুর ও মাগুরা জেলা, পূর্বে মানিকগঞ্জ জেলা। রাজবাড়ী জেলার উত্তর ও পূর্বদিক পদ্মা নদী দ্বারা বেষ্টিত। প্রকৃতপক্ষে পদ্মা নদী রাজবাড়ী জেলাকে উত্তরে পাবনা এবং পূর্বে মানিকগঞ্জ জেলা থেকে পৃথক করেছে।

বিভিন্ন সময়ে সীমানার পরিবর্তনঃ-১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা এলাকা অর্থাৎ বর্তমান রাজবাড়ী জেলা যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮০৭ সালে পাংশা থানা যশোহর থেকে ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮১২ সালে, চন্দনা (মধুমতি) নদীকে ফরিদপুর জেলার পশ্চিম সীমা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৯ সালে পাবনার অংশ হিসেবে পরিগণিত পাংশা, বালিয়াকান্দি ও খোকসা এই তিনটি থানা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র "কমরকলি" অর্থাৎ (কুষ্টিয়ার কুমারখালি) মহকুমা গঠন করা হয়। ১৮৭১ সালে কুমারখালি নদীয়ার (বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের একটি জেলা) কুষ্টিয়া মহকুমার সাথে সংযুক্ত করা হয়। গোয়ালন্দ মহকুমা স্থাপিত হয় ১৮৭১ সালে। ১৮৭১ সালের পহেলা মে পাবনা থেকে পাংশা থানা ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।[৫]

জনসংখ্যাঃ-১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজবাড়ী জেলার মোট জনসংখ্যা ৮,৩৫,১৭৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৪,৩১,৩৫৯ ও মহিলা ৪,০৩,৮১৪ জন। পল্লী অঞ্চলের জনসংখ্যা ৭,৪৯,৩৮২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩,৮৬,৭০০ ও মহিলা ৩,৬২,৬৮২ জন। শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা ৮৫,৭৯১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৪৪,৬৫৯ এবং ৪১,১৩২জন মহিলা। ১৯৮১ সালে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমার জনসংখ্যা ছিল ৬,৭৮,২০৫ (পুরুষ ৩,৪৯,৩৯৫ ও মহিলা ৩,২৮,৮১০ জন)। ১৯৬১ সালে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমার জনসংখ্যা ছিল ৪,৩৪,৪০৭ জন (পুরুষ ২,২৬,১৯১ এবং মহিলা ২,০৪,২১৬ জন)। ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে গোয়ালন্দ মহকুমায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় নয় শতাংশ হারে কিন্তু পরবর্তী দশকে ৯.২ শতাংশ হারে মৃত্যু ঘটে। ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা স্থির থাকে। ১৯২১ সালের শেষে জনসংখ্যা ১.৩ শতাংশ হারে কমে যায়। এর কারণ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নদী শুকিয়ে যাওয়া এবং মাটির উর্বরতা হ্রাস পাওয়া, এমনকি ম্যালেরিয়া এবং কলেরা রোগের মহামারীর কারণেও এমনটি ঘটে।

৫। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur, 1977,page:-1-2.

Dhaka University Institutional Repository

১৯২১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে গোয়ালন্দ মহকুমার জনসংখ্যা ২.৯ শতাংশ হারে হ্রাস পায়। শুধুমাত্র বালিয়াকান্দি থানার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব এই সময়ে কম ছিল এবং কাশুখালী থেকে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের কারণে অন্য জেলা থেকে অনেক শ্রমিক এসে এখানে বসবাস শুরু করে। গোয়ালন্দ মহকুমার অপর তিনটি থানার জনগণ পদ্মার ক্ষয়িষ্ণুতার কারণে অন্য জেলায়, বিশেষ করে পাবনা জেলায় চলে যায়। এই সময় গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী এবং পাংশা থানায় ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মহামারীর পাদুর্ভাবও ছিল। ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল, এ সময় গোয়ালন্দ মহকুমায় যখন পাটের ব্যবসায় ধ্বস নামে, তখন জনগণ এই মহকুমা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল। পরবর্তী আদমশুমারিতে দেখা যায়, পূর্বের তুলনায় অল্প সংখ্যক শ্রমিক গোয়ালন্দ ঘাটে কাজে নিয়োজিত।

রাজবাড়ী জেলার থানাভিত্তিক আয়তন ও জনসংখ্যাঃ-

থানা	আয়তন	জনসংখ্যা
গোয়ালন্দ	১৩৩.২২ বর্গ.কি.মি	১,০০,৮১৩ জন
পাংশা	৪৬২.৫০ বর্গ.কি.মি	৩,৪২,৪২১জন
বালিয়াকান্দি	২৩৪.৯৫ বর্গ.কি.মি	১,৬৮,৯৩২ জন
রাজবাড়ী(সদর)	২৯১.৪৫ বর্গ.কি.মি	২,২৩,০০৭জন

সারণী-৪

জনসংখ্যার ঘনত্বঃ-রাজবাড়ী জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব পর্যায়েক্রমে বেড়েছে। পল্লী এলাকায় ধীরে ধীরে বেড়েছে। শহর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায় (১৯৫১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত পাঁচটি আদমশুমারিতে) ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭৪ সালে জনঘনত্ব বেড়েছে। ১৯৮১ সালে কমেছে। আবার ১৯৯১ সালে বেড়েছে।

প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব(১৯৫১-১৯৯১)

এলাকা	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১
সমস্তএলাকা	২৮৪	৩৫৮	৫০৯	৬০৬	৭৪৬
পল্লী এলাকা	২৭৬	৩৪৬	৪৯২	৫৬৯	৬৯৪
শহর এলাকা	১,১০০	১,৫৪৯	২,৩১৯	১,৬৬৯	২,১৯০

সারণী-৫ রাজবাড়ী জেলা

৬। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস-রাজবাড়ী জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১ সালে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমায় জনসংখ্যার সার্বিক চিত্রঃ-

এলাকা	বর্গমাইলে জমির পরিমাণ	জনসংখ্যা (মোট)	প্রতিবর্গমাইলে জনসংখ্যা
গোয়ালন্দ মহকুমা	৪৬৫	৪৩৪,৪০৭	৯৩৪
গোয়ালন্দ ঘাট	৫৮	৪৪,৬০১	৭৬৯
পাংশা থানা	১৭৫	১৫৮,৩৩১	৯০৫
বালিয়াকান্দি থানা	১২৫	১১৮,০৩৬	৯৪৪
রাজবাড়ী থানা	১০৭	১১৩,৪৩৯	১০৬০

সারণী-৬

অভিপ্রয়াণ	Migration

বহুকাল ধরে রাজবাড়ী জেলার লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে। এর মূল কারণ অভিপ্রয়াণ।বেশির ভাগ অভিপ্রয়াণ ঘটেছে পদ্মা নদীর ভাঙন ও গতিপথ পরিবর্তনের ফলে। একদিকে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, অন্যদিকে রাজবাড়ী জেলার উর্বর ভূমি লোকজনকে আকৃষ্ট করেছে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। পদ্মা নদীর তীরবর্তী পাবনা জেলার বিপুল সংখ্যক লোক পদ্মার ভাঙনের কারণে রাজবাড়ী জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসে। বৃহত্তর যশোহর থেকেও কিছু লোক রাজবাড়ীতে এসে বসবাস শুরু করে।

বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলা থেকে প্রায় ১০,০০০ লোক বর্তমান রাজবাড়ী জেলায় চলে আসে বসবাসের উদ্দেশ্যে। যাঁরা গোয়ালন্দ ঘাটে কুলি হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে এ তথ্যটি জানা যায়।[৭]

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীঃ-রাজবাড়ী জেলায় ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ৮,৩৫,১৭৩, জন। এর মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৭,২৪,৩৬১, যা জেলার মোট জনসংখ্যার ৮৬.৭৩ ভাগ। হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ১০৯,৬১৪ জন-জেলার মোট জনসংখ্যার ১৩.১২ ভাগ। খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ৩৯৫ জন-মোট জনসংখ্যার .০৫ ভাগ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৩০০ জন (.০৪ ভাগ)। এছাড়া জৈন এবং অন্যান্য ধর্মের ৫০৩ জন, যা জেলার মোট জনসংখ্যার .০৬ ভাগ।[৮]

৭। Most of the immigrants from Nadia (now in India) who numbered about 10,000 and from up-country worked as coolies in Goalundo. Bangladesh District Gazetteers, Faridpur –1977, Page-56.

৮। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস - রাজবাড়ী জেলা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে রাজবাড়ী জেলার ধর্মীয় জনসংখ্যার চিত্রঃ

ধর্ম	১৯৬১		১৯৭৪		১৯৮১		১৯৯১	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
মোট	৪০০,০২৮	১০০.০০	৫৬৯,৪৬১	১০০.০০	৬৭৮,২০৫	১০০.০০	৮৩৫,১৭৩	১০০.০০
মুসলিম	২৯০,৮৮৭	৭২.৭২	৪৫৬,৬৬৬	৮০.১৯	৫৬৩,৪৫১	৮৩.০৮	৭২৪,৩৬১	৮৬.৭৩
হিন্দু	১০৯,০৬৮	২৭.২৭	১১২,৪৬৪	১৯.৭৫	১১৩,৯৭৫	১৬.৮১	১০৯,৬১৪	১৩.১২
খৃষ্টান	৪৫	০.০১	৮৩	০.০১	১০৮	০.০১	৩৯৫	০.০৫
বৌদ্ধ	২৪	০.০০	২৮	০.০১	৬৬	০.০১	৩০০	০.০৪
অন্যান্য	৪	০.০০	২২০	০.০৪	৬০৫	০.০৯	৫০৩	০.০৬

সারণী - ৭

জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ-১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজবাড়ী জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মহিলা ৪,০৩,৮১৪, পুরুষ ৪,৩১,৩৫৯ জন।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জেলার বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখানো হলোঃ-

বছর	জনসংখ্যা			বার্ষিক বৃদ্ধির হার
	মোট	পুরুষ	মহিলা	
১৯৫১	৩,১৭,৮১২	১,৬৯,৩০৭	১,৪৮,৫০৫	০.২৬%
১৯৬১	৪,০০,০২৮	২,০৮,৩২৭	১,৯১,৭০১	২.৩৩%'
১৯৭৪	৫,৬৯,৪৬১	২,৯৩,৯৬৬	২,৭৫,৪৯৫	৩.৫৯%
১৯৮১	৬,৭৮,২০৫	৩,৪৯,৩৯৫	৩,২৮,৮১০	১.৭৬%
১৯৯১	৮,৩৫,১৭৩	৪,৩১,৩৫৯	৪,০৩,৮১৪	২.১০%

সারণী - ৮

১৯৭৪ সালে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ১৯৮১ সালে জেলার জনসংখ্যা কমে যাওয়ায় কারণ সম্পর্কে রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, অনেকে যুদ্ধের সময় সংগৃহীত অস্ত্র জমা না দিয়ে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। পরে পরিস্থিতির সুযোগে সেগুলি গ্রামাঞ্চলে চুরি, ডাকাতি ও লুটের কাজে ব্যবহার করে এবং অস্ত্রের মুখে ভয় দেখিয়ে ধনী কৃষক ও গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতে থাকে। এভাবে গ্রামাঞ্চলেও আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এ ছাড়া অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের বেপরোয়া কার্যকলাপে অনেক হিন্দু-মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবার রাজবাড়ী জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি থেকে রাজবাড়ী শহর ও থানা সদরে চলে আসে।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর প্রশাসনিক যে পরিবর্তন ঘটে, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

শাসনামলে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে পরিবর্তন হওয়ায় অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে শংকিত হয়ে পড়ে। তাঁদের মধ্যে অনেক পরিবার দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নেওয়ার ফলে ১৯৮১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পায়। [রাজবাড়ী জেলার হাবাসপুর, রামদিয়া, খানখানাপুর, সেনগ্রাম, বালিয়াকান্দি, পাংশা, প্রভৃতি হিন্দু প্রধান গ্রামসমূহ পরিদর্শন করে উপরের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে]।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজবাড়ী জেলায় সাময়িকভাবে বসবাসকারী বিদেশীদের সংখ্যা ৫২৫ জন। যা জেলার মোট জনসংখ্যার ০.০৬%। সমগ্র জেলায় বিদেশী জনসংখ্যার ৮৯.১৪শতাংশ বাস করে পল্লী এলাকায়।

<u>শহর ও গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যাঃ</u>-১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজবাড়ী জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে পল্লী এলাকায় বাস করে ৭,৪৯,৩৮২, শহর এলাকায় ৮৫,৭৯১ জন। জেলার ৮৯.৭৩ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে আর ১০.২৭ শতাংশ বাস করে শহরে। নিম্নে রাজবাড়ী জেলার থানা ভিত্তিক শহর ও গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যা দেখানো হলো।

থানা	মোট		গ্রাম		শহর	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বালিয়াকান্দি	১,৬৩,১৯১	১৯.৫৪	১,৫৬,২৬৩	২০.৮৫	৬,৯২৮	৮.০৭
গোয়ালন্দ	৯১,৬৭৫	১০.৯৮	৮০,০৬০	১০.৬৮	১১,৬১৫	১৩.৫৪
পাংশা	৩,১৬,৭৫২	৩৭.৯৩	২,৯১,৪২৮	৩৮.৮৯	২৫,৩২৪	২৯.৫২
রাজবাড়ী (সদর)	২,৬৩,৫৫৫	৩১.৫৫	২,২১,৬৩১	২৯.৫৮	৪১,৯২৪	৪৮.৮৭
মোট	৮,৩৫,১৭৩	১০০.০০	৭,৪৯,৩৮২	১০০.০০	৮৫,৭৯১	১০০.০০

সারণী-৯

<u>যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ</u>-রাজবাড়ী জেলার সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আশানুরূপ উন্নত নয়। জেলায় সড়ক পথে পাকা রাস্তা রয়েছে১০৭.১৬ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা, ২০২২.১৩ কিলোমিটার। গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক এলাকার যোগাযোগ অত্যন্ত দুরূহ। রাজবাড়ী জেলায় রেলপথ রয়েছে ৯৫.০৯ কিলোমিটার। রেলওয়ে ষ্টেশন রয়েছে ১৫ টি,এর মধ্যে রেলওয়ে জংশন দুইটি।[১০] পূর্বে মালামাল পরিবহনে রেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিরাট সংখ্যক যাত্রীও রেলে ভ্রমণ করেছে। বর্তমানে রেলপথের জনপ্রিয়তা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ সড়কপথে দ্রুত যোগাযোগ। ট্রেন প্রায়ই যথাসময়ে না ছাড়ায় জনগণ সড়কপথে যোগাযোগের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে রাজবাড়ী জেলায় অন্যান্য বিষয়ের মত রাস্তঘাটের উন্নতি হয়েছে। জেলায় পাকা রাস্তা নির্মাণ করেছে মূলতঃ সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ এবং শহর এলাকায় পৌরসভা। এছাড়া গ্রামীণ রাস্তা ও অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটেছে সরকারের "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" (কাবিখা) এবং "টেষ্ট রিলিফ" (টিআর) কর্মসূচীর অধীনে।

৯। <u>বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস (রাজবাড়ী জেলা)</u>, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১২

১০। জেলা তথ্য অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

জলপথ রাজবাড়ী জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। জেলার গোয়ালন্দ থানার দৌলতদিয়া ঘাট বর্তমানে জলপথে যোগাযোগের একটি বড় কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে রাজবাড়ী জেলা সহ সমগ্র দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলোর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে। অতীতে গোয়ালন্দ ঘাট গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ও বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণের জেলাগুলোর প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত ছিল গোয়ালন্দ ঘাট। ইলিশ মাছ সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবেও এ স্থান খ্যাত ছিল।

জে. সি. জ্যাক তাঁর "Economic life of a Bangal Distict-1916"-বইয়ে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন:-

"In the north- west so few roads exist that during the season when the rivers have dried up, the transport of produce is almost impossible, which has all the more depressing effect upon general trade since it is at this period of the year that the reaping of the main harvest has put money freely into the hands of the population".[১১]

সড়ক যোগাযোগঃ- উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সড়ক যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পায়। উইলিয়াম উইলসন হান্টার উল্লেখ করেছেন, তৎকালীন ফরিদপুর জেলায় ১৮৭০ সালে মাত্র ৪৫ মাইল সড়ক ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ফরিদপুর জেলায় সড়ক নির্মাণ কার্যক্রম খুব সামান্য ছিল। এই সময় সমগ্র ফরিদপুর জেলায় ১৬৪ মাইল সড়ক ছিল। জেলার উত্তর অংশে, প্রয়োজনীয় গ্রামীণ রাস্তা অল্প ছিল এবং গ্রামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ ছিল। ট্রাঙ্ক রোডটি সঠিকভাবে সংস্কার করা হয় নাই।[১২] ১৯২২-২৩ সালে ফরিদপুর জেলায় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৩৫৩ মাইল, যার মধ্যে মাত্র ৬ মাইল ছিল পাকা রাস্তা। গ্রামীণ রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ৩০৭ মাইল। এই সময় নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মিত হয়।

(১)ফরিদপুর থেকে বালিয়াকান্দি হয়ে পাংশা (২৯$^{১}/_{২}$ মাইল)
(২) ফরিদপুর -রাজবাড়ী সড়ক (১৮$^{১}/_{২}$ মাইল)

রাজবাড়ী জেলার বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সমূহ

(১) রাজবাড়ী থেকে গোয়ালন্দ মোড় হয়ে দৌলতদিয়া সড়ক
(২) রাজবাড়ী ----------ফরিদপুর সড়ক
(৩) রাজবাড়ী থেকে পাংশা হয়ে কুষ্টিয়া সড়ক
(৪) রাজবাড়ী ---------- বালিয়াকান্দি সড়ক
(৫) পাংশা থেকে বালিয়াকান্দি হয়ে ফরিদপুর সড়ক
(৬) পাংশা ---------- মধুখালী সড়ক
(৭) পাংশা থেকে হাবাসপুর হয়ে সেনগ্রাম সড়ক
(৮) পাংশা ---------- যশাই সড়ক
(৯) মেঘনা ---------- সেনগ্রাম সড়ক

১১। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur, 1977 Page-145.
১২। পূর্বোক্ত, Page-146.

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত সড়কগুলোর মধ্যে রাজবাড়ী থেকে গোয়ালন্দ মোড় হয়ে দৌলতদিয়া সড়কে, দৌলতদিয়া ---আরিচা ঘাটের মধ্যে ফেরী বা লঞ্চে পার হয়ে ঢাকার সাথে রাজবাড়ী জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। রাজবাড়ী জেলার উপরিউক্ত সবগুলো সড়কে বাস যোগাযোগ রয়েছে। রিক্সা, ভ্যান, ট্রাক, টেম্পো, বেবীট্যাক্সি, মাইক্রোবাস প্রভৃতিও নিয়মিত চলাচল করে। সড়কপথে রাজবাড়ী জেলা সদরের সাথে জেলার অপর তিনটি থানা সদরের যোগাযোগ রয়েছে। থানা সংযোগ সড়ক নির্মিত হবার ফলে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। রাজবাড়ী জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর, মাগুরা ও কুষ্টিয়া জেলার সড়ক পথে যোগাযোগ রয়েছে। রাজবাড়ী জেলায় সড়কপথে পাকারাস্তা ১০৭.১৬ কিলোমিটার এবং কাঁচা রাস্তা ২০২২.১৩ কিলোমিটার। এসব রাস্তায় অন্যান্য যানবাহনের পাশাপাশি গরু, মহিষ ও ঘোড়াগাড়ি চলাচল করে।

রেল যোগাযোগঃ- ভারতবর্ষে প্রথম রেললাইন স্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল। ১৮৫৭ সালে "ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি" কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ১১১ মাইল রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কোম্পানীর সাথে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের চুক্তি হয় যে, তাঁরা কুষ্টিয়াতে ব্রিজ নির্মাণ করে ঢাকা পর্যন্ত রেললাইন নিয়ে যাবেন। সেই সময় পদ্মা কুষ্টিয়ার ধার দিয়ে প্রবাহিত ছিল। ১৮৬২ সালে এই লাইনে প্রথম গাড়ী চলে। তখন পর্যন্ত কুষ্টিয়াই পূর্ববঙ্গ রেলের শেষ সীমা ছিল। ইতোমধ্যে পদ্মা দূরে সরে যায় এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিজ নির্মাণ সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তীতে গড়াই নদীতে ব্রিজ নির্মাণ করে ১৮৭১ সালে রেললাইন গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং এখানে থেকে ষ্টীমারে করে ঢাকা ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। বর্তমানেও এই রেল যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

রাজবাড়ী জেলায় রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৯৫.০৯ কিলোমিটার। রেলওয়ে ষ্টেশন রয়েছে ১৫ টি। রেলওয়ে জংশন রয়েছে ২ টি যথাঃ- কালুখালী ও পাঁচুরিয়া। জেলার পশ্চিম দিকের শেষ ষ্টেশন মাছপাড়া। মাছপাড়া থেকে পাংশা ষ্টেশনের দুরত্ব ৪ মাইল, রাজবাড়ী ১৯$^{১}/_{২}$ মাইল, গোয়ালন্দ ঘাট ২৯ মাইল। বর্তমানে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মায় বিয়াট চর গঠিত হওয়ায় দৌলতদিয়ায় ঘাট স্থাপিত হয়েছে এবং গোয়ালন্দ থেকে দৌলতদিয়া পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত হয়েছে। একটি শাখা লাইন ১৮৯৮ সালে স্থাপন করা হয় যা পাঁচুরিয়া থেকে ফরিদপুর জেলা সদর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল।[১৩] অন্য একটি শাখা লাইন কালুখালী থেকে শুরু হয়ে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৪৬$^{১}/_{২}$ মাইল। এই লাইনের কালুখালী থেকে মধুখালী পর্যন্ত অংশটি চালু হয় ১লা জানুয়ারী, ১৯৩২ সালে এবং মধুখালী থেকে ভাটিয়াপাড়া ঘাট পর্যন্ত অংশটি চালু হয় ঐ বছরের ১লা মার্চ থেকে। পূর্বে কলকাতায় পাট চালান দেয়ার ক্ষেত্রে এই লাইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। বর্তমানে এই লাইনটি প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। পাট রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। দ্রুত যাতায়াতের জন্য সড়কপথে যোগাযোগ বেড়েছে।

১৩। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page-150.

Dhaka University Institutional Repository

নদী পথে যোগাযোগঃ-রাজবাড়ী জেলার অভ্যন্তরে এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে নদীপথে যোগাযোগের ঐতিহ্য রয়েছে। পদ্মা নদী জেলার উত্তর-পশ্চিম কোন ঘেঁসে প্রবাহিত হওয়ায় নদীপথ জেলার যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত গোয়ালন্দ ঘাট-যেটি অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর ছিল এবং সব সময়ই বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর -পশ্চিম এবং দক্ষিণের জেলাগুলোর প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত ছিল। গোয়ালন্দ ঘাট দেশের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে দৌলতদিয়ায় নতুন ফেরীঘাট স্থাপিত হয়েছে।

গোয়ালন্দ ঘাট থেকে ষ্টীমার চাঁদপুর হয়ে সারা বছর নারায়নগঞ্জ পর্যন্ত যেত। গোয়ালন্দ নদী বন্দর পদ্মা এবং যমুনা নদীর সংযোগ স্থলের কাছাকাছি। গোয়ালন্দ ঘাট রেলষ্টেশন গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ যাত্রী এবং মালামাল নদীপথে রাজধানী ঢাকা সহ অন্যান্য গন্তব্যে যাত্রা করত। গোয়ালন্দ ঘাট থেকে দৈনিক রেলে মাছ ও অন্যান্য দ্রব্য কলকাতায় রফতানী হতো। ঢাকা, চাঁদপুর এবং চট্টগ্রাম থেকে যাত্রীরা গোয়ালন্দ হয়ে রেলপথে কলকাতা যাত্রা করত। বর্তমানে ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে। এর প্রধান কারণ উন্নত সড়কপথে, অল্প সময়ে ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থা। এছাড়া নদীতে বড় বড় চর জেগে উঠায় ষ্টীমার যাতায়াত দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

লঞ্চ সার্ভিস

১। **গোয়ালন্দ-ঢাকা সার্ভিসঃ**- এই পথে গোয়ালন্দের সাথে ঢাকার যোগাযোগ ছিল। লঞ্চষ্টেশন ছিল গোয়ালন্দ, নারেরটেক, এরপর লঞ্চ জশিলদা, মাওয়া, দিঘলী, মুন্সিগঞ্জ হয়ে ঢাকা পৌছাত। ভরা বর্ষা মৌসুমে গৌড়গঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জ মহকুমার তালতলা যেতে এই পথে তালতলা খাল ব্যবহৃত হতো।

২। **গোয়ালন্দ-দাউদ কান্দি সার্ভিসঃ**- এই সার্ভিস কুমিল্লা জেলার সাথে গোয়ালন্দের সংযোগ রক্ষা করত। এই পথে লঞ্চ ষ্টেশন গুলো ছিল গোয়ালন্দ, নারেরটেক, পাতরাইল, লক্ষীকোল, পেয়াজখালি, চৌধুরী হাট। এর পর এই পথে লঞ্চ ঢাকা জেলার ভাগ্যকুল, দিঘলী এবং কুমিল্লা জেলার চাঁদ পুর হয়ে দাউদকান্দি পৌছাত।

৩। **গোয়ালন্দ-চাঁদপুর সার্ভিসঃ**- এই লঞ্চ সার্ভিস সংযোগ রক্ষা করত বর্তমান রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ নদী বন্দরের সঙ্গে কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র এবং রেলওয়ে জংশনের। এই পথে লঞ্চ ষ্টেশনগুলো হলো গোয়ালন্দ, নারেরটেক, পাতরাইল, পেয়াজখালি এবং চৌধুরীর হাট। এর পরের ষ্টেশন ভাগ্যকুল। এই পথটি পরে ঢাকা জেলায় প্রবেশ করে এবং মাওয়া,দিঘলী ও সুরেশ্বর ষ্টেশন হয়ে ঢাকা পর্যন্ত যায়।

৪। **গোয়ালন্দ-জগন্নাথগঞ্জ সার্ভিসঃ**-এই লঞ্চ সার্ভিস গোয়ালন্দের সাথে আরিচা, নগরবাড়ী হয়ে জগন্নাথগঞ্জের যোগাযোগ রক্ষা করত।[১৪]

---

১৪ । Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, page-151-154.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান লঞ্চ সার্ভিসঃ- বর্তমানে রাজবাড়ী জেলার লঞ্চ ষ্টেশন স্থাপিত হয়েছে দৌলতদিয়ায়। এখান থেকে লঞ্চ নিয়মিত মানিকগঞ্জ জেলার আরিচায় যাতায়ত করে।

ফেরী সার্ভিসঃ-বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে, অভ্যন্তরীণ জলপরিবহন কর্পোরেশন পরিচালিত ফেরী সার্ভিস বর্তমান দৌলতদিয়া ঘাট থেকে মানিকগঞ্জ জেলার আরিচা ঘাট পর্যন্ত যাতায়াত করে। এই পথে পণ্য, যানবাহন ও যাত্রী পরিবহন করা হয়।

নৌকাঃ- রাজবাড়ী জেলার উপর দিয়ে বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা প্রবাহমান। এই জেলায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ধরণের নৌকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিছু ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র যাত্রী পরিবহনের জন্য, কিছু ব্যবহৃত হয় মালামাল পরিবহনের জন্য-এক বাজার থেকে অন্য বাজারে, আবার কিছু ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র মাছ ধরার জন্য।

রাজবাড়ী জেলা থেকে পাবনা জেলার বিভিন্ন অংশে নদীপথে যোগাযোগঃ- রাজবাড়ী জেলা থেকে পাবনা জেলার বিভিন্ন অংশে নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান ঃ-

জেলার পাংশা থানার	হাবাসপুর	থেকে	সাতবাড়িয়া
	হাবাসপুর	"	সুজানগর
	সেনগ্রাম	"	সুজানগর
	সেনগ্রাম	"	সাতবাড়িয়া
	সেনগ্রাম	"	নিশ্চিন্তিপুর
জেলার সদর থানার	ধাওয়াপাড়া	"	নাজিরগঞ্জ

এই নদীপথগুলোতে ফেরী, লঞ্চ, শ্যালোনৌকা, নৌকা চলাচল করে। এতে বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করা হয়ে থাকে।

নদ-নদীঃ- রাজবাড়ী জেলার উপর দিয়ে নিম্নলিখিত নদীগুলো বয়ে গেছে - পদ্মা, গড়াই, চন্দনা, ফুরশলী এবং হড়াই। এই নদীসমূহ জেলার ইতিহাস বিনির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

পদ্মাঃ- বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী। রাজবাড়ী জেলার পাংশা, রাজবাড়ী (সদর) ও গোয়ালন্দ থানার সীমান্ত দিয়ে বর্তমানে প্রবহমান পদ্মা নদী। গঙ্গার প্রবাহ বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত। যুগে যুগে এ নদী বার বার খাত পরিবর্তন করেছে। প্রাচীন মানচিত্র-গুলো বিশ শতক পর্যন্ত পাশাপাশি রেখে পর্যবেক্ষণ করলে এর সত্যতা সহজে অনুমিত হয় এবং সেই সঙ্গে আরো একটি বাস্তব সত্য উদ্ভাসিত হবে যে, বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে উত্তর - পশ্চিম থেকে পূর্ব- দক্ষিণে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণে পদ্মা প্রবাহিত হচ্ছে, আর অনেকগুলো নদী এই পদ্মা বা গঙ্গার উপনদী অথবা শাখা নদী। তাই বলা হয়ে থাকে, প্রধানত পদ্মা বা গঙ্গা নদীকেই অবলম্বন করে বাংলাদেশের সমস্ত নদ-নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবতঃ পূর্বে পদ্মা চলনবিলের মধ্য দিয়ে বর্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হতো। পদ্মা বর্তমানে যেখাতে প্রবাহিত হচেছ অতীতে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতো। পদ্মা নামে গঙ্গার আর একটি প্রবাহ গৌড়ের ২৫ মাইল দক্ষিণ হতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় এবং রাজশাহীর চলণ বিলের মধ্য দিয়ে ও বর্তমান ধলেশ্বরী এবং বুড়িগঙ্গা নদীর গতি বেয়ে ফিরিঙ্গিবাজারের কাছে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয় ও চট্টগ্রাম বন্দরের অনতিদূরে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। পঞ্চদশ শতকের পরবর্তীকালে গঙ্গা বা পদ্মা তার খাত পরিবর্তন করে এবং ক্রমশঃ পশ্চিম-পূর্ব গতি হতে দক্ষিণ -পূর্বে এবং দক্ষিণে সরে যায় ও পুনরায় উত্তর-পূর্বে ফিরে আসে।

বৃটিশ প্রশাসক এসুকোলি পদ্মার এ প্রবণতা সম্পর্কে লিখেছেন-"At the time of Major Rennell's survey in the years 1764-66, the Padma joined the Meghna at a point near Mehendiganj in the district of Bakarganj, more than 14 miles in a straight line south of the present junction . In the year 1794 there is a definir evidence to show, that it had joined the Meghna In a close proximity to its junction. Under the name of the river Kirtinasha, the name by which this part of the river is still known .....The Padma has shown a continuous tendency to cut towards the north and east, as can be seen from a comparison of the new maps with those of Major Rennell, the revenue and the diara surveys.

পদ্মা নদীর এই প্রবণতা বর্তমানেও পরিলক্ষিত হয়। পদ্মার প্রবাহ মানিকগঞ্জকে রাজবাড়ী জেলা থেকে বিচিছন্ন করেছে। বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক টার্ভানিয়ার নদী পথে যখন ঢাকা আগমন করেন - তখন পদ্মা বর্তমান দৌলতদিয়ার নিকট দিয়ে মানিকগঞ্জ জেলার সীমান্তে প্রবেশ করত। সেই সময় মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানা সীমান্তে পদ্মা তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল। উক্ত তিনটি প্রবাহের মধ্যবর্তীটি ছিল মূল খাত। এর দক্ষিণ-পূর্বগামী শাখাটি বর্তমানের ভুবনেশ্বর নদী বা আড়িয়াল খাঁ। এর পরবর্তী সময়ে পদ্মা কিছুটা উত্তরে জাফরগঞ্জের নিকটবর্তী হয় এবং অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে যমুনার প্রবাহ উক্ত জাফরগঞ্জের নিকটেই পদ্মাতে মিলিত হয়।[১৫] যমুনা নদীর বিপুল জলরাশি প্রচন্ডবেগে পদ্মার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হলে সঙ্গমস্থলের উভয় পার্শ্বসহ নিম্নাঞ্চলে ব্যাপক ভাঙা-গড়া সাধিত হয়। ফলে অষ্টাদশ শতকের শুরুতেই পদ্মা নদী বর্তমান গোয়ালন্দের নিকটবর্তী হয়। এরও দক্ষিণ-পূর্বে পদ্মা নদী ৪৫৮ টি গ্রাম তৎকালীন ঢাকা জেলা থেকে বিচিছন্ন করে ফেলে। ফলে বৃটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৮৭১ সালের ১৭ই জুন আদেশ জারি করে উক্ত ৪৫৮টি গ্রাম বাখেরগঞ্জ জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেন। এই কারণে উইলিয়াম উইলসন হান্টার লিখেছেন- "The river, since it was maped in 1769, has sifted its channel and completely attered the whole appearence of the country".

মেজর রেনেল কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের মানচিত্রে পদ্মানদীর যে প্রবাহ দেখানো হয়েছে, পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীকালে তার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। হান্টারের জরিপকালীন সময়ে তিনি পদ্মার প্রবাহ "কীর্তিনাশা ও নয়াভাঙ্গনী" খাতে

১৫। মোহাম্মদ সাইফউদ্দীন (সম্পাদিত), মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস (১৯৮৭ সাল), পৃষ্ঠাঃ-৯৭-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাহিত দেখতে পান।[১৬] এর মধ্যে কীর্তিনাশা ছিল গভীর,খরস্রোতা ও প্রশস্থ। তা কার্তিকপুরের উত্তরে মেঘনায় পতিত হয়। পদ্মার মূল প্রবাহ ছিল তখন মৃতপ্রায়।

"The original channel of the Ganges is now almost dry in the hot months, the whole of its bed being filled up with alluvial accretions, devided by board shallows, but only by small boats. The course of the Ganges within the district (Dhaka) is very variable,and is said to alter as much as four, five or six miles in a single year, cutting away its north and south banks with equal impartiality".

উইলিয়াম উইলসন হান্টার উল্লিখিত পদ্মার উক্ত খাত দুইটি মানিকগঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে উৎপন্ন। মানিকগঞ্জ জেলার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত সীমায় বাহিত আদিগঙ্গা বা পদ্মার খাত যে সে সময় শীর্ণ এবং শুষ্ক প্রায় ছিল তা ১৮৭২ সালের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মানচিত্রে লক্ষ্য করা যায়।[১৭] তবে উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে আদি পদ্মার খাত পুনরায় জোরদার হয়ে ওঠে এবং প্রসারতাও লাভ করে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই পদ্মা অনেকটা উত্তর-পূর্ব দিকে সরে আসে। বস্তুতপক্ষে, প্রাচীন কাল থেকে পদ্মা নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গার প্রধান ধারা প্রাচীন গৌড় নগরীর প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী আর বাংলাদেশে পদ্মা নামে প্রবাহিত। বিচিত্র গতি পরিবর্তনের ফলে এবং এগিয়ে চলার পথে এই নদী অসংখ্য শাখা -প্রশাখা, খাল, কোল ইত্যাদি রেখে গেছে। বাংলাদেশের সাতটি জেলার মানুষ পদ্মার জলধারার উপর নির্ভরশীল। অতীতের অশান্ত প্রমত্তা পদ্মা বর্তমানে নির্জীব। বর্ষা কাল ছাড়া অন্য সময়ে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে এই খাতে লঞ্চ বা বড় নৌকা যাতায়াত করতে পারেনা।

বর্ষাকালে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিশাল জলরাশি পদ্মার খাত দিয়ে প্রবল বেগে নিম্নদিকে ধাবিত হয়ে যমুনা ও মেঘনা নদীর জলরাশির সঙ্গে মিলিত হয়। ১৯৭৪ সালে ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ সমাপ্তির পর, প্রত্যেক খরা মৌসুমে গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহকে ভাগীরথী খাতে ঘুরিয়ে দেয়া হয় বলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পদ্মার প্রবাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পদ্মা নদীর পানি বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। তখন পদ্মায় বালিয়াড়ি আর চর সৃষ্টি হয়। এই সময় নদীর মধ্যভাগে কেবলমাত্র একটি অগভীর ক্ষীণ ধারা দেখা যায়। বছরের অধিকাংশ সময় সচল প্রবাহের অভাবে প্রতি বছরই ভরাট প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এছাড়াও এর প্রভাবে উত্তরবঙ্গে পানির সংকট দেখা দেয়। দক্ষিণ বঙ্গের নদীগুলোতেও সামুদ্রিক লোনা পানি প্রবেশ করে এবং পদ্মা নদীতে ইলিশ মাছের প্রজনন বিঘ্নিত হয়। অপরপক্ষে, পাহাড়ী ঢল ও বন্যার পানির বিপজ্জনক চাপের প্রতিক্রিয়া ঠেকানোর জন্য ভারতের ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে বিশাল জলরাশি বের করে দেওয়ায় বাংলাদেশে পদ্মার উভয় তীরের বিরাট এলাকা প্লাবিত হয়।

১৬। মোহাম্মদ সাইফউদ্দীন (সম্পাদিত), মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস (১৯৮৭ সাল), পৃষ্ঠাঃ-৯৯।

১৭। পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা:-৯৯-১০০।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞের মতে, পদ্মা নদী বিভিন্ন সময়ে তার খাত পরিবর্তন করে পশ্চিম থেকে ক্রমশঃ পূর্ব দিকে নতুন নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সেই জন্য ভাগীরথীর পর থেকে পূর্ব দিকে ব-দ্বীপ এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রতিটি শাখাকেই তার পশ্চিমের শাখা অপেক্ষা একটি নতুন খাত মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে এখানে রেনেলের মত উল্লেখ করা যায়- তাঁর মতে, পদ্মা নদী এক সময়ে বর্তমান খাতের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, জাফরগঞ্জ ও নাটোরের মধ্যকার হ্রদ ও জলাভূমিগুলো পূর্বে গঙ্গা নদীরই খাত ছিল।

গড়াই ও চন্দনাঃ- গড়াই রাজবাড়ী জেলার অন্যতম একটি নদী। গড়াই নদী প্রায় ১৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বালিয়াকান্দি থানার পশ্চিম সীমা বরাবর এবং চন্দনা নদী পাংশা থানার মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার টিলির মিলের নিকট কুমার নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এদের মধ্যে একমাত্র গড়াই নদী সারা বছর নাব্য থাকে এবং নৌকা ও লঞ্চ চলাচলের উপযোগী থাকে। এতে জোয়ার-ভাটা হয়। চন্দনা শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতা হারিয়ে ফেলে এবং বর্ষা মৌসুমে নাব্যতা ফিরে পায়। এই সময় বড় নৌকা চলাচল করতে পারে।

পূর্বে গড়াইয়ের উৎসমুখ কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহের নিকটে কুঠি বাড়ীর পাশে ছিল বলে জানা যায়। পদ্মানদী উত্তর দিকে সরে যাওয়ায় তালবাড়িয়া থেকে কুষ্টিয়া শহরস্থ কুঠিবাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত বড় কোল (মরা খাত) ফেলে যায়। ভাষদহ নদীর মুখ থেকে এই কোল দিয়ে পদ্মার স্রোত প্রবাহিত হয়ে গড়াইয়ের নতুন মুখের সৃষ্টি হয়। কোল ভেঙে গড়াই তৈরী হওয়ার সময় দুই পাড় ভেঙে যায়। তখন এর অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে যায় যে, নদীতে হেঁটে পার হওয়া সম্ভব হয়। কুষ্টিয়া সদরের উত্তরে মিরপুর থানার তালবাড়িয়ার পূর্ব পাশে পদ্মা নদী থেকে গড়াই নদী উৎপত্তি হয়েছে। অত:পর এই নদী কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে রাজবাড়ী জেলায় প্রবেশ করেছে।

ফুরশদী ও হড়াই ঃ- রাজবাড়ী জেলায় ফুরশদী ও হড়াই নামে দুইটি ক্ষুদ্র নদী রয়েছে। হড়াই নদীর উপর যাতায়তের জন্য ছোট সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

রাজবাড়ী জেলার নামকরণঃ- রাজবাড়ী জেলার নামকরণ নিয়ে কিছু মতদ্বৈততা আছে। একটি সূত্র মতে, বর্তমান রাজবাড়ী শহরের সজ্জনকান্দা ও বিনোদপুর মৌজাসহ অধিকাংশ এলাকা বাণীবহের জমিদার গৌরিজা শংকর মজুমদারের অধীনে ছিল। জমিদার গৌরিজা শংকর মজুমদারের পার্শ্ববর্তী এলাকায় রাজাবাবু নামে অন্য একজন জমিদার বাস করতেন। রাজাবাবুর নামে রাজবাড়ীর নামকরণ করা হয়েছে।

নামকরণ নিয়ে এই মতের সমর্থকদের যুক্তি হলো, বর্তমান রাজবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন যেখানে অবস্থিত সেই স্থানটি বাণীবহের জমিদার গৌরিজা শংকর মজুমদারের মালিকানায় ছিল। তাই রেলওয়ে ষ্টেশনের নামকরণ রাজা সূর্যকুমারের নামে হতে পারেনা, যেহেতু জমিদার গৌরিজা শংকর মজুমদার এবং রাজা সূর্যকুমারের মধ্যে জমি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মামলা চলছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এই মতের সমর্থনে উল্লেখিত রাজাবাবু সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়না। বর্তমান রাজবাড়ী শহর এলাকার অধিকাংশ এবং রেলষ্টেশন চত্বর বাণীবহের জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদারের মালিকানায় থাকলে পার্শ্ববর্তী অন্য জমিদার রাজাবাবুর নামে কেন রাজবাড়ীর নামকরণ হবে তা জানা দুষ্কর। জমিদার রাজাবাবু আদৌ ছিলেন কিনা অথবা জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদারের সাথে তাঁর কোন আত্মীয়তা ছিল কিনা তা জানা যায় না। এই মত সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়নি। এখানে উল্লেখ্য, বাণীবহের জমিদার বাবু গীরিজা শংকর মজুমদারের বাসভবন বর্তমান রাজবাড়ী শহর থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বাণীবহ ইউনিয়নে অবস্থিত।

অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, ১৬৬৬ সালে নবাব শায়েস্তা খাঁন ঢাকায় সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। এসময় এ অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যু দমনের জন্য তিনি সংগ্রাম শাহকে নাওয়ারা (পদ্মা ও যমুনা নদীর সঙ্গম স্থল নাওয়ারা মহল নামে পরিচিত ছিল) প্রধান করে পাঠান। তিনি বাণীবহতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। পরে তার বংশধরগণ বাণীবহের নাওয়ারা চৌধুরী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নাওয়ারা মহলের খাজনা সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র ছিল দূর্গাপুর। বর্তমানে যার অনেকটা পদ্মাগর্ভে। সংগ্রাম শাহের রাজকাচারী ও প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী অফিস বর্তমান রাজবাড়ী এলাকায় ছিল। এ থেকে এই স্থানটি রাজবাড়ী নামে পরিচিত। তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংগ্রাম শাহের কাচারী বা প্রধান অফিসের নামে সমগ্র এলাকা রাজবাড়ী নামে পরিচিত হয়েছে- এবিষয়টি প্রমাণিত নয়। অপরদিকে রাজা সূর্যকুমারের বাড়ীর নামে রাজবাড়ী রেলষ্টেশনের নামকরণের দাবী তোলা হলে এবং বাণীবহের জমিদারগণ প্রতিবাদ জানালে ষ্টেশনের নাম তাদের নামের হওয়ার কথা (যেহেতু বর্তমান রেলষ্টেশন এলাকা তাদের মালিকানায় ছিল বলে বলা হয়)। কিন্তু তা না হয়ে এটি হয়েছে রাজবাড়ী।

রাজা সূর্যকুমারের নামে রাজবাড়ীর নামকরণ করা হয়েছে এই মতের সমর্থকদের যুক্তি হলো, যেহেতু রাজা সূর্যকুমার "রাজা" উপাধিধারী ছিলেন এবং তাঁর বাসভবন লক্ষীকোল মৌজায় হলেও, লক্ষীকোল মৌজা বর্তমান রাজবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশন তথা রাজবাড়ী শহরের পার্শ্ববর্তী তাই ইংরেজ নীতি নির্ধারক দল রাজবাড়ী রেল ষ্টেশনের নাম রাজা সূর্যকুমারের বাড়ীর নামে রাখেন। এভাবে রাজবাড়ী শহরের নাম হয় রাজবাড়ী।

রাজা সূর্যকুমার "রাজা" উপাধিধারী ছিলেন, তার প্রমান বর্তমান রাজবাড়ী শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত তাঁর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির নাম আর, এস, কে, ইন্সটিউট বা রাজা সূর্যকুমার উচ্চ বিদ্যালয়। এটি ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। লক্ষ্যণীয় যে, বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে রাজা উপাধিধারী সূর্যকুমারের নামে- রাজা সূর্যকুমার উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে।

বস্তুতপক্ষেঃ রাজবাড়ী জেলার নামকরণ করা হয় রাজবাড়ীর রাজা সূর্যকুমার রায় বাহাদুরের বাড়ীর নাম অনুসারে। ১৮৭১ সালে রেললাইন কুষ্টিয়া থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

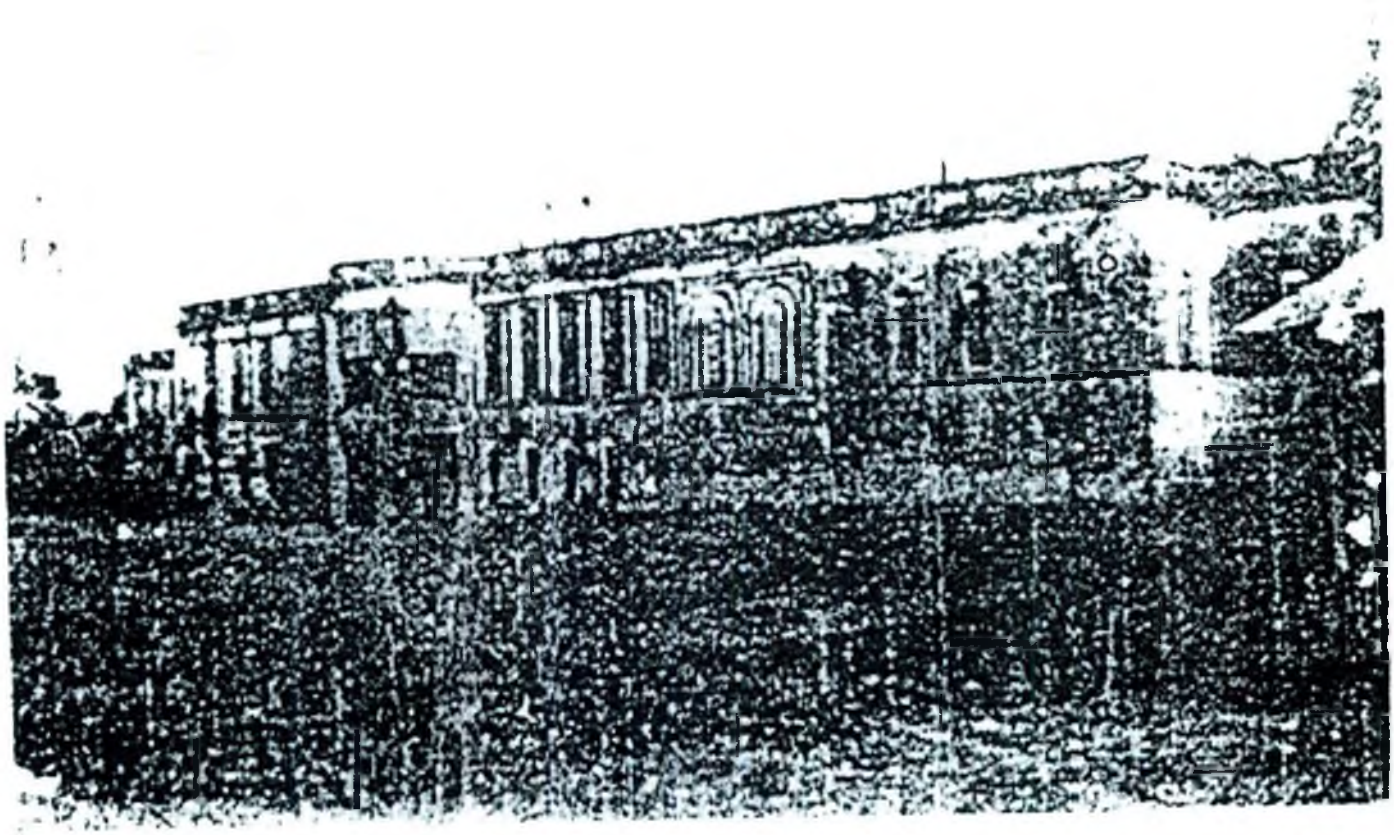

রাজা সূর্য কুমারের বাড়ী। এ বাড়ীর নামেই বর্তমান রাজবাড়ী জেলার নামকরণ করা হয় - রাজবাড়ী।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারিত হলে, একদল ইংরেজ নীতি নির্ধারক রাজবাড়ীতে আসেন রাজবাড়ী রেলষ্টেশনের নামকরণের উদ্দেশ্যে। তাঁরা ষ্টেশনটির নাম দিতে চেয়েছিলেন ভাজনডাঙ্গা। যেহেতু রাজবাড়ীতে ভাজন সম্প্রদায় তখন বেশ প্রভাবশালী ছিল। এখানে উল্লেখ্য, ভাজন সম্প্রদায় রাজবাড়ী শহরের হিন্দুদের মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়-যাঁরা ধনাঢ্য এবং প্রভাবশালী ছিল। রাজবাড়ী শহর এবং শহরতলীর বেশ কিছু এলাকার মালিক ছিলেন এরা। বর্তমানকালেও ভাজন সম্প্রদায়ের নাম অনুসারে রাজবাড়ী শহরের একটি অঞ্চলের নাম ভাজনচালা। কিন্তু উল্লিখিত ইংরেজ নীতি নির্ধারক দলটি যখন জানতে পারে যে, রাজবাড়ীতে একজন দেশীয় রাজার বসতবাড়ী রয়েছে শহরের অদূরে, তখন তাঁরা রাজবাড়ী রেলষ্টেশনের নামকরণ করেন 'রাজবাড়ী'। প্রসংঙ্গত উল্লেখ্য, রাজবাড়ী নাম ধারণ করার পূর্বে এই এলাকা ' বিনোদপুর' নামে পরিচিত ছিল।

রাজবাড়ী - কুষ্টিয়া রেললাইনের রাজবাড়ীর পরের ষ্টেশনের নাম সূর্যনগর। এটি রাজা সূর্যকুমারের নামানুসারে রাখা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নাই। সরকারীভাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস-১৯৯৫, রাজবাড়ী জেলা" - তে রাজবাড়ী জেলার নামকরণ রাজা সূর্যকুমারের বাড়ীর নামানুসারে হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ

রাজবাড়ী জেলার কয়েকটি স্থান আপন বৈশিষ্ট্যে জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এরূপ কয়েকটি স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

গোয়ালন্দঃ- রাজবাড়ীজেলার অধীনে একটি থানা। এখানে অতীতে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর ছিল। বর্তমানে নদী বন্দরটি গোয়ালন্দ থানার দৌলতদিয়া ইউনিয়নে স্থানান্তরিত হয়েছে। গোয়ালন্দে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর থাকাকালে এই স্থানটির গোয়ালন্দ ঘাট হিসেবে সারাদেশে ব্যাপক পরিচিতি ছিল।

মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে পর্তুগীজ জলদস্যু "সেবাসটিয়ান গঞ্জালীস" তার অধীনস্থ অনেক সৈন্য নিয়ে বর্তমানের গোয়ালন্দের নিকট অবস্থান গ্রহণ করেছে। গঞ্জালীসের নাম অনুসারে স্থানটি গোয়ালন্দ নামে পরিচিত বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১] অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, রাজা মানসিংহের সাথে ইশা খাঁর এক যুদ্ধ পদ্মা নদীর পাড়ে গোয়ালিয়র নামক স্থানে সংঘটিত হয়। এই গোয়ালিয়র বর্তমান গোয়ালন্দের কাছাকাছি ছিল বলে জানা যায়। গোয়ালিয়র নামটি থেকে বর্তমান গোয়ালন্দের নামকরণ হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। গোয়ালন্দ থানার নামকরণ করা হয় গোয়ালন্দ মৌজার নাম অনুসারে বৃটিশ শাসনামলে।

জেলায় উন্নীত এবং থানা হিসেবে রূপান্তরিত হবার পূর্বে রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ মহকুমার অংশ হিসেবে পরিচিত ছিল। যদিও গোয়ালন্দ মহকুমার সদর দফতর ছিল রাজবাড়ী এবং রাজবাড়ী থেকেই যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হতো। গোয়ালন্দ থানা পদ্মা ও যমুনা নদীর মোহনার পাশে অবস্থিত। গোয়ালন্দের সাথে দেশের অন্যান্য স্থানের স্থল ও জলপথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। স্থলপথে রেল যোগাযোগে ট্রেন এবং সড়ক যোগাযোগে বাস, ট্রাক টেম্পো, স্কুটার প্রভৃতি চলাচল করে। জলপথে লঞ্চ, ফেরী গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া নদী বন্দরে আসা-যাওয়া করে। দৌলতদিয়া ঘাট থেকে আরিচা ঘাট এবং নটাখোলা ঘাটে নিয়মিত ফেরী এবং লঞ্চ চলাচল করে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে গোয়ালন্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ জেলার যাত্রীবাহী দূরপাল্লার রাজধানীগামী বাস ও পণ্যবাহী ট্রাক গোয়ালন্দের উপর দিয়ে দৌলতদিয়া ঘাট পার হয়ে ঢাকায় যাতায়াত করে।

অতীতে গোয়ালন্দ ঘাটে ষ্টীমার সার্ভিস চালু ছিল এবং গোয়ালন্দ ঘাট থেকে নিয়মিত নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে ষ্টীমার ছেড়ে যেত এবং উল্লিখিত স্থান থেকে ষ্টীমার এসে গোয়ালন্দে থামত। বর্তমানে ঘাট গোয়ালন্দ থেকে দৌলতদিয়ায় নিয়ে

১। আ, ন, ম আবদুস সোবহান। "ফরিদপুরের কবি সাহিত্যিক", ঢাকা-১৩৭৬ (বি, এস)।

Dhaka University Institutional Repository

গোয়ালন্দ ঘাট-অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর, দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণের জেলা গুলোর দ্বারপথ।

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়া হয়েছে এবং ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে। গোয়ালন্দের সাথে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর ট্রেন যোগাযোগ রয়েছে। যাত্রী এবং পণ্যবাহী ট্রেন নিয়মিত গোয়ালন্দে আসে। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পূর্বে গোয়ালন্দ "কলকাতার প্রবেশদ্বার" হিসেবে খ্যাত ছিল। বর্তমানে গোয়ালন্দ দেশের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণের জেলাগুলোর "প্রবেশদ্বার" হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দর্শনা-গোয়ালন্দ রেলওয়ে লাইনের পূর্বদিকের প্রান্তসীমা ছিল গোয়ালন্দ (বর্তমান দৌলতদিয়া ঘাট ষ্টেশন)। অতীতে যখন গোয়ালন্দে ষ্টীমার ঘাট ছিল, তখন নিয়মিত গোয়ালন্দ-নারায়নগঞ্জ ভায়া চাঁদপুর রুটে ষ্টীমার চলাচল করত।

গোয়ালন্দ বাংলাদেশের একটি বড় মৎস্য রপ্তানি কেন্দ্র এবং বড় ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানে প্রধানতঃ ধান, চাল, পাট এবং আঁখের বাণিজ্য হয়ে থাকে। নদীবন্দর এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের গুরুত্বের জন্য এখানে একটি ছোট শহর গড়ে উঠেছে। গোয়ালন্দ বর্তমানে থানা সদর। রেলওয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং থানা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এখানে কর্মরত রয়েছেন।

১৯৬৭-৬৮ সালে গোয়ালন্দ ঘাটের জনসংখ্যা ছিল ১২,০০০। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গোয়ালন্দ থানার জনসংখ্যা ৯১,৬৭৫ জন। সময়ের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতা, ঘাটে আগত বহিরাগত শ্রমিক, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর রাজধানীর সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একমাত্র জলপথ হওয়ায় ঘাটের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য ঘাট এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধিজনিত কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গোয়ালন্দে অতীতে এক সময় মহকুমা সদর দফতর ছিল কিন্তু পদ্মা নদীর ভাঙনজনিত কারণে সদর দফতর রাজবাড়ীতে স্থানান্তর করা হয়। পদ্মা নদী ক্রমাগত ভাঙতে শুরু করলে, মহকুমা সদর দফতরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অফিস নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবার উপক্রম হয়। ফলে সদর দফতর রাজবাড়ীতে স্থানান্তর করা হয়। রেলওয়ে ষ্টেশনের স্থানও বার বার পরিবর্তন করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, গোয়ালন্দের ইতিহাসের সঙ্গে পদ্মা নদীর ভাঙন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

উইলিয়াম উইলসন হান্টার-এর মতে, ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত গোয়ালন্দ ঘাট বিশাল বাঁধের উপর ভর করে জলের প্রান্ত সীমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু ১৮৭৫ সালের আগষ্ট মাসে, বাঁধের শক্ত ইট-শুরকী, রেলওয়ে ষ্টেশন, ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এরপর নদী তীর হতে দুই মাইল দূরে নতুন প্রান্তিক রেলওয়ে ষ্টেশন স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত পদ্মা নদীর ভাঙনজনিত কারণে গোয়ালন্দের অফিস-আদালতসহ বিভিন্ন স্থাপনা দশটি ভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করতে হয়।[২] গোয়ালন্দের অবস্থান সাত থেকে পনর মাইল পর্যন্ত দূরে নিয়ে যেতে হয়। প্রমত্তা পদ্মা নদীর ভাঙনের কারণে গোয়ালন্দের অনেক সমৃদ্ধ জনপদ নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে।

গোয়ালন্দের সরকারী বিদ্যালয়টির নাম নাজিরুদ্দীন উচচ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়, তৎকালীন গোয়ালন্দের মহকুমা প্রশাসক নাজিরুদ্দীনের

২। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page-353.

Dhaka University Institutional Repository

নাম অনুসারে। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সালে। এটি স্থাপন করেন একজন স্থানীয় জমিদার। বিদ্যালয়টি 'মধ্য ইংরেজী স্কুল' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হয়েছে। গোয়ালন্দে একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এটিও সরকারীকরণ করা হয়েছে। গোয়ালন্দ থানার একমাত্র কলেজটির নাম 'গোয়ালন্দ কামরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়'। এটি একটি ডিগ্রী কলেজ। স্থানীয় জনৈক কামরুল ইসলাম-যিনি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁর নাম অনুসারে কলেজটির নামকরণ করা হয়েছে। গোয়ালন্দে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, থানা হাসপাতাল, থানা ভূমি রাজস্ব অফিস, থানা শিক্ষা অফিস, থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা অফিস, থানা কৃষি অফিস, থানা পশু চিকিৎসালয়, থানা পশু সম্পদ অফিস, মৎস্য অফিস, থানা খাদ্য অফিস, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্পোরেশন অফিস, মহিউদ্দীন আনসার ক্লাব, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেলওয়ে মেইল সার্ভিস, পোষ্ট অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, জেলা পরিষদ ডাক বাংলো, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষ রেষ্ট হাউস, থানা প্রকৌশল অফিস, থানা হিসাব রক্ষণ অফিস, থানা পরিসংখ্যান অফিস, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর অফিস এবং থানা পর্যায়ে কর্মরত অন্যান্য অফিস সমূহ। বর্তমানে গোয়ালন্দে বেশ কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা কর্মরত আছে। এর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, কে. কে. এস অন্যতম।

গোয়ালন্দ থানা সদরে একটি বড় বাজার আছে। এখানে বেশিরভাগ বাঙালী ব্যবসায়ী এবং অল্প কিছু মারওয়ারী ব্যবসায়ী আছে। তবে পূর্বে এখানে বিপুল সংখ্যক মারওয়ারী ব্যবসায়ী ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তাঁরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। গোয়ালন্দ বাজারে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে, তবে দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিদিন বাজার বসে। শনি ও বুধবার এখানে হাট বসে। গোয়ালন্দ থানায় চারটি ইউনিয়ন রয়েছে- ছোট ভাকলা, দৌলতদিয়া, দেবগ্রাম ও উজানচর। ইউনিয়ন চারটির আয়তন ৫৮ বর্গমাইল।

দৌলতদিয়াঃ- রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ থানার একটি ইউনিয়ন। এটি পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত এবং এখানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষের ফেরী ও লঞ্চ ঘাট স্থাপিত হয়েছে। মূলতঃ এই ঘাট স্থাপনের কারণে স্থানটি সমধিক পরিচিতি লাভ করে। পদ্মা নদীর স্থান পরিবর্তনের কারণে পূর্বতন গোয়ালন্দ ঘাটটি পরবর্তীকালে দৌলতদিয়ায় স্থাপন করা হয়। দৌলতদিয়া ঘাট দিয়ে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও মালামাল, ফেরী ও লঞ্চযোগে রাজধানী ও দেশের অন্যান্য অংশে পরিবাহিত হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর অধিকাংশ যাত্রী ও মালামাল এই ঘাট দিয়ে পারাপার হয়। এই জন্য স্থানটি দক্ষিণ বঙ্গের প্রবেশদ্বার রূপে খ্যাত।

প্রকৃতপক্ষে, পদ্মানদীর বুকে জেগে ওঠা বিশাল চরের উপরে অবস্থিত দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের আয়তন ৪৮.০১ বর্গ কিলোমিটার। এখানে ৯৬টি গ্রাম রয়েছে। তিন কিলোমিটারের একটি পাকা রাস্তা, ত্রিশ কিলোমিটারের দশটি কাঁচা রাস্তা, একটি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, দুইটি হাট-বাজার, পূর্বে উল্লেখিত একটি

Dhaka University Institutional Repository

নৌবন্দর, ছত্রিশটি সমিতি এখানে রয়েছে। ইউনিয়নটির ৯০০০ একর আবাদি জমি চাষ করেছে ৩৪০৭টি পরিবার। কৃষি কাজে সহায়তা করছে চব্বিশটি গভীর ও সাতশত পঞ্চাশটি হস্তচালিত নলকূপ।

দৌলতদিয়া ইউনিয়নের বর্তমান জনসংখ্যা ৩০,০০০। সাতটি সরকারী, চারটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি মাদ্রাসা এখানে রয়েছে। এই ইউনিয়নের কাঁচা রাস্তাগুলো প্রধানতঃ বালুর তৈরী ও বালুর উপর নির্মিত হবার কারণে সামান্য বৃষ্টিপাতে নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বর্ষাকালে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ইউনিয়নের অনেক ফসল বিনষ্ট হয়।[৩]

রাজবাড়ী শহরঃ- বর্তমানে রাজবাড়ী জেলা সদর। ১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ রাজবাড়ী জেলায় রূপান্তরিত হয়। রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ থানা সদর থেকে নয় মাইল পশ্চিমে এবং ফরিদপুর জেলা সদর থেকে বিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। জেলায় রূপান্তরিত হবার পূর্বে রাজবাড়ী গোয়ালন্দ মহকুমার সদর দফতর ছিল। প্রকৃতপক্ষে, পূর্বে এই স্থানটি একগুচ্ছ গ্রামের সমষ্টি ছিল। ১৯২১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে এটি একটি মফস্বল শহর হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। তখন রাজবাড়ীর জনসংখ্যা ছিল ৭,২৭৫ জন। এর দুই বছর পর রাজবাড়ীতে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, রাজবাড়ী টাউন কমিটিতে চারটি ওয়ার্ড এবং এর আয়তন ছিল ৩.৫ বর্গমাইল ও জন- সংখ্যা ১৬,০৬৬ জন। বর্তমানে রাজবাড়ী দ্রুত বর্ধনশীল শহরে পরিণত হয়েছে। রাজবাড়ী পৌরসভায় তিনটি ওয়ার্ডের পরিবর্তে বর্তমানে নয়টি ওয়ার্ড করা হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানটির নাম রাজবাড়ী হয়েছে স্থানীয় বিখ্যাত রাজা সূর্যকুমারের নাম অনুসারে। এখানে একটি বড় রেলওয়ে ষ্টেশন রয়েছে যা ফরিদপুর, দৌলতদিয়া ঘাট, কুষ্টিয়া ও ভাটিয়াপাড়ার সঙ্গে রেলপথে সংযোগ সাধন করেছে। এই শহরে রাজবাড়ী সদর থানার প্রধান কার্যালয়ও রয়েছে। থানা পরিষদের বেশিরভাগ অফিস রাজবাড়ী শহরের অদূরে শ্রীপুর নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, প্রকৌশলী, কৃষি কর্মকর্তা, থানা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ভূমি অফিস, থানা হিসাব রক্ষন কর্মকর্তাসহ নানা পর্যায়ে কর্মরত অধিকাংশ অফিস অবস্থিত। থানা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় রাজবাড়ী শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। বর্তমানে থানা আদালতসমূহ জেলা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রাজবাড়ী সদর থানায় একটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা ছাড়াও চৌদ্দটি ইউনিয়ন রয়েছে।[৪]

৩। সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন।

৪। ইউনিয়নগুলো হলোঃ- (১) আলীপুর (২) বাণীবহ (৩) বরাট (৪) বসন্তপুর (৫) চন্দনী (৬) দাদশী (৭) খানখানপুর (৮) খানগঞ্জ (৯) মিজানপুর (১০) মুলঘর (১১) পাঁচুরিয়া (১২) রামকান্তপুর (১৩) শহীদ ওহাবপুর ও (১৪) সুলতানপুর। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজবাড়ী সদর থানার জনসংখ্যা ২,৬৩,৫৫৫ জন। এর মধ্যে গ্রামে বসবাসকারী ২,২১,৬৩১ ও শহরে বসবাসকারী ৪১,৯২৪ জন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী শহরের পাশে রাজবাড়ী সরকারী কলেজ অবস্থিত। এটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে কলেজটিতে উচচ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং কয়েকটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে পাঠদান করা হচেছ। রাজবাড়ী শহরের মধ্যে 'রাজবাড়ী আদর্শ মহিলা কলেজ' নামে একটি ডিগ্রী কলেজ সম্প্রতি জাতীয়করণ করা হয়েছে। রাজবাড়ী শহরের অনতিদূরে নব প্রতিষ্ঠিত দুইটি বেসরকারী মহাবিদ্যালয় রয়েছে।

একটি 'ডাঃ আবুল হোসেন মহাবিদ্যালয়', অপরটি 'আহমদ আলী মৃধা মহাবিদ্যালয়'। ডাঃ আবুল হোসেন মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণী খোলা হয়েছে।

রাজবাড়ী শহরের প্রাণকেন্দ্রে পাঁচটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি কলেজিয়েট স্কুল অবস্থিত। এর মধ্যে দুইটি বালিকা বিদ্যালয় ও তিনটি বালকদের জন্য। এছাড়া পৌর এলাকার মধ্যে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে- একটি বালিকাদের অপরটি বালকদের জন্য। রাজবাড়ী শহরের প্রধান সড়ক, রাজবাড়ী-ফরিদপুর সড়কের পাশে অবস্থিত 'রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়'। রাজবাড়ী জেলার অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ এই বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ সালে। প্রতিষ্ঠাকালীণ সময়ে এর নাম ছিল "দি গোয়ালন্দ হাই ইংলিশ স্কুল"। তারপর এক পর্যায়ে বিদ্যালয়টির নাম হয় 'রাজবাড়ী মডেল হাই স্কুল', বর্তমান নাম 'রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়'। রাজবাড়ী শহর থেকে পশ্চিম দিকে সরকারী কলেজে যাবার রাস্তার পাশে রাজবাড়ী আর, এস, কে, ইন্সটিটিউশন অবস্থিত। এটি রাজবাড়ী জেলার প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৮ সালে। এটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজবাড়ীর স্থানীয় জমিদার রাজা সূর্যকুমার। তাঁর নাম অনুসারেই বিদ্যালয়টির নাম দেয়া হয়েছে 'রাজা সূর্যকুমার ইন্সটিটিউশন'। রাজবাড়ী রেলগেট সংলগ্ন উচচ বিদ্যালয়টির নাম 'রাজবাড়ী ইয়াছিন উচচ বিদ্যালয়'। রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই বিদ্যালয়টি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজবাড়ী ফরিদপুর সড়কের পাশে অবস্থিত 'রাজবাড়ী সরকারী বালিকা উচচ বিদ্যালয়'। এই বিদ্যালয়টি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজবাড়ী শহরের প্রধান বালিকা বিদ্যালয় এটি। রাজবাড়ী রেল ষ্টেশন সংলগ্ন অপর একটি বালিকা উচচ বিদ্যালয় রয়েছে- এর নাম 'লেরে- বাংলা উচচ বালিকা বিদ্যালয়'।

রাজবাড়ী- গোয়ালন্দ নির্বাচনী এলাকার বর্তমান সংসদ সদস্য কাজী কেরামত আলীর (এম, পি) পিতা (প্রাক্তন এম, পি, এ) কাজী হেদায়েত হোসেনের নাম অনুসারে রাজবাড়ী শহরের বিনোদপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'কাজী হেদায়েত হোসেন বালিকা উচচ বিদ্যালয়'। রাজবাড়ী -ফরিদপুর সড়কের পাশে, রাজবাড়ী পৌরসভার সামনে স্থাপন করা হয়েছে 'অংকুর কলেজিয়েট স্কুল'। পৌরসভা পরিচালিত এই স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দান করা হয়। রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়ের পাশে রয়েছে 'রহিমুন্নেসা ইসলামী কিন্ডার গার্টেন'। এখানে ইসলামী আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা দান করা হয়। রাজবাড়ী শহরের পাশে লক্ষীকোল গ্রামে অবস্থিত 'আল্লাহ নেওয়াজ খায়রু একাডেমী'। এটি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। রাজবাড়ী শহরের এককালের বামপন্থী নেতা মরহুম আল্লাহ নেওয়াজ খায়রুর নামে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ নেওয়াজ খায়রু বর্তমান রাজবাড়ী পৌরসভার চেয়ারম্যান আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম-এর বড় ভাই। রাজবাড়ী শহরে

Dhaka University Institutional Repository

চারটি মাদ্রাসা এবং শহরতলী সোনাকান্দর গ্রামে একটি মাদ্রাসা রয়েছে। এই মাদ্রাসা-গুলোতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করছে।

রাজবাড়ী-ফরিদপুর সড়কের পাশে রাজবাড়ী জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জজ কোর্ট, দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালতসমূহ, সাব জজ কোর্ট, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, পৌরসভা কার্যালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের অফিস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয় অবস্থিত। রাজবাড়ী শহরে সোনালী, জনতা, অগ্রনী, রূপালী ব্যাংকের শাখা রয়েছে। সোনালী ও কৃষি ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয়সহ স্থানীয় শাখা রয়েছে। এছাড়া পূবালী ও উত্তরা ব্যাংকের শাখা রয়েছে। রাজবাড়ী শহরের ভবানীপুরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জেলা পর্যায়ের কার্যালয় অবস্থিত। শহরের সজ্জনকান্দায় উপ-কর কমিশনারের কার্যালয়, থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, কাষ্টমস কর্মকর্তার কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া শহরের একমাত্র ষ্টেডিয়াম ও জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তার কার্যালয় এখানে অবস্থিত। রাজবাড়ী শহরের বেড়াডাঙ্গা এলাকায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, শিশু বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও শিশু একাডেমী, পরিবার পরিকল্পনা উপ-পরিচালকের কার্যালয়, সঞ্চয় বিভাগের কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া সমাজসেবা বিভাগের উপ-পরিচালকের কার্যালয় ও থানা সমাজসেবা কার্যালয় এখানে অবস্থিত। রাজবাড়ী শহরের সজ্জনকান্দা এলাকায় একটি আধুনিক সদর হাসপাতাল অবস্থিত। এই হাসপাতালটির শয্যা সংখ্যা সম্প্রতি পঞ্চাশ থেকে একশততে উন্নীত করা হয়েছে। শহরের এই এলাকায় সিভিল সার্জন অফিস, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালকের কার্যালয় অবস্থিত।

শহরের বেড়াডাঙ্গা এলাকার তিন নম্বর সড়কে মাতৃ মঙ্গল কেন্দ্র, পৌরসভার উদ্যোগে নির্মিত শিশুপার্ক রয়েছে। রাজবাড়ী-ফরিদপুর সড়কের পাশে জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, জেলা সরকারী গণ-গ্রন্থাগার, সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলীর কার্যালয়, পাবলিক কল অফিস, জেলা তথ্য কর্মকর্তার কার্যালয় অবস্থিত। শহরের শ্রীপুরে টেলিফোন এক্সচেঞ্জসহ টেলিযোগাযোগ অফিস এবং রাজবাড়ী-ফরিদপুর সড়কের পাশে সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয় অবস্থিত।

রাজবাড়ী একটি বড় ব্যবসায় কেন্দ্র। অতীতে এখানে চারটি বরফকল, একটি শুষ্ক কার্বনিক বরফকল, বার্মা ইষ্টার্ন ও 'এসো' তেল কোম্পানীর বড় তেল ডিপো ছিল।[৫] বর্তমানে ছোট আকারে দুইটি বরফকল সক্রিয় রয়েছে। রাজবাড়ীতে প্রতিদিন বাজার বসে। বাজারের স্থায়ী দোকানগুলো সাপ্তাহিক বন্ধের দিন শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন খোলা থাকে। এদিন হোটেল ও ওষুধের দোকান খোলা থাকে। রাজবাড়ী বাজারে সপ্তাহে দুই দিন -বৃহস্পতিবার ও রবিবার হাট বসে। হাটবারে রাজবাড়ী শহরতলী, পার্শ্ববর্তী থানা, ছোট শহর ও গ্রাম থেকে রাজবাড়ী হাটে বিপুল পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী আমদানি ও ক্রয়-বিক্রয় হয়।

৫। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page-366.

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ীতে মানুষের ব্যবহার্য প্রায় সব জিনিস পাওয়া যায়। রাজবাড়ী পৌরসভার উদ্যোগে সরকারের "মাঝারী শহর উন্নয়ন প্রকল্পের" আওতায় রাজবাড়ী শহরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। রাজবাড়ী বাজারে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমনঃ- গরু হাট, মুরগী বাজার, মাছ বাজার, তরকারী বাজার, ডাল বাজার, আঁখের গুরের বাজার, কাপড় বাজার, স্বর্ণকারদের দোকান, পশুখাদ্য, ঝালাই কাজের দোকান।

রাজবাড়ী শহর এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে বর্তমান সংসদ সদস্য কাজী কেরামত আলী, প্রয়াত রাজা সূর্য কুমার, প্রয়াত আহমদ আলী মৃধা, প্রয়াত সংসদ সদস্য কাজী হেদায়েত হোসেন, প্রয়াত সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী, বিশিষ্ট জলতরঙ্গ বাদক বামনদাস গুহ রায়, প্রখ্যাত চিকিৎসক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজী বিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ কে. এম. এইচ. এস. সিরাজুল হক, এডভোকেট চিত্তরঞ্জন গুহ, ফকীর আব্দুর রশিদ প্রমুখ অন্যতম।

রাজবাড়ী শহর এলাকার বিস্তৃতি দক্ষিণে শ্রীপুর থেকে উত্তরে বিনোদপুর পর্যন্ত। পূর্বে রেলওয়ে লোকোশেড থেকে পশ্চিমে ভবানীপুর গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। রাজবাড়ী-ফরিদপুর প্রধান সড়কের দু'পাশে রাজবাড়ী জেলা শহরের প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। বিশেষতঃ মনোহরী, মুদিখানা, ফার্মেসী, কাপড়ের দোকান, স্বর্ণালংকার, পাদুকা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। রাজবাড়ী রেলগেট থেকে রাজবাড়ী কুষ্টিয়া মহা-সড়কের মোড় পর্যন্ত অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই এলাকায় লাইব্রেরী, ঘড়ি, হোটেল, হার্ডওয়্যার, মুদিখানা, বাদ্যযন্ত্র, মেটাল কারখানা, হোমিও ওষুধ, ষ্টুডিও, সিনেমা হলসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে।

রাজবাড়ী জেলা শহরে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয়েছে, শহরের পাশে বেড়াডাঙ্গা গ্রামে। এই গ্রামের এক, দুই ও তিন নম্বর রোডের দুই পাশে আবাসিক এলাকা অবস্থিত। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই এলাকায় বসবাস করেন। এই আবাসিক এলাকার বাড়ীগুলো আধুনিক স্থাপত্য শৈলী অনুসরণে নির্মাণ করা হয়েছে। রাজবাড়ী শহরের অন্যান্য আবাসিক এলাকা কাজীকান্দা, (কাজীকান্দা পূর্বে বলুয়ারচর ও কুমোরপাড়া নামে পরিচিত ছিল। জানা যায় এখানে কয়েক শত বছর পূর্বে অনেক কুমোর পরিবারের বসবাস ছিল)। সজ্জনকান্দা, ভবানীপুর, বিনোদপুরে অবস্থিত। এই সব আবাসিক এলাকায় প্রধানতঃ মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করেন। নগণ্য সংখ্যক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোকও এখানে বাস করেন। রাজবাড়ী শহরের আবাসিক এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত। পৌরসভার উদ্যোগে আবাসিক এলাকাগুলোর রাস্তা পাকা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ এবং বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজবাড়ী শহর ১৯৪৭ সালের পূর্বে প্রধানতঃ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু পরিবার ভারতবর্ষে চলে যায়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক হিন্দু পরিবার ভারতে গিয়ে আর ফিরে আসেননি।

Dhaka University Institutional Repository

এরপরেও অনেক হিন্দু জনসাধারণ রাজবাড়ী শহরে বসবাস করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ক্ষেত্রে তাঁরা সক্রিয়। রাজবাড়ী শহরে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে। বর্তমান রাজবাড়ী শহর থেকে দুই মাইল উত্তর পূর্বে লালগোলা গ্রাম। এগ্রামে নবাব শায়েস্তা খাঁন প্রেরিত সংগ্রাম সিংহের সেনাদল জলদস্যু দমনের জন্য অবস্থান করতো। সংগ্রাম সিংহের গোলাবারুদ রাখার জন্য প্রথমে গ্রামটি গোলাবাড়ী পরে লালগোলা নাম ধারণ করে।

রেলওয়ে নগরী হিসেবে অতীতে রাজবাড়ী খ্যাত ছিল। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত গোয়ালন্দ ঘাট থেকে কলকাতা পর্যন্ত ট্রেন যোগাযোগ ছিল। বর্তমানেও রাজবাড়ী একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল ষ্টেশন। শহরের মধ্যে প্রায় এক মাইল এলাকা জুড়ে-নিউকলোনি, লোকো কলোনি ও রেলওয়ে হাসপাতাল কলোনির অভ্যন্তরে ছয়শত পরিবার বসবাস করতে পারে এমন ছয়শত ইউনিটের রেলওয়ে কোয়ার্টার রয়েছে। কোয়ার্টারগুলোর মধ্যে একক এবং দ্বৈত কোয়ার্টার আছে। এছাড়া রাজবাড়ী রেলষ্টেশনের পাশে "রেলওয়ে অফিসার্স রেষ্ট হাউস" ও "সিনিয়র সাব-অর্ডিনেট রেষ্ট হাউস" আছে। রাজবাড়ী রেল প্রশাসনের প্রধান কর্মকর্তা সহকারী প্রকৌশলী। তাঁর অধীনে বিভিন্ন বিভাগে সাতজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী আছেন। বিভাগগুলো হলোঃ- বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, সংকেত। যান্ত্রিক বিভাগ দুই ভাগে বিভক্তঃ- (১) লোকো (২) ক্যারেজ। এছাড়া রেলের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ রাজবাড়ীতে বসবাস করেন। রাজবাড়ী শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি শিল্প এলাকা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

* শিল্প নগরীর বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে অর্থনৈতিক অবস্থা শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

বাণীবহঃ- রাজবাড়ী জেলা সদর থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বাণীবহ-রাজবাড়ী জেলার সদর থানার একটি ইউনিয়ন। এখানে আটদাপুনিয়া উচচ বিদ্যালয় নামে একটি উচচ বিদ্যালয় ও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। উচচ বিদ্যালয়টিতে সহশিক্ষা বিদ্যমান। বাণীবহতে একটি ছোট বাজার আছে। এই বাজারে কিছু স্থায়ী দোকান আছে যা প্রতিদিন খোলা থেকে। শুক্রবার ও সোমবার এখানে হাট বসে। হাটবারে বাণীবহ ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক লোক এখানে বিভিন্ন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে। বাণীবহ বাজারের প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মুদিখানা, ফার্মেসী, চাউল, কাপড়, মিষ্টির দোকান প্রভৃতি অন্যতম। এছাড়া হাটবারে অস্থায়ীভাবে নিত্য-প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়। বাণীবহ বাজারের বেশিরভাগ ব্যবসায়ী স্থানীয়। হাটবারে অল্পকিছু বাইরের ব্যবসায়ী এসে এখানে কেনা-বেচা করে।

বাণীবহ ইউনিয়ন প্রধানতঃ হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পর বেশ কিছু হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এখানকার অনেক হিন্দু পরিবার ভারতে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাদের অনেকেই আর ফিরে আসেনি। বাণীবহ ইউনিয়ন বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে এখানে একদা একজন জমিদারের বাসস্থানের কারণে। বাণীবহ তথা

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র রাজবাড়ী অঞ্চলের প্রখ্যাত জমিদার বাবু গীরিজা শংকর মজুমদার বাণীবহের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বর্তমান রাজবাড়ী জেলার প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ 'রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়' ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান রাজবাড়ী শহরের অধিকাংশ এলাকাসহ রাজবাড়ী থেকে বাণীবহ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত জমির মালিক ছিলেন তিনি।[৬]

১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাগের অব্যবহিত পরে জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদার পরিবার-পরিজনসহ ভারতে চলে যান। তিনি যাবার সময় তাঁর প্রজাদের মধ্যে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি বিতরণ করে যান বলে জানা যায়। বর্তমানে তাঁর বাড়ী যথাযথ সংস্কারের অভাবে কালের নীরব সাক্ষী হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বাণীবহে তহশীল অফিস ও একটি ফাজিল মাদ্রাসা আছে।

লক্ষীকোলঃ-রাজবাড়ী জেলার সদর থানার পৌর এলাকায় অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে 'আল্লাহ নেওয়াজ খায়রু একাডেমী' নামে একটি উচচ বিদ্যালয়, একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি ডাকঘর আছে। লক্ষীকোল গ্রামটি বিশেষভাবে পরিচিত হয়, যাঁর নামে রাজবাড়ী জেলার নামকরণ করা হয়েছে সেই রাজা সূর্যকুমার রায়বাহাদুরের বাড়ী এই গ্রামে অবস্থিত হবার কারণে রাজা সূর্যকুমার এই অঞ্চলের বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় লক্ষীকোল গ্রামে নিয়মিত বাজার বসত এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হতো। লক্ষীকোল গ্রামের পাশে দূর্গাপুরে ষ্টীমার ঘাট ছিল। এই ঘাট থেকে লক্ষীকোলের উপর দিয়ে রেল যোগাযোগ ছিল কলকাতার সঙ্গে। বৃটিশ শাসনামলে পদ্মা নদী লক্ষীকোল গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহমান ছিল। বর্তমানে পদ্মা নদী অনেক দূরে সড়ে গেছে এবং রেললাইনেরও অস্তিত্ব নেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লক্ষীকোল গ্রামে রাজা সূর্যকুমারের বাড়ীতে তাঁর পুত্র কুমার বাহাদুর অবস্থান করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি পরিবার-পরিজন সহ শহরে চলে আসেন। রাজা কুমার বাহাদুরের উত্তরাধিকারীগণ পরবর্তীকালে লক্ষীকোল রাজবাড়ীর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দেন। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী এই রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট নেই।

লক্ষীকোল গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পর অনেক হিন্দু জনসাধারণ ভারতে চলে যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অনেক হিন্দু জনগণ দেশ ত্যাগ করেন। বর্তমানে এই গ্রামে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। লক্ষীকোল রাজবাড়ী প্রাঙ্গনে প্রতিবছর বৈশাখ মাসে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী এই মেলাটি রাজা সূর্যকুমারের জীবদ্দশায় বড় আকারে অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমানেও এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিবছর বৈশাখ মাসের প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবারে রাজবাড়ী প্রাঙ্গনে মেলা বসে। এই মেলায় লোক ঐতিহ্য সম্পন্ন নানা পণ্যের সমাবেশ ঘটে। নাগরদোলা, পুতুল নাচ প্রভৃতি মেলার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই মেলায় অংশগ্রহণ করে।

৬। "স্মরণিকা" রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি সাংখ্যা-১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

খানখানাপুরঃ- রাজবাড়ী জেলার সদর থানার একটি ইউনিয়ন। এটি মূল পদ্মা নদীর ছোট শাখা 'মরা পদ্মা' নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে এটি মৃত প্রায় বলে, এই শাখাটি মরা পদ্মা নামে পরিচিত। খানখানাপুরে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ষ্টেশনটি রাজবাড়ী-ফরিদপুর রেললাইনে অবস্থিত। খানখানাপুরের আয়তন ১,৩৭১.৮৬ একর।

খানখানাপুর এতদঞ্চলের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মৌলভী তমিজুদ্দীন খাঁনের জন্মস্থান। তিনি সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পীকার ছিলেন।[৭] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী খানখানাপুরের সন্তান। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বি, জে, এম, সি,)-এর চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ পুলিশের এ, আই, জি (আর এন্ড এম) এম, এন, ভক্ত খানখানাপুরের বাসিন্দা।

বেল পূর্বে কিছু স্বনামধন্য খান পরিবারের আবাসস্থল হবার কারণে এই স্থান খ্যাতি লাভ করে। মোগল শাসনামলে জনৈক আমির খাঁন-কে এই অঞ্চল শাসন করার জন্য প্রেরণ করা হয় এবং তাঁর শাসনাধীন পরগনার নাম হয় আমিরাবাদ।[৮] এখানে দুইটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। একটি ছেলেদের অপরটি মেয়েদের জন্য। এছাড়া ফোরকানিয়া ও কোরানিয়া মাদ্রাসা, দুইটি মক্তব, একটি মডেল প্রাইমারী স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের অফিস, পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র, কৃষি অফিস, সরকারী বীজ ভান্ডার, পঁচাত্তর একর ব্যাপী কৃষি ব্লক ফার্ম, তহশীল অফিস, কমিউনিটি সেন্টার এখানে অবস্থিত। খানখানাপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে প্রধানতঃ পাট ক্রয়-বিক্রয় হয়। বি, জে, এম, সি-এর পাট ক্রয় কেন্দ্র, র‍্যালি ব্রাদার্স, জুট বেইলিং এ্যান্ড শিপিং অফিস এখানে অবস্থিত। এছাড়া অন্যান্য পাট কোম্পনীর এজেন্সী এখানে রয়েছে। খানখানাপুরে পাট ক্রয় কেন্দ্র হবার কারণ এই অঞ্চলে ব্যাপক পাট উৎপন্ন হয়। এই পাট গুণগত মানে উন্নত। এছাড়া খানখানাপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। পাশে লৌলতদিয়া ঘাটের অবস্থানের কারণে স্থানটির সাথে জলপথে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। এছাড়া খানখানাপুর সড়ক ও রেলপথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যুক্ত। এখানকার ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ স্থানীয়। অল্প কিছু অস্থানীয় ব্যবসায়ী আছে। তাঁরা প্রধানতঃ এখান থেকে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করে অন্যস্থানে চালান দেয় এবং অন্য স্থান থেকে ক্রয় করে এখানে বিক্রয় করে। খানখানাপুর বাজারের প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাটগুদাম, মুদিখানা, মনোহরী, ফার্মেসী, কাপড়, জুতা, লাইব্রেরী প্রভৃতির দোকান অন্যতম। এখানে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা রয়েছে।

এই ইউনিয়নের খানখানাপুর গ্রামসহ অন্যান্য গ্রামগুলোতে মুসলিম-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। তবে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পূর্বে খানখানাপুরে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাস ছিল বলে জানা যায়। ১৯৪৭ সালের পর এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় অংশ পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায়। এখানে ফুলতলার হাট

৭। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page-357.
৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

নামে একটি হাট সপ্তাহে দুই দিন- মঙ্গলবার এবং শুক্রবার বসে। এছাড়া প্রতিদিন বাজার বসে। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, নবাবী আমলে সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকে এই পরগনার আমির এখানে একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ রোপণ করেন। সেই থেকে এই হাট ফুলতলার হাট হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[১]

খানখানাপুর সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট অগ্রসর। রামকানাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট এখানে প্রতিবছর আয়োজিত হয়। এই প্রতিযোগিতার সুনাম রাজবাড়ী জেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলায় ছড়িয়ে আছে। কিছুকাল বন্ধ থাকার পর বর্তমানে টুর্নামেন্ট পুনরায় শুরু হয়েছে। "খানখানাপুর রিমঝিম খেলাঘর আসর" নামে কিশোর ফুটবল ক্লাব রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত "কাজী হেদায়েত হোসেন মেমোরিয়াল শিল্ড" টুর্নামেন্টে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। বাংলা বৈশাখ মাসে বিপুল সংখ্যক হিন্দু পুণ্যার্থী খানখানাপুরে অবস্থিত অন্নপূর্ণা মন্দিরে পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়।

পাঁচুরিয়াঃ- রাজবাড়ী জেলার সদর থানায় অবস্থিত এই স্থানে রেলওয়ের জংশন ষ্টেশন রয়েছে। পাঁচুরিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনটি রাজবাড়ী-ফরিদপুর, রাজবাড়ী-দৌলতদিয়া ঘাট, দৌলতদিয়া ঘাট-গোড়াদহ ষ্টেশনের মধ্যে রেলপথে সংযোগ সাধন করেছে। এই স্থানটি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে, পদ্মা নদীর তীরবর্তী হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য।

এই স্থানে এবং সংলগ্ন মুকুনদিয়া, কুঠি পাঁচুরিয়া, ভাকলা অঞ্চলে বেশ কয়েকজন বড় ভূ-স্বামীর বসবাস এবং সমাজ উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক, যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান স্থানটির মর্যাদা এক সময়ে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছিল। পাঁচুরিয়া সংলগ্ন কুঠি পাঁচুরিয়ার স্বাশাসিত আত্মউন্নয়ন কেন্দ্র তৎকালীন সমগ্র ফরিদপুর জেলার মধ্যে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান ছিল। ক্রীড়া ক্ষেত্রে এই স্থানটি রাজবাড়ী জেলার মধ্যে অগ্রগামী। এখানে নিয়মিত ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিছু বিখ্যাত খেলোয়ার এটি পরিচালনা করে থাকেন। রাজবাড়ী সদর থানার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন স্থান হচ্ছে পাঁচুরিয়া। মাদ্রাসা, ডাকঘর এবং সরকারী নবগ্রাম তহশীল অফিস এখানে আছে। পাঁচুরিয়াতে প্রতিদিন বাজার বসে। নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস এখানে পাওয়া যায়। পাঁচুরিয়ার অদূরে রয়েছে বরাট ইউনিয়ন। এখানকার বরাট হাই স্কুল অত্যন্ত প্রাচীন একটি বিদ্যাপীঠ। এই স্কুলের অনেক ছাত্র ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক হিসেবে পরবর্তীকালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুনাম অর্জন করেছেন। পাঁচুরিয়া রেলষ্টেশন থেকে রেললাইন ধরে ফরিদপুরের দিকে কিছুদূর গেলে হাজড়াতলা নামক স্থানে প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে বড় মেলা বসে। এই মেলায় লোক ও কারুশিল্পের বিভিন্ন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক পূণ্যার্থী পারলৌকিক মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হয়। পাঁচুরিয়া বর্তমানে পূর্বের তুলনায় ক্ষয়িষ্ণু। এক সময়ের প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলো বর্তমানে নেই। এখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য কারণে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছেন।

১। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page-358.

Dhaka University Institutional Repository

বেলগাছিঃ- বর্তমান রাজবাড়ী শহর থেকে ৫/৬ মাইল পশ্চিমে একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান বেলগাছি। স্থানটি পদ্মা নদীর কাছাকাছি অবস্থিত। এখানে অতীতে ফকীর-সন্যাসী আন্দোলন গড়ে উঠে। বেলগাছিতে বর্তমানেও রথের মেলা বসে রামজীবনের নামে। রাজা সীতারামের পতন হলে এ অঞ্চল নাটোরের রাজা রামজীবনের অধিকারে আসে বলে জানা যায়। ইংরেজ শাসনামলে বেলগাছিতে একটি পরগণার উদ্ভব হয়।

বালিয়াকান্দিঃ- রাজবাড়ী জেলার অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ থানা বালিয়াকান্দি। রাজবাড়ী জেলা সদর থেকে পাকা সড়ক পথে বালিয়াকান্দি থানা সদরের যোগাযোগ রয়েছে। সরকারের থানা সহযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই সড়কটির উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। বালিয়াকান্দি থানা কেন্দ্র চন্দনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

বালিয়াকান্দি থানার নামকরণ করা হয়েছে মূলতঃ 'বালি' এবং 'কান্দি' শব্দ দুইটি থেকে। 'বালি' শব্দটি 'বালু' শব্দের আঞ্চলিক রূপ এবং 'কান্দি' শব্দের অর্থ নদীর চর। এথেকে ধারণা করা যায়, এলাকাটি কোন এক সময় বিপুল বালু সমৃদ্ধ নদীর চরাঞ্চল ছিল। সাতটি ইউনিয়ন নিয়ে বালিয়াকান্দি শহর এলাকার বিস্তৃতি পূর্বে বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাক অফিস থেকে পশ্চিমে ওয়াপদা অফিস পর্যন্ত এক কিলোমিটার, উত্তরে তালপট্টি বাজার (সুপার মার্কেট) থেকে দক্ষিণে মহাশ্মশান এবং থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার বিস্তৃত। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পূর্বে বালিয়াকান্দি একটি ছোট শহর ছিল। ঐ সময় এটি হিন্দু প্রধান এলাকা ছিল। বর্তমানে শহর সম্প্রসারিত হয়েছে। বালিয়াকান্দি গ্রাম ও ইউনিয়নে জমিদার লাল মোহন চৌধুরী, প্রভাষ লাহিড়ী প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাসস্থান ছিল। ১৯৪৭ সালের পূর্বে বালিয়াকান্দি শহর রানী হর্ষমূখী ষ্টেটের আওতাধীন ছিল বলে জানা যায়। বালিয়াকান্দি শহরের আবাসিক এলাকা প্রধানতঃ শহরের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং চন্দনা নদীর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। তবে চন্দনা নদীর দুই তীরের কাছাকাছি আদি বাসস্থান ছিল। বালিয়াকান্দি শহর চন্দনা নদীর দুই তীরের পাশ দিয়ে গড়ে উঠেছে। নদীর উপর সেতু নির্মান করে শহরের দুই অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। মূল বাজার চন্দনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বালিয়াকান্দি শহরের প্রধান সড়কের পাশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে কাঠের আসবাবপত্রের দোকান, হোটেল, ষ্টীলের সামগ্রী নির্মাণের দোকান, হার্ডওয়্যার, ষ্টুডিও, ডেন্টাল ক্লিনিক, কাপড়ের দোকান, লাইব্রেরী, মুদিখানা, মনোহরী, সার, ডেকোরেটর, স্বর্ণকার, কাঁসাপিতল ইত্যাদি দোকান প্রধান। এছাড়া বালিয়াকান্দি বাজারে নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া যায়।

বালিয়াকান্দি থেকে দুই মাইল দুরত্বে আড়কান্দি ষ্টেশন। বালিয়াকান্দি সড়ক পথে রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানা এবং পার্শ্ববর্তী ফরিদপুরের সঙ্গে সংযুক্ত। বালিয়াকান্দি থানা সদরে একটি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ আছে। এটি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বালিয়াকান্দি উচচ বিদ্যালয় ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া এখানে একটি বালিকা উচচ বিদ্যালয়, হাফিজিয়া মাদ্রাসা, মডেল প্রাইমারী স্কুল, পাবলিক ক্লাব এবং লাইব্রেরী আছে। পুলিশ ষ্টেশন, দাতব্য চিকিৎসালয়, পরিবার-পরিকল্পনা কেন্দ্র, পশু হাসপাতাল, থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প, সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিস, বিবাহ নিবন্ধকের অফিস, ইউনিয়ন কাউন্সিল

Dhaka University Institutional Repository

অফিস, কমিউনিটি সেন্টার, ডাক বাংলো, ঈদগাহ ময়দান, কবরস্থান, মহাশ্মশান আছে। বিচার বিভাগীয় আদালত ব্যতীত যে সব অফিস থানা পর্যায়ে কর্মরত তার সব অফিসই বালিয়াকান্দিতে রয়েছে। মৃৎশিল্প, কর্মকার, স্বর্ণকার, জেলে প্রভৃতি পেশাজীবী সম্প্রদায় এখানে বসবাস করে। বালিয়াকান্দি থানা সদরে সপ্তাহে দুই দিন-রবি এবং বৃহস্পতিবারে হাট বসে। প্রতি রবিবারে গরু-ছাগলের হাটও বসে।

নলিয়া জামালপুরঃ- রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত জামালপুর একটি ইউনিয়ন। এটি চন্দনা নদীর তীরে অবস্থিত এবং থানা সদরের সাথে সড়ক পথে যুক্ত। জামালপুরে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন এবং বাজার রয়েছে। এখানে একটি ছোট রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, একটি রেলওয়ে ডিসপেনসারী, স্থানীয় সরবরাহ বিভাগের দুইটি গোডাউন, একটি প্ল্যান্ট প্রটেকশন অফিস, একটি মডেল প্রাইমারী স্কুল, একটি পাবলিক ক্লাব এবং লাইব্রেরী, পোষ্ট অফিস, কৃষি ফার্ম, কমিউনিটি সেন্টার, তহশীল অফিস, থানা সমবায় অফিস, বি, জে, এম, সি-র পাট ক্রয় কেন্দ্র অবস্থিত। এই স্থানে বি, জে, এম, সি-র পাট ক্রয় কেন্দ্র হবার কারণ এই এলাকায় প্রচুর উন্নতমানের পাট উৎপন্ন হয়। এছাড়া এই স্থানটি সড়ক এবং রেলপথে দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে যুক্ত। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এখানে পাট ক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হবার অন্যতম কারণ। জামালপুর বাজারের পাশে বালিকা উচচ বিদ্যালয়, সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলেজ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এখানে চালের মিল, ময়দার মিল, আইসক্রীম ফ্যাক্টরী, কিছু কুটির শিল্প যেমন- তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প এবং বেশ কিছু তেল উৎপাদনকারী ঘানি শিল্প রয়েছে। এই এলাকায় তিনটি হাট বসে। জামালপুর বাজার দৈনিক দুইবার এবং হাট প্রতি সপ্তাহের রবি এবং বুধবারে বসে।

নলিয়াঃ-রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দ থানার জামালপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৩৫৫.৩৩ একর। এখানে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এর নাম নলিয়াগ্রাম। এই গ্রামটি অত্যন্ত পুরনো এবং ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পূর্বে এর অধিবাসী ছিলেন প্রধানতঃ শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়। পূর্বে গ্রামটি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

বিখ্যাত জোড় বাংলা মন্দির এই গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরটির নির্মাণশৈলী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার এবং এর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।[১০] বর্তমানে যথাযথ সংস্কারের অভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচেছ। এই গ্রামে নলিয়া এস, এম, ইন্সটিটিউশন (শ্যামা মোহন ইন্সটিটিউশন) নামে একটি উচচ বিদ্যালয় আছে। এটি ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন রায় সাহেব এস, এন, চক্রবর্তী (সুরেন্দ্র মোহন চক্রবর্তী), তাঁর পিতার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার উদ্দেশ্যে। এই গ্রামে একটি বালিকা উচচ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, একটি পোষ্ট অফিস আছে।

১০। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page-363.

Dhaka University Institutional Repository

এখানে মাঘ মাসের মাঘী পূর্ণিমার দিন থেকে তিন দিন গ্রামীণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লোক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়। মেলায় ব্যাপক দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। নলিয়া উচচ বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি ঘাট বাঁধানো বড় দীঘি এবং আমবাগান আছে। এছাড়া এখানে "দয়ামায়া মন্দির" নামে প্রাচীন একটি মন্দির রয়েছে।

কুর্সিঃ- রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকন্দি থানার নবাবপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। গ্রামটি বর্তমানে মুসলিম অধ্যুষিত। ১৯৪৭ সালের ভারত- পাকিস্তান বিভাগের পূর্বে এই গ্রামে কিছু সংখ্যক হিন্দু পরিবারের বসবাস ছিল। গ্রামটি অতীতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল।

এই গ্রামে বরিশালের একজন জমিদারের কাছারী বাড়ী ছিল এবং তার পাশে বড় আকারের একটি দীঘি ও কয়েকটি পুকুর জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জমিদারের পক্ষ থেকে খনন করা হয়। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর কাছারী বাড়ীটি পূর্বের জমিদারের উত্তরাধিকারীগণ বিক্রি করে দেন এবং ক্রেতা বাড়ীর ইট, কাঠ প্রভৃতি বিক্রি করার ফলে এখানে বড় ইমারতের কোন চিহ্ন বর্তমানে নেই। কুর্সি গ্রামে আনন্দ বাজার নামে একটি বাজার রয়েছে। এখানে নিত্য-প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় হয়। বালিয়াকান্দি থানা সদর থেকে সড়ক পথে সোনাপুর হয়ে পাংশা যাবার পথে আনন্দ বাজার অতিক্রম করে যেতে হয়। কুর্সি গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীর উপজীবিকা কৃষি। অল্প সংখ্যক ছোট ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী রয়েছে।

পদমদীঃ-রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার নবাবপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত। ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পূর্বে এই গ্রামে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু জনগণের বসবাস ছিল। পদমদী গ্রামে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গুচ্ছ গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামটির অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী রয়েছে। এই গ্রামে শুক্রবার ও সোমবারে হাট বসে। এই হাটে কৃষি পণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হয়। পদমদী গ্রামের অবস্থান চন্দনা নদীর নিকটবর্তী।

পদমদী গ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে মূলতঃ এই গ্রামে উপমহাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের পিতৃভূমি এবং নিজ বাড়ীর অবস্থানের কারণে। মীর মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়ার লাহিড়ীপাড়া গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করলেও লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছেন পদমদী গ্রামে। এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং এই গ্রামে তাঁর সমাধি রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাংলা একাডেমী পদমদী গ্রামে "মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি কেন্দ্র" নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলী সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের চাচাতো ভাই। তিনি জনগণের সুবিধার্থে বিশাল দীঘি ও পুকুর খনন করেন এই গ্রামে। এই অঞ্চলের মুসলিম জমিদার, নবাব মীর মোহাম্মদ আলীর নবাব ষ্টেটে মীর মশাররফ হোসেনের কর্মক্ষেত্র ছিল। পদমদীর নবাব

Dhaka University Institutional Repository

মীর মোহাম্মদ আলী, ১৮০১ সালে কলকতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে কুষ্টিয়াতে স্যার সৈয়দ আহমদের অনুসরণে একটি ইংলিশ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বাংলাদেশের প্রথম ইংলিশ হাই স্কুল এবং উপমহাদেশের দ্বিতীয় ইংলিশ হাই স্কুল। ১৮৪০ সালে নবাব মীর মোহাম্মদ আলী পদমদীতে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা সমগ্র রাজবাড়ী জেলার প্রথম স্কুল।[১১] পদমদী গ্রামের নবাব বাড়ী প্রাঙ্গনে প্রতি বছর বৈশাখ মাসে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এটি স্থানীয়ভাবে নবাববাড়ী মেলা নামে পরিচিত। এই মেলায় গ্রামীণ লোক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী সহ অনেক পন্যের আমদানি ও ক্রয়-বিক্রয় হয়।

রামদিয়াঃ-রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার ঐতিহ্যবাহী একটি গ্রাম রামদিয়া। গ্রামটি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রধানতঃ হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। বেশ কিছু ধনাঢ্য হিন্দু পরিবারের বাস ছিল এখানে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গ্রামটি ব্যাপকভাবে গণহত্যার শিকার হওয়ায় অনেক হিন্দু পরিবার পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায়। বর্তমানেও বেশ কিছু হিন্দু পরিবার এই গ্রামে বাস করেন।

রামদিয়া গ্রামে একটি উচচ বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়টির নাম 'রামদিয়া উচচ বিদ্যালয়'। এছাড়া এই গ্রামে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। রামদিয়া গ্রামে একটি বাজার আছে। অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে বাজারটি এখনও জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র রূপে পরিচিত। নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ অনেক মালামাল এই বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। রামদিয়া গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। এখানে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, যা রামদিয়া ষ্টেশন নামে পরিচিত। এই ষ্টেশনটি কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া রেললাইনে অবস্থিত। রামদিয়া গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ষ্টেশনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সড়কপথে এই গ্রামের সঙ্গে জেলার অন্যান্য অংশের যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও খেলাধুলায় এই গ্রাম একদা সমৃদ্ধশালী ছিল বলে জানা যায়। রামদিয়ার পাশ দিয়ে ঐতিহ্যবাহী চন্দনা নদী বয়ে গিয়েছে। স্থানটির সঙ্গে সড়কপথ, রেলপথ ও জলপথে যোগাযোগ সহজ হবার জন্য এটি একটি ব্যবসাকেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে।

পাংশা পৌরএলাকাঃ-রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানায় পাংশা পৌরসভা অবস্থিত। পাংশা পৌরসভায় সাবেক পাংশা ইউনিয়ন অবস্থিত ছিল। এখানে একটি মডেল থানা (পুলিশ ষ্টেশন), একটি উচচ বিদ্যালয়, পাংশা বালিকা উচচ বিদ্যালয়-(স্থাপিত ১৯৬৬ সাল), নব প্রতিষ্ঠিত পাংশা মহিলা কলেজ, একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পাবলিক লাইব্রেরী অবস্থিত। এখানে অবস্থিত পাবলিক লাইব্রেরীগুলোর মধ্যে একটি হলো 'এয়াকুব আলী স্মৃতি পাঠাগার'। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরীর স্মরণে এটির নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়া 'এয়াকুব আলী চৌধুরী বিদ্যাপীঠ' নামে একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করা হয়েছে ১৯৮৫ সালে। পাংশা পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত জর্জ উচচ বিদ্যালয়টির পাশেই ছাত্রাবাস রয়েছে।

১১। "স্মরণিকা", রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

পাংশায় থানা পর্যায়ে কর্মরত প্রায় সকল অফিস ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা রয়েছে। থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, থানা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন কেন্দ্র, সাব-রেজিষ্ট্রার অফিস, থানা শিক্ষা অফিস, থানা কৃষি অফিস, থানা পশু সম্পদ উন্নয়ন অফিস, থানা মৎস্য অফিস, থানা পশু হাসপাতাল, জনস্বাস্থ্য অফিস, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পৌরসভা অফিস, একটি কমিউনিটি সেন্টার, জেলা পরিষদ ডাকবাংলো, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস এখানে রয়েছে। পাংশায় একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ষ্টেশনটি রেলওয়ে লাইন দ্বারা দৌলতদিয়া-কুষ্টিয়ার সাথে যুক্ত। পাংশা রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন 'মৈশালা বাজার' নামে একটি বাজার আছে। এখানে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়। এছাড়া পাংশা থানার প্রধান বাজার ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র পাংশা পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত। গুরুত্বপূর্ণ এই বাজার প্রতিদিন বসে। এখানে পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নামে একটি কলেজ আছে। এই কলেজে কয়েকটি বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা হয়েছে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে। এই স্থানটি টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন দ্বারা রাজবাড়ী জেলা এবং দেশ-বিদেশের অন্যান্য স্থানের সাথে সংযুক্ত।

এখানকার প্রসিদ্ধ মিষ্টি 'পাংশার চমচম' নামে খ্যাত। পাংশার চানাচুরের সুনাম রাজবাড়ী জেলা অতিক্রম করে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্থানটির সমুজ্জল ঐতিহ্য রয়েছে। দেশ কয়েকটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে রয়েছে।[১২]

বাগমারা-বাহাদুরপুরঃ-রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। এই গ্রামে একটি উচচ বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়টির নাম শহীদ খবিরুজ্জামান উচচ বিদ্যালয়। এটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত।

শহীদ খবিরুজ্জামান ১৯৪৯ সালে বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আবদুল জব্বার মৃধা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় তিনি ছাত্র ছিলেন। ১৯৭১ সালের মে মাসে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং ফ্রগম্যান হিসেবে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন বন্দরে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। ১২ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে তিনি ফরিদপুরের টেকেরহাটের কুমার নদীতে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে "বীর বিক্রম" খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাঁর নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত উচচ বিদ্যালয়টি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। বাহাদুরপুর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

১২। সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন।

এই গ্রামে একটি বাজার আছে। এখানে শনি ও বুধবারে হাট বসে। এছাড়া প্রতিদিন সকালে বাজার বসে। সোমবার এবং শুক্রবার সারাদিন বাজার থাকে। এই বাজারে স্থায়ী কিছু দোকান রয়েছে। মুদিখানা, লাইব্রেরী, ফার্মেসী, কাপড়ের দোকান, সু-ষ্টোর, দর্জি প্রভৃতির দোকান আছে। এই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। বাহাদুরপুর গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত। এখানে প্রায় দুইশত বছরের পুরনো একটি মসজিদ আছে। এই গ্রামে বাংলা আশ্বিন মাসের শেষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লোকজ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ নানা পণ্য-সামগ্রীর প্রদর্শনী ও ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। বাহাদুরপুর গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। গ্রামটি পাংশা থানা সদরের সাথে সড়ক পথে যুক্ত। এই সড়কে বাস, টেম্পো, ভ্যান ইত্যাদি যানবাহন চলাচল করে।

বাগমারা-বাহাদুরপুর গ্রামে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক কাজী আব্দুল ওদুদ, প্রাক্তন শিক্ষক ও সংসদ সদস্য মোসলেম উদ্দীন মৃধা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হেনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ও জনপ্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ডঃ সনজিদা খাতুন রয়েছেন। পঁচিশটি গ্রাম নিয়ে বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।

<u>হাবাসপুর</u>ঃ- রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার হাবাসপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়টির নাম হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ উচ্চ বিদ্যালয় (কে, বি, রাজ, উচ্চ বিদ্যালয়)। এটি একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ।

হাবাসপুর তথা এতদঞ্চলের গ্রাম একদিন ছিল পদ্মা বক্ষে জেগে ওঠা এক উষর বালুচর। বালুচরে পলিমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল গ্রাম-জনবসতি। নিরক্ষর মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করল। ১৮৮০ সালে এই গ্রামেরই সন্তান বাবু প্রসন্ন কুমার কুন্ডু স্থাপন করলেন এক ছাত্র বৃত্তি স্কুল। এই স্কুলের বুকেই উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বপ্নসাধ নিহিত ছিল। মরহুম শাহাদৎ আলী খাঁ, প্রয়াত বাবু নিবারন চন্দ্র পাল প্রমুখ উচ্চাকাঙ্খী যুবকের প্রচেষ্টায় ১৯০০ সালে ছাত্রবৃত্তি স্কুলটি উন্নীত হয় মধ্য ইংরেজী স্কুলে। তখন স্কুলের অবয়ব ছিল একখানা করগেট টিনের দুই কক্ষ বিশিষ্ট চালাঘর। এই অঞ্চলটি মুর্শিদাবাদের কাশিম বাজার জমিদারী সেরেস্তার অধীন ছিল। কাশিম বাজার এষ্টেটের মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী ১৯১৭ সালে জমিদারী পরিদর্শনে হাবাসপুরে আসেন। মহারাজার সামনে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে উপস্থিত হন সে সময়ের অকুতোভয় তরুন প্রমথ কুমার কুন্ডু, প্রিয় নাথ কুন্ডু, অভয় চন্দ্র বিশ্বাস, কৈলাশ চন্দ্র দত্ত, নকুলেশ্বর ঘোষ। মহারাজা এদের ঐকান্তিকতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্প লক্ষ্য করে প্রীত হন, স্থাপন করেন উচ্চ বিদ্যারয়ের ভিত্তি প্রস্তর। বিদ্যালয়ের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা দানেও তিনি সানন্দে রাজি হন।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় প্রধান শিক্ষক হিসেবে এগিয়ে আসেন সদ্য এম, এ, ডিগ্রী প্রাপ্ত বাবু ভোলানাথ সাহা। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ১৯১৮ সালে মধ্য ইংরেজী স্কুল রূপান্তরিত হয় পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ে। মহারাজার সাহায্য-সহযোগিতায় গড়ে ওঠার কারণে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় কাশিমবাজার রাজ উচ্চ বিদ্যালয়। এই সময় বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পাওয়া সহজ ছিল না। স্বীকৃতি আদায় প্রশ্নে মহারাজা সহ অবিভক্ত বাংলার প্রখ্যাত জননেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, বাবু মাখন লাল সরকার প্রমুখ নেতৃবর্গের সাহায্য ও সহযোগিতায় ১৯২০ সালের পহেলা জানুয়ারী থেকে এই বিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯২১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিদ্যালয় প্রথম অংশগ্রহণ করে। ভোলানাথ সাহা ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। ১৯১৮ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি অদম্য প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা ও তুলনাহীন নেতৃত্বের দ্বারা বিদ্যালয়ের সকল সমস্যা সমাধান করে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।[১৩]

হাবাসপুর গ্রামে হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাইমারীস্কুল ছাড়াও দু'টি প্রাইমারী স্কুল এবং একটি কলেজ আছে। কলেজটির নাম 'ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন কলেজ'। এটি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে একটি বাজার আছে। এই বাজারে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়। প্রতিদিন বিকালে এখানে বাজার বসে। এছাড়া বাজারের স্থায়ী দোকানগুলো সারাদিন খোলা থাকে। এই বাজারে মুদিখানা, দর্জি, ষ্টুডিও, লাইব্রেরী, লন্ড্রী প্রভৃতির দোকান রয়েছে। আটটি গ্রাম নিয়ে হাবাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। হাবাসপুর গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। সড়কপথে এই গ্রামটি পাংশা থানা সদরের সাথে যুক্ত। এই সড়কে বাস, টেম্পো, ভ্যান চলাচল করে। হাবাসপুর গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।

এই গ্রামে মুসলিম এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পূর্বে এখানে হিন্দু সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল বেশী। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও শিক্ষায় তাঁরাই নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতো। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তান গঠিত হলে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এই সময় বর্তমান রাজবাড়ী জেলার অন্যান্য অংশের মত হাবাসপুর গ্রাম থেকেও অনেক নেতৃস্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে চলে যান স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে Option দেয়া হলে, রাজবাড়ী জেলার অন্যান্য অংশের মত হাবাসপুর গ্রাম থেকেও সম্ভ্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ভারতে চাকুরি নিয়ে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় বহু লোক ভারতে চলে যান। ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সম্ভ্রান্ত, নেতৃস্থানীয় প্রায় সব এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিরাট সংখ্যা ভারতে চলে যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন শ্রেণীরও অনেকে ভারতে যায়, যাদের অনেকেই আর ফিরে আসেনি।

১৩। "প্লাটিনাম জুবিলী সংখ্যা" হাবাসপুর কে, বি, রাজ উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

একটি সমৃদ্ধশালী, আদর্শ গ্রাম হিসেবে হাবাসপুরের পরিচিতি ছিল। প্রায় সব পেশার মানুষ এই গ্রামে ছিল। জেলে, কর্মকার, স্বর্ণকার, মালী, পাটনী, ধোপা, নাপিত, দর্জি, ময়রা, কুমার প্রভৃতি পেশাজীবী এই গ্রামে বাস করতো। তৎকালীন সময়ে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ, যেখানে নিয়মিত যাত্রা, নাটক মঞ্চস্থ হতো-বর্তমানেও তার অস্তিত্ব নিয়ে একদা গ্রামের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার প্রমাণ দিচ্ছে। খেলাধুলায় গ্রামটি আদর্শ স্থানীয় ছিল বলে বয়জ্যেষ্ঠরা এখনও গর্ব করেন। বর্তমান হাবাসপুর গ্রামে কৃষি ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা রয়েছে।

এই গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বাবু ভোলানাথ সাহা, মরহুম ডাঃ ফায়েম উদ্দিন আহমেদ, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, কলা অনুষদের সাবেক ডীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি ডঃ কে, এম, মোহসীন, ডঃ সানাউল্লাহ-সদ্য প্রাক্তন পরিচালক, আনবিক শক্তি কমিশন, ঢাকা। মরহুম কে. এম. মোসলেম (প্রধান শিক্ষক হিসেবে বেশ কয়েকটি উচচ বিদ্যালয়ে কাজ করেছেন) এবং জনাব মির্জা আব্দুল মতিন-অর্থ পরিচালক, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন এবং কুদ্দু পরিবারের কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হাবাসপুর গ্রামটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই গ্রামে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী অবাঙালী ও রাজাকার একাধিকবার হত্যাযজ্ঞ চালায়। হানাদর বাহিনী সাধারণত ভোর চারটায় এসে কয়েক ঘন্টার মধ্যে হত্যাকান্ড ঘটিয়ে চলে যেত।[১৪]

কালুখালীঃ- রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার একটি গ্রাম। এখানে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ জংশন ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশন থেকে রাজবাড়ী, ভাটিয়াপাড়া ও কুষ্টিয়া অভিমুখে রেললাইন স্থাপিত হয়েছে। কালুখালীতে একটি বাজার আছে। এটি রাজবাড়ী জেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। এখানে 'কালুখালী ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়' নামে একটি মহাবিদ্যালয়, একটি উচচ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। অনেক শিক্ষার্থী এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে। এই গ্রামে মুসলিম এবং হিন্দু উভয় সম্প্রায়ের মানুষ বাস করে। একদা এখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু ধনাঢ্য পরিবার বাস করতো। বর্তমানে তাঁদের অনেকেই ভারতে চলে গেছে।

কালুখালী গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। রেল এবং সড়কপথে জেলার অন্যান্য স্থানের সাথে এটি যুক্ত। কালুখালী নদ্মা নদীর নিকটবর্তী হওয়ায় পূর্বে এখান থেকে নদী পথে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের সুবিধা ছিল। বিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলিম রাজনীতিবিদদের অন্যতম আলীমুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর অনুজ ইউসুফ হোসেন চৌধুরীদের নিবাস কালুখালী এবং পাশ্ববর্তী হাড়োয়া গ্রামে। হাড়োয়া গ্রাম নদীর ভাঙনে

১৪। সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিহ্ন হবার পর সেখানকার পরিবারগুলো কাশুখালীতে চলে আসে। এই গ্রামের মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। বেশ কিছু চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী এই গ্রামে রয়েছেন।[১৫]

কশবা মাজাইলঃ- রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার একটি ইউনিয়ন। এখানে একটি ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়, একটি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।[১৬] বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের জন্মস্থান হিসেবে স্থানটি খ্যাতি লাভ করেছে। এ ইউনিয়নের বাসিন্দা মরহুম খান বাহাদুর নাদের হোসেন ১৮৬৭-৬৮ সালে তৎকালীন ফরিদপুর জেলা বোর্ডের প্রথম বাঙালী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বর্তমানে পাংশা থানা সদর থেকে কশবা মাজাইল পর্যন্ত সড়কটি তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমজাদ হোসেন এ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব যিনি নিজ নামে এখানে একটি ডিগ্রী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মাসুম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মামুন এ ইউনিয়নের বাসিন্দা। জনাব এম, একরাম হোসেন উচ্চ পদস্থ ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন। স্থানটি সড়ক পথে পাংশা থানা সদরের সাথে যুক্ত।

কলিমোহরঃ- রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার একটি ইউনিয়ন। এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি দাখিল মাদ্রাসা আছে।[১৭] এ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে মরহুম মিনহাজ উদ্দিন মিয়া, ডি. ডি. সি. লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ, কে, এম রফিক উদ্দিন, জনাব এ, কে, এম ফিরোজ উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ আরশাদ আলী, জনাব কাজী আহমদুল্লা, জনশক্তি, কর্মসংস্থান অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব এ, কে, এম সালাউদ্দিন, জনাব আব্দুল মালেক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এখানকার স্থানীয় বাজারে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়। এ ইউনিয়নের অধিবাসীদের অধিকাংশের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। এছাড়া চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী রয়েছেন। আঠারটি গ্রাম নিয়ে কলিমোহর ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।[১৮]

মাছপাড়াঃ-রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার একটি ইউনিয়ন। এখানে একটি ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।[১৯] এ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রাক্তন সংসদ সদস্য, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ জনাব আব্দুল মতিন মিঞা, প্রাক্তন সেক্রেটারী ও সমাজ সেবক জনাব খন্দকার নুরুল ইসলাম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজ সেবক অমূল্য কুমার বর্দ্ধন, মরহুম খন্দকার হাসান উল ইসলাম, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক কালীপদ মজুমদার,

---

১৫। সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন।
১৬। "চন্দনা" (একাদশ সংখ্যা), পাংশা থানা সমিতি, ঢাকার মুখপত্র।
১৭। পূর্বোক্ত।
১৮। সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন।
১৯। "চন্দনা" (একাদশ সংখ্যা), পাংশা থানা সমিতি, ঢাকার মুখপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মোয়াজ্জেম উদ্দিন পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা-এর উপাধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব মিঞা, জনাব খন্দকার নজরুল ইসলাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এখানকার স্থানীয় বাজারে নিত্য-প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়। এ ইউনিয়নের অধিবাসীদের অধিকাংশের উপজীবিকা কৃষি। এছাড়া চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী রয়েছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ ইউনিয়নের অধিবাসীগণ পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। পনেরটি গ্রাম নিয়ে মাছপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত।[২০]

মাজবাড়ীঃ- রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার একটি ইউনিয়ন। এখানে একটি ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়, দু'টি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, একটি দাখিল মাদ্রাসা ও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।[২১] এ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা ও সমাজ সেবক জনাব কাজী আলী আহমদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব কাজী আলী আজম, বাংলাদেশ বিমানের বৈমানিক জনাব খালেদ যীন আহমদ, কাজী আলী আশরাফ, জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর কাদির প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এখানকার স্থানীয় বাজারে কৃষিপণ্য ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়। স্থানটি রেল ও সড়ক পথে পাংশা থানা সদরের সাথে যুক্ত। এ ইউনিয়নের অধিবাসীদের অধিকাংশের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। এছাড়া চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ী রয়েছেন।[২২]

২০। সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন।
২১। "চন্দনা" (একাদশ সংখ্যা), পাংশা থানা সমিতি, ঢাকার মুখপত্র।
২২। সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব

বর্তমান রাজবাড়ী জেলার ইতিহাস রচনার উপাদান অপ্রতুল। তাই এখানকার স্থানীয় ইতিহাস রচনা অত্যন্ত দুরূহ। জানা যায়, মোগল আমলে সম্রাট আকবরের সৈন্যরা যখন ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা অভিযান করে, তখন একটি বাহিনী মুরাদ খান নামে একজন সেনাপতির নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা জয় করে।[১] "আকবর নামা" থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, এই সেনাপতি ফতেহবাদ (ফরিদপুর) এবং সরকার বাকলা (বাকেরগঞ্জ) অধিকার করেন। এরপর তিনি ফতেহবাদ বা ফরিদপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ছয় বছর পরে মারা যান। তাঁর বাসস্থান ছিল ফরিদপুর জেলা সদর থেকে তের মাইল দূরে বর্তমান রাজবাড়ী জেলার সদর থানার খানখানাপুরে। ভূষনা এবং ফতেহবাদের রাজা মুকুন্দ উক্ত মুরাদ খানের পুত্রকে ভোজে আমন্ত্রন জানান এবং ভোজ সভায় উপস্থিত হলে তাঁকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করা হয়।[২]

বর্তমানে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা নামে পরিচিত এই অংশটি প্রাচীনকালে বঙ্গ রাজ্যের অংশ ছিল। পদ্মা নদীর দক্ষিণের ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। ভাগিরথী এবং ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন গতিপথের মধ্যবর্তী এবং এর সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ অংশের নামও বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। বিখ্যাত কবি কালিদাস তাঁর "রঘুবংশ" নামক গ্রন্থে বঙ্গ সম্পর্কে বর্ননা করেছেন।[৩] তিনি লিখেছেন, বঙ্গের অধিবাসীরা সর্বক্ষেত্রে নৌকা ব্যবহার করতো। তারা নৌকা চালনায় দক্ষ ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও নৌকা ব্যবহার করতো।

বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা এক সময় গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে এসেছিল বলে জানা যায়। সমুদ্র গুপ্তের (৩৪০ থেকে ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ) এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি, দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা এবং স্কন্দগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় এই বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলো আবিস্কৃত হয় বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার কোটালীপাড়া দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোন থেকে প্রায় পৌনে এক মাইল পশ্চিমে গোয়াখোলা গ্রামের সোনাকান্দুরি নামক মাঠে।

গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন বলে জানা যায়। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গ, সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। এই সম্পর্কে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-যিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় পরিভ্রমণ করেন তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায়। হিউয়েন সাং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন ৬৩০ থেকে ৬৪৩

১। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page-37.
২। পূর্বোক্ত, Page-37.
৩। কবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কালে (৩৮০ থেকে ৪১২ খ্রীঃ) কবি ছিলেন বলে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় সম্রাট হর্ষবর্ধন তাঁর ক্ষমতার শিখরে ছিলেন। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে যায় এবং অনেক স্বাধীন রাজা রাজত্ব করতে থাকে বাংলায়। এই সময় হতে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস বিশেষ করে ফরিদপুর জেলা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে এই জেলায় চন্দ্র বংশ নামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাসক গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। এদের রাজধানী ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর এবং কেদারপুর ও ঢাকা জেলার রামপালে প্রাপ্ত তাম্রফলক থেকে ফরিদপুর জেলায় এই শাসকদের শাসন সম্পর্কে জানা যায়। চন্দ্র বংশের শাসনকাল ৯০০ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল।

বর্মন নামক হিন্দু শাসকদের সম্পর্কে জানা যায় এরা বিক্রমপুর থেকে শাসন করতো এবং ফরিদপুর জেলা এদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্মন শাসকরা হলো- বজ্রবর্মন, জটাবর্মন, হরিবর্মন, শ্যামল বর্মন এবং ভোজা বর্মন। সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" গ্রন্থানুসারে-১০৮২ থেকে ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তরবঙ্গে রামপালের কর্তৃত্ব ছিল, যিনি পূর্ববঙ্গের বর্মন রাজাকে প্রয়োজনে নিজের সপক্ষে যুদ্ধ করার শর্তে জমি ভোগ দখলের অধিকার দিয়েছিলেন। এই বর্মন রাজা খুব সম্ভবত বর্মন রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা জটা বর্মন। বর্মন রাজারা খুবসম্ভব স্বাধীনভাবে তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করেন সেন রাজবংশ বাংলা দখল করা পর্যন্ত। বর্মনদের শাসনকালের ব্যাপ্তি ছিল ১০৮০ থেকে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ফরিদপুর জেলায় সেন বংশের শাসন শুরু হয় বিজয় সেনের (১০৯৭-১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ) সময়কাল থেকে। তিনি সেনবংশের তৃতীয় শাসক ছিলেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা থেকে বর্মনদের এবং উত্তরবঙ্গ থেকে পালদের উৎখাত করেন (খুব সম্ভবত ১২ শতাব্দীর মধ্যভাগে)। তাঁর পুত্র বল্লাল সেন-যিনি বিখ্যাত পন্ডিত এবং লেখক ছিলেন। বিজয় সেন এবং বল্লাল সেন উভয়ই দেবতা শিবের উপাসক ছিলেন এবং তাঁদের প্রজারঞ্জনের জন্য খ্যাত ছিলেন। বল্লাল সেন আঠার বছর রাজত্ব করেন এবং তাঁর পুত্র লক্ষন সেন এরপর রাজা হন। রাজা লক্ষন সেন বাংলা শাসন করেন ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ বছর ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজী বাংলা আক্রমণ করেন এবং সেন রাজাদের রাজধানী নদীয় দখল করে নেন। বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেন তখন পালিয়ে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন। বিক্রমপুরে তাঁর আত্মীয় বিশ্বরূপ সেন শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। এই বিশ্বরূপ সেন তাম্রফলকে নিজের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এই তাম্রফলক বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলায় কোটালীপাড়া থানার কোটালীপাড়া দুর্গ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে পিঞ্জরী নামক স্থানে পাওয়া গেছে। বিক্রমপুর থেকে সেনদের কর্তৃত্ব চলে যায় এয়োদশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে দেব বংশের শাসক দশরথ দেব কর্তৃক। খুব সম্ভবত তিনি দামোদর দেবের বংশধর ছিলেন-যিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় (কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল) দেব শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। দশরথ দেবের "অদভদী" ফলকে এই সম্পর্কে উৎকীর্ণ করা হয়েছে- যা বিক্রমপুরে প্রস্তুত করা হয়েছিল। বিক্রমপুর পরবর্তী সেনদের ক্ষমতার কেন্দ্র রূপে বিরাজিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

দনুজমর্দন দেব দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সর্বশেষ জ্ঞাত হিন্দু রাজা-যিনি নিশ্চিতভাবে ফরিদপুর জেলা শাসন করেছেন। এর এই অঞ্চল, ফরিদপুর জেলাসহ মুসলিমদের অধিকারে আসে। বাংলার শাসক হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)-এর পূর্বে ফরিদপুর জেলা তথা বৃহত্তর ফরিদপুরের স্থানীয় ইতিহাসের তথ্য অপ্রতুল। হোসেন শাহকে বাংলার সবচেয়ে যোগ্য এবং বিখ্যাত মুসলিম শাসক বলে অভিহিত করা হয়েছে। অধ্যাপক ব্লোচম্যান-এর মতে, হোসেন শাহ প্রথম ফরিদপুরে (ফতেহবাদ) ক্ষমতায় আরোহণ করেন। এখানে তাঁর প্রথম দিকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যশোর, খুলনা, পাবনা এবং ফরিদপুরের কিছু পরগনা যেমনঃ-নসরতশাহী, মাহমুদশাহী, ইউসুফশাহী এবং মাহমুদাবাদ-এর নামকরণ করা হয়েছিল হোসেন শাহ তাঁর ভাই ইউসুফ শাহ, তাঁর পুত্র নসরত শাহ এবং মাহমুদ শাহ-র নামে।

হোসেন শাহ-র প্রধান নগরীর নাম ছিল ফতেহবাদ যা বর্তমানের ফরিদপুর শহর বলে চিহ্নিত হয়েছে। এটির (ফরিদপুর) লক্ষ্মৌতির শাসক জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ-র পর বড় সরকার বা বিভাগের নামও হয়েছিল। এই সরকারে ফরিদপুর, ঢাকা এবং বাকেরগঞ্জের অংশ এবং দক্ষিণ শাহবাজপুরের দ্বীপসমূহ ও সন্দীপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফরিদপুর জেলার পশ্চিমাংশ, যশোর এবং কুষ্টিয়ার অংশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয় যা সরকার মাহমুদাবাদের মধ্যে পড়েছিল। আইন-ই-আকবরী-তে বিষয়টি সম্পর্কে উল্লেখ আছে।[৪] মোগল শাসন পূর্ব বাংলায় (ফরিদপুর জেলা সহ) ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে)। স্থানীয় প্রধান, কিছু হিন্দু স্থানীয় শাসক, বেশির ভাগ মুসলিম শাসক এই অংশে স্বাধীনভাবে নিজেদের পরিচালনা করতে থাকে। সাহসী আফগানদের উপস্থিতি, নদী এবং প্রতিকূল ভূ-ভাগ প্রাকৃতিকভাবে আকবরের সৈন্যদের এই অংশ বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রালফফিচ নামক একজন ইংরেজ বণিক যিনি বাংলার এই অংশ ভ্রমণ করেছিলেন, তিনি বলেনঃ"এখানকার সবাই বিদ্রোহী তাদের রাজা জালালুদ্দীন আকবরের বিরুদ্ধে। এখানে অনেক নদী এবং দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে যে কারণে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত চলে যায় কিন্তু তাদের ঘোড় সওয়ারেরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না"। জ্যাবিক-যিনি খৃষ্টান মিশনারীগুলো থেকে তথ্য আহরণ করে ষোল শতাব্দীর শেষে বাংলায় পাঠান, সেখানে তিনি বলেনঃ বাংলায় বারটি রাজ্যের প্রধানেরা কাউকে মান্য করে না, কাউকে সম্মান প্রদর্শন করে না। তারা রাজকীয় জীবন যাপন করে এবং নিজেদের রাজা না বললেও ভূঁইয়া বলে। তারা সম্মিলিত ভাবে বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত।

বার ভূঁইয়াদের মধ্যে চাঁদ রায় এবং কেদার রায়ের রাজধানী ছিল ঢাকা জেলার 'রাজাবাড়ী' শহরের নিকটবর্তী শ্রীপুর নামক স্থানে। 'রালফফিচ' এই স্থানটি পরিদর্শন করেন। চাঁদরায় এবং কেদার রায় তাদের রাজ্য ফরিদপুর জেলার কেদারবাড়ী পর্যন্ত

৪। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page 36-37.

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারিত করেন। ডঃ ওয়াইজ বলেন, ভূষনার-মুকুন্দ রায় নামে বাংলায় একজন ভূঁইয়া ছিলেন যিনি বার ভূঁইয়াদের একজন। সীতা রাম রায় নামে আরেকজন ভূঁইয়ার সন্ধান পাওয়া যায়, যার দুর্গ এখনও দৃশ্যমান ফরিদপুর জেলার ভূষনা থানার (বর্তমান বোয়ালমারী) কালিবাড়ীতে।

সম্রাট আকবর তাঁর সেনাপতিদের বার ভূঁইয়াদের দমনে একের পর এক প্রেরণ করেন কিন্তু তাঁরা আকবরের শাসনামলে বার ভূঁইয়াদের সম্পূর্ণ দমন করতে পারেননি। যখন ইসলাম খাঁন বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে (১৬০৬-১৬২৭ খ্রীঃ), তখন তিনি বাংলায় একচ্ছত্র মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে এই অঞ্চল (ফরিদপুর জেলাসহ) মোগলদের পতন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থানে ছিল। ইসলাম খানের পর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একুশজন গভর্নর বাংলা শাসন করেন। এই সময়কালে এই অঞ্চল শান্তি এবং উন্নয়নের যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। অবশ্য পূর্ব বাংলার এই অংশ অনেকবার মগ এবং আরাকান দস্যুদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। পর্তুগীজ দস্যুরাও আক্রমণ করেছে। ইসলাম খাঁন বাংলার গভর্নর থাকাকালে ঢাকাকে বাংলার রাজধানী হিসেবে নির্বাচনের এটিও একটি কারণ ছিল। তিনি জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কিন্তু এতে দস্যুদের আকস্মিক আক্রমণ শেষ হয়নি। ঐতিহাসিক শাহাবুদ্দীন তালিশ উল্লেখ করেছেন, ফরিদপুর জেলার ভূষনা নামক স্থান দস্যুদের আকস্মিক আক্রমণের শিকার হয় ১৬৬৩-৬৪ সালে। নবাব শায়েস্তা খান বাংলার গভর্নর থাকাকালে ১৬৬৬ সালে মগ এবং পর্তুগীজ দস্যুদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি চট্টগ্রাম ও সন্দীপ থেকে তাদের উৎখাত করেন। শায়েস্তা খানের শাসনামলে পূর্ব বাংলায় (ফরিদপুর জেলাসহ) মোগল শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার ইতিহাসে শায়েস্তা খানের শাসনামল এক গৌরবজনক অধ্যায়। এই সময় বাংলায় শান্তি এবং সমৃদ্ধি ছিল।[৫]

শায়েস্তা খানের পর নবাব মুর্শিদকুলি খান বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন। তিনি বাংলায় অন্যান্য স্থানের মত ফরিদপুর জেলারও রাজস্ব প্রশাসন পুনর্গঠিত করেন এবং জেলার রাজস্ব আদায় জোরদার করেন। তিনি সার্ভে পরিচালনা করেন এবং ভূমি রাজস্ব ও রেকর্ড পুনর্বিন্যাস করেন। ১৭৬৫ সালে বাংলায় মুসলিম শাসন শেষ হয় এবং ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা দখল করে।

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশী যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার অল্পকার পর ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। এই সময় ফরিদপুর জেলা, কোম্পানী রাজস্ব প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। নতুন আয়োজনে ফরিদপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাকি অংশ ঢাকা নিয়াবাতের অন্তর্ভুক্ত হয় (এটা ছিল একজন নায়েব সুবেদারের অধীনে যাঁর প্রধান দপ্তর ছিল ঢাকা)। জেলার যে অংশটি নায়েব সুবেদার বা নায়েব নাজিম নিয়ন্ত্রণ করতো, তার আয়তন ছিল ২৫,০০০ বর্গমাইলের কাছাকাছি।

৫। কথিত আছে, শায়েস্তা খানের সময়ে (১৬৮৮ খ্রীঃ) টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গোয়ালন্দ মহকুমা এবং গোপালগঞ্জ মহকুমার অংশ বিশেষ যশোরের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ফরিদপুর জেলার বাকী অংশ ঢাকা-জালালপুরের অধীনে আসে। ঢাকা, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জকে নিয়ে জেলা সৃষ্টি করা হয়, যার সদর দপ্তর হয় ঢাকা। তারপর এই জেলাকে বৃহদায়তনজনিত অসুবিধার কারণে পর্যায়ক্রমে ভেঙে ফেলা হয়। বাকেরগঞ্জ চূড়ান্তভাবে পৃথক হয় ১৮০৭ সালে। ঢাকা-জালালপুরের সদর দপ্তর ফরিদপুর শহরে স্থানান্তরের আদেশ জারি করা হয়েছিল যখন ঢাকা শহর এবং বর্তমান ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ ঢাকা-জালালপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। একই সময় নতুন ফরিদপুর জেলায় যশোর জেলার একটি অংশ যুক্ত করা হয়। এই জেলাকে সহকারী কালেক্টরের অধীনে দেয়া হয় ১৮১৫ সালে। ১৮৫৯ সালে ফরিদপুর, জেলার পূর্ণ মর্যাদা পায় এবং এই জেলায় একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর নিয়োগ করা হয়। তখন এই জেলার আয়তন ছিল ১৩১২ বর্গমাইল। ১৮৫০ সাল হতে ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। মানিকগঞ্জ মহকুমাকে ১৮৫৩ সালে ঢাকার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। গোয়ালন্দ মহকুমা ১৮৭১ সালে স্থাপিত হয়। এই সময় পাংশা থানা, পাবনা থেকে গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭৫ সালে ফরিদপুর জেলায় স্বতন্ত্র জেলা জজ নিয়োগ করা হয়।

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার জনগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর জেহাদ আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর অনেক অনুসারী এই জেলায় ছিল। তাঁর সহকারী ছিল মৌলভী ইলায়েত আলী ও মাওলানা কেরামত আলী। এরা এই ওহাবী মতবাদ প্রচার করেছিলেন। বাংলার এই অংশের গ্রামগুলিতে তাদের মতবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং মুসলিম মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণী তাদের অনুপ্রেরনায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। যখন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেন, তখন এই জেলায় অনেক ধর্মপ্রান মুসলিম তাতে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালের ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধের সময় ফরিদপুর জেলা আক্রান্ত হয় নাই। তবে এই যুদ্ধের ফলে কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটে এবং বৃটেনের রানী ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসনে চলে আসে এই উপমহাদেশ।

লর্ড কার্জনের সময় ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ করা হয়। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এখানে মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমনঃ শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিজেদের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯০৬ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা বঙ্গভঙ্গ রিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন-নতুন প্রদেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে এবং বাঙালী জাতির বিভক্তির বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। এই বঙ্গভঙ্গ রিরোধী আন্দোলন জন্ম দেয় স্বরাজ আন্দোলন। স্বরাজ আন্দোলন এই জেলায় বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় বিপ্লবী কর্মকান্ড দৃঢ়মূল হয়। ১৯১৬ সাল থেকে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' ও 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হয় এবং এই দুই সংগঠন পরবর্তী ছয় বছর একত্রে কাজ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে মিত্রশক্তি তুর্কী সাম্রাজ্যকে বিভক্তির প্রস্তাব করে। ফলে এই উপমহাদেশের মুসলিমগণ রুষ্ট হন। তারা খিলাফত আন্দোলন নামে একটি আন্দোলন সংগঠিত করেন। এর এক বছর পরে গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনকে মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সমর্থন করে। এই আন্দোলনে রাজবাড়ী জেলা সহ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার হিন্দু ও মুসলিমগণ যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। রাজবাড়ী জেলার বাহাদুরপুর গ্রামের মৌলভী তমিজুদ্দিন খান এই বিখ্যাত গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বাহাদুরপুর গ্রাম উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। মৌলভী তমিজুদ্দিন খান খিলাফত কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ফরিদপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি আইন ব্যবসায় থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এবং কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটির নেতাদের প্রতিষ্ঠিত কলকাতার জাতীয় কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯২৩সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জেল থেকে বের হয়ে আসেন। এরপর ১৯২৬ সালে তিনি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন এবং মুসলিম লীগে যোগ দেন।

নবাব সলিমুল্লাহ-র উদ্যোগে ১৯০৬ সালে ঢাকায় ভারতীয় মুসলিমগণের রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এই উপমহাদেশে মুসলিমদের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মৌলভী তমিজুদ্দিন খান ছিলেন বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার (বর্তমান রাজবাড়ী জেলার) একজন বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পূর্বে তিনি ফজলুল হক মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে মুসলিম লীগের ব্যানারে পরিচালিত আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে রাজবাড়ী জেলা সহ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার জনগণ সর্বান্তকরনে এই আন্দোলন সমর্থন করেন। এটি সম্ভব হয়েছিল মুসলিম লীগের বিখ্যাত নেতাদের চেষ্টায়, বিশেষ ভাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বলিষ্ঠ ভূমিকায়। ফলে মুসলিমগণের পৃথক আবাস ভুমি প্রতিষ্ঠায় উপমহাদেশের পূর্বাংশ-সাবেক পূর্ব বাংলা বর্তমানে বাংলাদেশ ভূ-খন্ড অন্তর্ভুক্ত হয় ফরিদপুর জেলা সহ।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত রাজবাড়ী জেলার জনগণও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন। তাঁরা ধারণা করেছিলেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভাগ করে নেবেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এই ধারণা কিছু দিনের মধ্যেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বছরের ইতিহাস, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষন, বঞ্চনা, নির্যাতনের ইতিহাস। পশ্চিম পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকবর্গের ষড়যন্ত্র ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব এর জন্য দায়ী ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে।[৬] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানের অবাঙালী ক্ষমতাসীন মহল নানাভাবে নিজেদের অবস্থা সংহত করার চেষ্টা করতে থাকে। তাদেরই প্রভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা চক্রান্ত শুরু হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে সদর্পে ঘোষনা করেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। তাঁর এই ঘোষনায় সারা বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে) বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ এবং এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে এক নতুন চেতনা জাগ্রত হয়।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধীদলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরন করে। কিন্তু ১৯৫৪ সালে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে অপসারণ করা হয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জনগণের উপর একটি একনায়কত্বমূলক সংবিধান চাপিয়ে দেন এবং মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। এটা কার্যত ছিল গণতান্ত্রিক খোলসে স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ছয়দফা প্রণয়ন করে। এতে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের ফলে জেনারেল আইয়ুব খান, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন আয়োজন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। জনগণের চাপের মুখে ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

৬। তিনি বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানায় জন্মগ্রহন করেন ১৯২০ সালের মার্চ মাসে। ১৯৪৭ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর আওয়ামী লীগ গঠিত হলে তিনি আওয়ামী লীগের একজন নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে তিনি তার একজন নেতা হন এবং শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনে যোগদান করার জন্য জেলে যান। ১৯৫৪ সালে তিনি আবার জেলে যান। ১৯৫৮ সালে গ্রেফতার হয়ে তিন বছর কারাগারে কাটান। এই সময় জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে ইস্কান্দার মির্জার সহায়তায়। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বিখ্যাত ছয় দফা পেশ করেন। এই ছয় দফায় অন্যান্য দাবীর সঙ্গে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবী ছিল। ছয় দফা পূর্ব বাংলায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয় হয়। ১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিব পুনরায় গ্রেফতার হন। যখন তিনি জেলে তখন পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মুখে সরকার শেখ মুজিবকে জেল থেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সালে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক সমাবেশে শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি দেয়া হয় এবং তিনি বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন।

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩১৩ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি পায় আওয়ামী লীগ। কিন্তু স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। আলোচনার নামে সময় ক্ষেপনের কৌশল অবলম্বন করে ঢাকায় সৈন্যবাহিনী আনতে থাকে। ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য বর্বর হামলা শুরু করে। পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে বাঙালী জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

নীল চাষ বিরোধী আন্দোলনে রাজবাড়ী জেলাঃ-উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত বিশেষ করে ১৮১০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের ব্রিটিশ শাসকরা নীল চাষ খুবই লাভজনক মনে করতো। তাদের মতে এই অঞ্চলের মাটি ছিল নীল চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অপরদিকে সাধারণ কৃষকগণ নীল চাষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর মনে করতো। তাই নীল চাষে তাদের অনীহা ছিল। ব্রিটিশ শাসকগণ বাংলার কৃষকদের নীল চাষ করতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে নির্যাতন করতেও তারা পিছপা হয় না। ফলে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি, গাংনী ও সদর থানার প্রত্যন্ত গ্রাম সহ বিভিন্ন অঞ্চলে পুরনো, পরিত্যক্ত পাকা কুঠিবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসকরা নীল চাষের উদ্দেশ্যে এসব কুঠিবাড়ী নির্মান করেছিল। নীলচাষ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে রাজবাড়ী জেলার কৃষক সমাজও অংশগ্রহণ করেছিল। এ জন্য তাঁরাও ব্রিটিশ শাসকবর্গের নির্যাতনের শিকার হয়। এরূপ নির্যাতনের স্বাক্ষর বহন করে প্রাচীন এক নীলকুঠির অস্তিত্ব রয়েছে রাজবাড়ী জেলার সদর থানার মূলঘর ইউনিয়নের কুঠিরহাট অঞ্চলে। নীলকুঠির নামানুসারেই এই এলাকার নাম কুঠিরহাট।

নীল চাষ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে বর্তমান রাজবাড়ী জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বালিয়াকান্দি থানার সোনাপুর গ্রামের কৃষক হাশেম আলী। এই সাহসী ও প্রতিবাদী যুবক এতদঞ্চলের নীল চাষীদের সংগঠিত করে, তাঁর নেতৃত্বে নীল চাষী ও কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। এটিই এ অঞ্চলের প্রথম কৃষক আন্দোলন বলে অনেকে মনে করেন।[৭]

১৮৮৫ থেকে ১৯৭১ সাল কালপর্বে বর্তমান রাজবাড়ী জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসঃ-বর্তমান রাজবাড়ী জেলার (পূর্বতন গোয়ালন্দ মহকুমা) দীর্ঘকালের রাজনৈতিক ঐতিহ্য রয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী ও বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে এই জেলা তৎকালীন ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলে রাজবাড়ী জেলার বাণীবহ জমিদার পরিবারের সদস্য রাজা বাবু কংগ্রেস দলে

৭। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সহজ কথা', ৫ এপ্রিল, ১৯৯৬ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

যোগদান করেন এবং এই অঞ্চলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হলে এই জেলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে রাজবাড়ী জেলায় নেতৃত্ব দেন নরেশ চন্দ্র ঘোষ, তারাপদ লাহিড়ী, জাহ্নবী চরন কুন্ডু, শৈলেস চন্দ্র, সুকুমার দেব রায়, কালী শংকর মৈত্র, নিরোদ সেন, বিভূতি পোদ্দার, বৃন্দাবন চন্দ্র দাস (আততায়ীর গুলিতে নিহত) প্রমুখ।[৮] এই জেলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন যথেষ্ট বেগবান ছিল।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অনুশীলন পার্টি এবং বামধারার রাজনীতি এই জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন, সমরেন্দ্র নাথ সিংহ (মাষ্টার মশাই), সত্য মৈত্র, শ্যামেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ড আন্দোলনের নেতা আশু ভরদ্বাজ, নজিবর রহমান, প্রফুল্ল কর্মকার, রুস্তম আলী খাঁন, সুকুমার গোস্বামী, আকবর বিশ্বাস প্রমুখ।[৯]

ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে রাজবাড়ী জেলার বাহাদুরপুর গ্রামের মৌলভী তমিজ উদ্দীন খাঁন নেতৃত্ব দান করেন। বাহাদুরপুর গ্রাম উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই জেলার আহমদ আলী মৃধা অবিভক্ত বাংলার এম, এল, এ ছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চাশ-এর দশকে এই জেলায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন ডাঃ এস, এম, ইয়াহিয়া (হোমিওপ্যাথ), আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী, কাজী হেদায়েত হোসেন, ডাঃ এস, এ মালেক, ডাঃ আব্দুল জলিল, বদিউজ্জামান (এডভোকেট) প্রমুখ। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বর্তমান রাজবাড়ী জেলাসহ বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের জন্য প্রযোজ্য পৃথক নির্বাচনে এম. এল. এ. নির্বাচিত হন রমেশ চন্দ্র দত্ত, 'কুঠার' প্রতীক নিয়ে। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার তৎকালীন কোরকদী গ্রামের (বর্তমানে কোরকদী গ্রাম ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানায় অন্তর্ভুক্ত) শ্যামেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য। রাজবাড়ী জেলায় আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হন আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী।

রাজবাড়ী জেলায় (তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমায়) ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ মতান্তরে ১৯৫৬ সালে। আব্দুল হাকিম সভাপতি এবং চিত্ত রঞ্জন গুহ সম্পাদক ছিলেন : ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে ছাত্রলীগের নতুন মহকুমা কমিটি গঠিত হয়। চিত্ত রঞ্জন গুহ এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর পূর্বে ১৯৫৮ সালে আইউব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করলে এই জেলায় আইয়ুব বিরোধী

৮। প্রখ্যাত লেখক কালিকানন্দ অবধুত তাঁর মরুতীর্থ হিংলাজ বইটি বৃন্দাবন চন্দ্র দাসের নামে উৎসর্গ করেন।

৯। বিশিষ্ট আইনজীবী চিত্ত রঞ্জন গুহ- এর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন জোড়ালো হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলন বেগবান হয়।[১০]

১৯৬১ সালে রাজবাড়ী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে প্রথম রাজবাড়ী কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে চিত্ত রঞ্জন গুহ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে আমজাদ হোসেন, বেনজীর আহমদ (বর্তমানে দৈনিক ভোরের কাগজে কর্মরত) প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আন্দোলনে তৎকালীন কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং মহকুমা প্রশাসনের তীব্র আপত্তির মুখে কলেজে শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে আইউব বিরোধী আন্দোলনে চিত্ত রঞ্জন গুহ, নাজিবর রহমান, আমজাদ হোসেন, বেনজীর আহমদ, আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, ফরিদ আহমদ, শেখ কাইউম প্রমুখ কারাবরন করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে মকসুদ আহমদ (রাজা) (তৎকালীন ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতা এবং পরবর্তী কালে রাজবাড়ী কলেজ ছাত্র সংসদের সম্পাদক) পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা আইনে, চিত্ত রঞ্জন গুহ সহ গ্রেফতার হন। এই সময় এখানে ছাত্রলীগে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন গনেশ নারায়ন চৌধুরী, ফকীর আব্দুল জব্বার, চঞ্চল কুমার কুন্ডু, অধীর ভট্টাচার্য, সঞ্জু ভদ্র, রেজা, আব্দুল মান্নান প্রমুখ।[১১]

আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের রাজনীতির পাশাপাশি রাজবাড়ী জেলায় (তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমায়) বামধারার রাজনীতি প্রচলিত ছিল। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই এই অঞ্চলে বামধারার আন্দোলন সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাম আন্দোলন ক্রমশঃ জোরদার হতে থাকে। ১৯৬৩-৬৪ সালে কেন্দ্রীয় কমিউনিষ্ট পার্টি দুই ধারায় বিভক্ত হয় (আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন-চীন দ্বন্দ্বে)। ফলে এই অঞ্চলেও পার্টি ভাগ হয়ে যায় মস্কো ও পিকিং পন্থী হিসেবে। এই অঞ্চলে মস্কোপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ছিলেন আশু ভরদ্বাজ, মোখলেসুর রহমান, শ্রমিক নেতা রুস্তম আলী, নজিবর রহমান প্রমুখ।[১২]

পিকিং পন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ছিলেন সমরেন্দ্র নাথ সিংহ, সত্য মৈত্র, শ্যামেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। আশু ভরদ্বাজ ও সমরেন্দ্র নাথ সিংহ অবিভক্ত ছিলেন এবং জীবনের বেশিরভাগ সময় কারান্তরালে কাটিয়েছেন।[১৩] মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন কমল কৃষ্ণ গুহ, আবু বক্কর, শিবেন্দ্র নাথ (কালু) প্রমুখ। পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন আল্লাহ নেওয়াজ (খায়রু), দুলাল মোল্লা, ঈদু মিঞা প্রমুখ।

১০। বিশিষ্ট আইনজীবি চিত্ত রঞ্জন গুহ এর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
১১। পূর্বোক্ত।
১২। পূর্বোক্ত।
১৩। আশু ভরদ্বাজের জন্মস্থান বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানায় কিন্তু কর্মক্ষেত্র ছিল এক সময়ে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা পরবর্তীকালে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা, বর্তমান রাজবাড়ী জেলায় স্থায়ী হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালের ছয় দফা এবং ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানে রাজবাড়ী জেলার তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এখানে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ছাত্র-শ্রমিক-জনতা এতে অংশ নেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে রাজবাড়ী থেকে এম,পি, এ নির্বাচিত হন কাজী হেদায়েত হোসেন এবং পাংশা থেকে মোসলেম উদ্দীন মৃধা। এই সময় এলাকার এম, এন, এ নির্বাচিত হন পাংশার এ. বি. এম. নুরুল ইসলাম।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় হামলা শুরু করলে, রাজবাড়ী জেলায় (তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমায়) যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয় ছাত্র-জনতাকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে।

জেলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব-জীবন ও কর্ম

রাজা সূর্যকুমার রায় বাহাদুরঃ-রাজা সূর্যকুমার রায় বাহাদুর রাজবাড়ী জেলার একমাত্র রাজা ও বিশিষ্ট জমিদার। তাঁর বাড়ী বর্তমান রাজবাড়ী পৌর এলাকার লক্ষীকোল গ্রামে। এই বাড়ীর নামানুসারেই রাজবাড়ী জেলার নামকরণ করা হয়েছে। রাজা সূর্যকুমার বর্তমান রাজবাড়ী শহর থেকে কিছু দুর পশ্চিমে সূর্যনগর নামক স্থানের বেনীনগর গ্রামে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি সম্প্রদায় (Caste) 'দাস' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষীকোল রাজবাড়ীতে দত্তকপুত্র হিসেবে তাঁকে নিয়ে আসা হয়।

রাজা সূর্যকুমারের পূর্ব পুরুষ বিশ্ব দিগম্বর প্রসাদ রায় ছিলেন নবাব আলী বর্দী খাঁর (মতান্তরে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ) খাজাঞ্চী-খানার কর্তা। তাঁর বাড়ী বর্তমান ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদে ছিল বলে জানা যায়। তাঁর পুত্র প্রভুরাম গুহ রায় গোয়ালন্দের এই অঞ্চলে (রাজবাড়ী) জমিদার হিসেবে কর আদায়ের জন্য আসেন।[১৪] নিঃসন্তান প্রভুরামের দত্তক পুত্র দীনেন্দ্র গুহ রায় মতান্তরে দ্বীজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর উত্তরাধিকারী হন। পরবর্তীতে নিঃসন্তান দীনেন্দ্র গুহ রায়ের দত্তকপুত্র সূর্যকুমার উত্তরাধিকারী হন। রাজা সূর্যকুমারের দত্তকপুত্র হওয়া সম্পর্কে জানা যায়, তাঁর নিজ বড় ভাইকে দত্তকপুত্র হিসেবে দেওয়ার জন্য দীনেন্দ্র গুহ রায়ের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর পিতা। সেই সূত্রে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যনগরের বেনীনগর গ্রামে সূর্যকুমারের নিজ বাড়ীতে দীনেন্দ্র গুহ রায় পাল্কি সাজিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু সূর্য কুমারের বড় ভাই 'নিজে বিক্রি হয়ে যাচেছন' এই চিন্তায় পাল্কিতে না উঠে পালিয়ে যান। তখন রাজা সূর্যকুমার পাল্কিতে উঠে লক্ষীকোল জমিদার বাড়ীতে চলে আসেন।

রাজা সূর্যকুমারের "রাজা" উপাধি প্রাপ্তি প্রসঙ্গে জানা যায়, তাঁর এই অঞ্চলের জমিদারী ছিল নাটোরের রাজার জমিদারীর অধীন। ব্রিটিশ শাসনামলে নাটোরের

১৪। এই প্রসঙ্গে একটি উপকথা প্রচলিত আছে-মুর্শিদাবাদের নিজ বাড়ীতে প্রভুরাম গুহ রায় একদিন পাশা খেলায় মগ্ন ছিলেন। ঐ সময় জনৈক ইংরেজ সেখানে হাজির হন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপের এক পর্যায়ে প্রভুরাম গুহ রায় ঐ ইংরেজ ব্যক্তিটির উপর ক্ষুব্ধ হন এবং উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করেন। এরপর তিনি বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হন ও বিভিন্ন স্থান ঘুরে বর্তমান রাজবাড়ী শহরের লক্ষীকোল গ্রামে আসেন। তখন লক্ষীকোল গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একটি গাছের নীচে বসে তিনি সিদ্ধান্ত নেন এখানেই বাড়ী করে স্থায়ীভাবে থাকবেন। এরপর এখানেই জমিদারী গড়ে তোলেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ীতে দেশীয় জমিদারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ইংরেজ নীতি নির্ধারকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলটি লালগালিচা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন সারি এবং মঞ্চে চেয়ার দেয়া হয়েছিল। অন্যান্য দেশীয় জমিদাররা পাদুকা খুলে গালিচার উপর দিয়ে হেঁটে, মঞ্চের শূন্য চেয়ারে না বসে নিচের চেয়ারগুলোতে বসে। রাজা সর্যকুমার দৃঢ় পদক্ষেপে পাদুকা না খুলে গালিচার উপর দিয়ে সভাস্থলের মঞ্চে রক্ষিত শূন্য চেয়ারে বসেন। তাঁর এই সম্মানবোধ, রাজকীয় আচরণে উপস্থিত ইংরেজ নীতি নির্ধারকবৃন্দ মুগ্ধ হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে "রাজা" উপাধি প্রদান করে।

রাজা সূর্যকুমার তাঁর স্বল্প পরিসর কর্মজীবনে জনহিতকর বহু কর্মকান্ডে অবদান রাখেন। বর্তমান রাজবাড়ী পাবলিক লাইব্রেরীর (রাজবাড়ী-ফরিদপুর মহাসড়কে জেলা পরিষদ ডাক বাংলোর পাশে বেসরকারী পাবলিক লাইব্রেরী) উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি একজন ইংরেজ নীতি নির্ধারক 'উডহেড' (WOOD HEAD) কে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসেন। ১৯১৪ সালে লাইব্রেরীটি উদ্বোধন করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় "উডহেড পাবলিক লাইব্রেরী"। উডহেডের সম্মানে রাজা সূর্যকুমার জাঁকজমকপূর্ণ সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। এতে রাজকীয় হাতি ও ঘোড়া ব্যবহার করা হয়। এখানে উল্লেখ্য লাইব্রেরীটি তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিভক্ত ভারতে রাজা সূর্যকুমারের জমিদারী বাংলা ও উড়িষ্যার কিছু অংশে বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন সময়ে তিনি উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে একটি কুষ্ঠাশ্রম (Leper house) তৈরী করেন এবং রোগীদের বৈষয়িক প্রয়োজন মিটানোর জন্য একশত একর জমি দান করেন। সেই সময়ে তিনি উড়িষ্যার পুরী ও কটকে পুরী ব্যাংক ও কটক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর জমিদারীর সর্বত্রই তিনি প্রজা-সাধারণের সুবিধার্থে পুকুর ও জলাশয় খনন করেন। তিনি রাজবাড়ীতে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে তাঁর মায়ের নামে উৎসর্গ করেন। অনেক জায়গায় তিনি প্রাথমিক স্কুল এবং আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

রাজবাড়ীতে কৃষকদের সুবিধার্থে তিনি "লক্ষীকোল লোন অফিস" নামে একটি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গে কার্ত্তিক মাসের মঙ্গা মোকাবেলার জন্য তিনি একশত একর জমির একটি খামার তৈরী করেন। এই জমির ফসল দুর্দশাগ্রস্থ কৃষকদের জন্য গুদামজাত করা থাকত। পূর্ববঙ্গের প্রথম রেলপথ প্রতিষ্ঠার সময় এতদাঞ্চলে রেলপথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দুর্গাপুর ঘাট হতে (বর্তমান লক্ষীকোল গ্রামের পাশে দুর্গাপুরে তখন ঘাট ছিল) পাংশা পর্যন্ত রেলপথের জমি দান করেন। তাঁর এই উদারতায় তৎকালীন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁর সম্মানে বর্তমান সূর্যনগর ষ্টেশনের নাম তাঁর নামে রাখেন। এখানে উল্লেখ্য, রাজা সূর্যকুমার প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ী দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধনে তৎকালীন বড়লাট রাজবাড়ীতে আসেন। রাজা সূর্যকুমার শেষ জীবনে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন এবং বর্তমান ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের পুরীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এখানে মর্মর পাথরে নির্মিত তাঁর বাড়ী রয়েছে।[১৫]

১৫। রাজা সূর্যকুমারের পৌত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

গীরিজা শংকর মজুমদারঃ-গীরিজা শংকর মজুমদার বর্তমান রাজবাড়ী জেলার একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। রাজবাড়ী জেলা সদর থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে বাণীবহ ইউনিয়নে তাঁর বাড়ী ছিল। রাজবাড়ী শহর থেকে বাণীবহ পর্যন্ত অধিকাংশ জায়গার মালিক তিনি ছিলেন।

জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদারের একজন পেয়াদা মানিক মন্ডলের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, গীরিজা শংকর মজুমদাররা তিন ভাই ছিলেন। তিনি ছাড়াও শৈলেন্দ্র শংকর এবং অভয় শংকর। তাঁর পরিবারের সবাই শিক্ষিত ছিলেন। তিনি নিজ বাড়ীতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপূজার সময় জমিদার বাড়ীতে একশত পাঁঠা ও তিনটি মেড়া বলি হতো। সেই মাংস রান্না করে গ্রামের সব লোককে খাওয়ানো হতো। কলকাতা থেকে যাত্রা-থিয়েটারের দল এসে জমিদার বাড়ীতে যাত্রা মঞ্চস্থ করতো। ঐ অঞ্চলের বহুলোক এসব উৎসবে যোগ দিত। জমিদার বাবুর নির্দেশ ছিল, যারা পুজো দেখতে আসবেন তাদের সবাইকে খাওয়াতে হবে। মেয়েরা পুজো দেখতে এলে তাদের সন্তান গণনা করে সবাইকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হতো। জমিদার গীরিজা শংকর হাতে তেল নিয়ে মেয়েদের মাথায় দিতেন। জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদার প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের অভাবের সময় সাহায্য করতেন। তিনি নিজে প্রায়ই খোঁজ নিতেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোন প্রজা খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে, তাকে পরে সুবিধামত সময়ে দিতে বলতেন।

জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদার ও তাঁর ভ্রাতাগণ প্রায়ই নানা কাজে কলকাতা যাতায়াত করতেন। কলকাতা থেকে নিজ বাড়ীতে আসার পথে জমিদার বাবু রাজবাড়ীতে যাত্রা বিরতি করতেন। তিনি যেখানে গোয়ালন্দ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (বর্তমানে রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়), স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই জায়গায় তাঁর কাছাড়ী বাড়ী ছিল। এর পাশে ছিল একটি হোটেল। তিনি কাছাড়ী বাড়ীতে বিশ্রাম নিয়ে আট বেহারার পাল্কিতে চড়ে বাণীবহতে তাঁর নিজ বাড়ীতে আসতেন। তিনি শিক্ষায় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজবাড়ীতে রাজা সূর্যকুমার রায় বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায়ই মামলা চলত উভয়ের মধ্যে। কথিত আছে এরূপ এক মামলায় রাজা সূর্যকুমার পরাজয় বরন করেন এবং মামলার খরচ হিসেবে জমিদার গীরিজা শংকর চল্লিশ হাজার টাকা নান। ঐ টাকা দিয়ে তিনি নিজ জমির উপর ১৮৯২ সালে একটি হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার নাম দেন, "দি গোয়ালন্দ হাই ইংলিশ স্কুল"। স্কুলটির জন্য তিনি দশ একর জমি দান করেন। এটি ছিল রাজবাড়ী জেলার তৃতীয় স্কুল ও দ্বিতীয় হাই ইংলিশ স্কুল। স্কুলটির বর্তমান নাম রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়। এটি রাজবাড়ী জেলার শ্রেষ্ঠতম উচচ বিদ্যালয়।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর জমিদার গীরিজা শংকর মজুমদার পরিবারসহ স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে কলকাতা চলে যান। তিনি চলে যাবার পূর্বে তাঁর সমস্ত কর্মচারী ও গ্রামবাসীদের জমি ও নগদ অর্থ দান করেন। আট পাল্কি (২২ শতাংশে এক

Dhaka University Institutional Repository

পাকি) থেকে একশত পঁচিশ পাকি পর্যন্ত জমি তিনি অনেককে দান করেন বলে জানা যায়।[১৬]

মৌলভী তমিজ উদ্দিন খানঃ-রাজবাড়ী জেলার বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান ১৮৮৯ সালে, জেলার সদর থানার খানখানাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁর বাল্য জীবন অতিবাহিত হয়। উচচ শিক্ষার জন্য তিনি প্রথমে ফরিদপুর পরে কোচবিহার ও কলকাতায় গমন করেন। ১৯০৬ সালে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই, এ এবং ১৯১১ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজীতে বি, এ (অনার্স) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ ও এল, এল, বি ডিগ্রী লাভ করেন। কালক্রমে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিখ্যাত নেতায় পরিণত হন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

তমিজ উদ্দিন খান মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন এবং আইন ব্যবসায় বিরত থাকেন। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ১৯২১ সালে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি খিলাফত কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ফরিদপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারন সম্পাদক ছিলেন। ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে পরাজিত হলে ১৯২৬ সালে তিনি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। একই বছর তিনি ফরিদপুর সদর এবং গোয়ালন্দ মহকুমা দুটো থেকে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে জয়ী হন। ১৯৩০ সালে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবিরকে পরাজিত করেন। তিনি "বেঙ্গল টেনান্সী এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট" নামক আইন পাসের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং প্রজাদের ভূমি হস্তান্তর অধিকারের পক্ষে ও জোতদারদের অগ্রক্রয়াধিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের উপমহাদেশ বিভক্তি পর্যন্ত তিনি বাংলার মন্ত্রীপরিষদে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প এবং শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সর্বসম্মতভাবে পাকিস্তান আইন সভার স্পীকার নিযুক্ত হন।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বে-আইনীভাবে গণপরিষদ ভেঙে দিলে তিনি এর বিরুদ্ধে সিন্ধু হাই কোর্টে "তমিজ উদ্দিন বনাম ফেডারেশন অফ পাকিস্তান" নামে মামলা রুজু করেন। আইনবিদ ডি, এন প্রিটের সাহায্যে তিনি মামলায় জয়লাভ করেন। পরবর্তীকালে আপীল আদালত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কথা বলে গণপরিষদ ভাঙার পক্ষে রায় দেন। আইন ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টির ফলে আদালত এই রায় দেয়। এসময় তাঁর নৈতিক সাহস ও সততার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এ সংবিধানের অধীনে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ঢাকা-

---

১৬। শতবর্ষ স্মৃতি স্মরণিকা-১৯৯৩ রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদপুর আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য ও স্পীকার নির্বাচিত হন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের অবর্তমানে তিনি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মৌলভী তমিজ উদ্দিন খান ক্রীড়া, কবি ও জারী গানের অনুরাগী ছিলেন। নিজ হাতে মৎস্য শিকার তাঁর প্রিয় শখ ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট, জলক্রীড়া, লাঠি প্রভৃতি খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালের ১৯ আগষ্ট নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ঢাকার তেজগাঁওয়ে সমাহিত করা হয়।[১৭]

আলিমুজ্জামান চৌধুরীঃ-খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরী রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত রতনদিয়া ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট। বিশিষ্ট জমিদার ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। তিনি ফরিদপুর শহরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ফরিদপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বৃটিশ আমলে এম. এস. সি. ডিগ্রী লাভ করেন এবং তৎকালীন ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য ছিলেন। শিক্ষা, যোগাযোগ এবং ফরিদপুর জেলার উন্নয়নে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ফরিদপুর শহরের আলিমুজ্জামান সেতু, আলিমুজ্জামান হল, আলিমুজ্জামান সড়ক তাঁর স্মৃতি বহন করছে। ফরিদপুর জেলার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁরই অবদান।

আহম্মদ আলী মৃধাঃ-রাজবাড়ী জেলার খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ আহম্মদ আলী মৃধা জেলার বালিয়াকান্দি থানার বহরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৃটিশ ভারতের মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। জনকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ এই রাজনীতিবিদ পাকিস্তান শাসনামলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি এম. এন. এ. নির্বাচিত হন। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে আহম্মেদ এরতেজা মর্জি বর্তমানে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "নাসায়" কর্মরত। তাঁর পুত্রবধু জাহানারা বেগম বি. এন. পি সরকারের সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

ইউসুফ হোসেন চৌধুরীঃ-খান বাহাদুর ইউসুফ হোসেন চৌধুরী রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার রতনদিয়া ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। পাকিস্তান শাসনামলে তিনি এম. এন. এ নির্বাচিত হন। তিনি তৎকালীন সময়ে চীফ হুইপের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তৎকালীন সময়ে চীফ হুইপের দায়িত্ব পালন করেন। নিবেদিত প্রান সমাজসেবক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। খান বাহাদুর আলিমুজ্জামান চৌধুরীর তিনি ভ্রাতা।

কাজী আব্দুল মাজেদ (অতুল মিয়া)ঃ- কাজী আব্দুল মাজেদ রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার মাগুরাভাঙ্গী গ্রামে ১৮৯৬ সালে (বাংলা ১লা আশ্বিন, ১৩০৩ সাল) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী আব্দুল জব্বার। তিনি রাজবাড়ী আর. এস. কে. ইন্সটিটিউট থেকে এন্ট্রান্স, কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই. এ, পাশ

১৭। তমিজ উদ্দিন খান 'ফাঁসের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি' (ঢাকা-১৯৯৩), পৃষ্ঠা:-৩-৫।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। একই কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখে তাঁর ছাত্র জীবনের অবসান ঘটে। ছাত্রাবস্থায় তিনি থাকতেন টেলার হোষ্টেলে, যেখানে সাধারণত ইউরোপিয়ান ছাত্ররাই থাকত। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের বিমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। ইংরেজী ভাষার উপরও তাঁর ভাল দখল ছিল। ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন তাঁর সময়কার কৃতি ফটবল খেলোয়াড় এবং দৌড়বিদ। ছাত্র জীবন শেষ করার পর কলকাতা মেট্রোপলিটান পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে পুলিশ বিভাগে চাকুরি পেয়েও শেষ পর্যন্ত তা গ্রহণ করেননি। এর পর তিনি আর কোন চাকুরিতে যোগদান করেননি। তখন থেকে তিনি নিজ এলাকায় সমাজ সেবায় ব্রতী হন। ১৯২০-এর দশকে তিনি মেয়েদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে পাংশায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রথম বালিকা বিদ্যালয় তারই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। এছাড়া একাধিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে।

কাজী আব্দুল মাজেদের সাহিত্য প্রতিভাও লক্ষ্যণীয়। তাঁর লেখা কবিতা "আত্মার পরিচয়" প্রসিদ্ধ। এছাড়া তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদের জন্য যেসব ছড়া লিখেছেন তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। জীবদ্দশায় তাঁর রচনাসমূহ ছাপা হয়নি। তবে বর্তমানে তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রকাশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজী আব্দুল মাজেদ মুসলিম লীগের সমর্থক হলেও সরাসরি তাঁর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলনা। শেষ জীবনে খেলাফতে রাব্বানী পার্টির প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে জানা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী না হলেও তিনি একাদিক্রমে ছত্রিশ বার অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। একবার জেলা বোর্ডের সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত বাংলায় শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছেন। ধর্মীয় ব্যাপারেও তিনি ছিলেন পন্ডিত ব্যক্তি। কোরান, বেদ, বাইবেল সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অনেকেরই বিস্ময় উদ্রেক করতো। তার মধ্যে কোন গোড়ামী ছিলনা। তাঁর বক্তব্য ছিল বিজ্ঞান ভিত্তিক, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিপূর্ণ। সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিশবার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। পাংশার একজন কৃতি সুসন্তান অনলবর্ষী বক্তা, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যশিল্পী, নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক হিসেবে মরহুম কাজী আব্দুল মাজেদ সকলের কাছে পরিচিত। ২৯শে নভেম্বর, ১৯৬৫ সালে উনসত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কাজী হেদায়েত হোসেনঃ- রাজবাড়ী জেলার প্রখ্যাত জননেতা কাজী হেদায়েত হোসেন রাজবাড়ী পৌর এলাকার ধুধিঃ গ্রামে, ১৯২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এলাকার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হন। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৯৬২ সালে তিনি রাজবাড়ী পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। আইউব খানের শাসনামলে, ষাট-এর দশকে তিনি এম, পি, এ নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি গোয়ালন্দ মহকুমা (সাংগঠনিক জেলা) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলনে তিনি রাজবাড়ীতে নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি পুনরায় এম. পি. এ নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি না হলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। রাজবাড়ীতে কাজী হেদায়েত হোসেন অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের শেষের দিকে তিনি ভারতে চলে যান। এখানে উল্লেখ্য, রাজবাড়ীর পতন হয় ২১ শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে।

ভারতে গিয়ে কাজী হেদায়েত হোসেন মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের সাথে যোগাযোগ করে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী-তে যুব ক্যাম্প স্থাপন করেন এবং এটি পরিচালনা করেন। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি রাজবাড়ীতে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কাজী হেদায়েত হোসেন শিক্ষা ও ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজবাড়ী সরকারী কলেজ, রাজবাড়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য দান করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন সময়ে প্রায় আড়াইশত ছাত্র রাজবাড়ীতে লজিং থেকে শিক্ষা লাভ করে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে রাজবাড়ীতে বয়েজ ক্লাব (ফুটবল) প্রতিষ্ঠায় তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এই ক্লাবের পক্ষে তৎকালীন সময়ে তিনি কলকাতা থেকে খেলোয়ার এনে খেলার ব্যবস্থা করতেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকহানাদার বাহিনী রাজবাড়ীতে এসে অন্যান্য স্থাপনার সঙ্গে তাঁর বাড়ীও পুড়িয়ে দেয়। কাজী হেদায়েত হোসেন আমৃত্যু রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৮ই আগষ্ট রাজবাড়ী সরকারী কলেজের অদূরে আততায়ীর গুলিতে তিনি নিহত হন।[১৮]

মোসলেম উদ্দিন মৃধাঃ-রাজবাড়ী জেলার প্রখ্যাত জননেতা, শিক্ষাবিদ মোসলেম উদ্দিন মৃধা ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারী পাংশা থানার অন্তর্গত বাগমারা বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুজা উদ্দিন মৃধা এবং মাতার নাম ফকরুন্নেসা। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শ্রমিক নেতা হিসেবে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে, সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার লেখক হিসেবে এবং শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকায় বিদ্যালয়টি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই সময় ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের পরামর্শে ১৯৫৯ সালে তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এলাকার জন-সাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয় ভবনের সম্প্রসারণ করেন। তাঁর

১৮। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী ইরাদত আলীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচেষ্টায় ১৯৬৭ সালে এই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখা চালু হয়। তিনি দশ বছরের অধিক-কাল হাবাসপুর ফাশিম বাজার রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মরহুম মোসলেম উদ্দিন মৃধা খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে পাংশা আসন থেকে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং জনকল্যাণমূলক অনেক কর্মকান্ডে অবদান রাখেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি রাজবাড়ীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রাজবাড়ীতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে রাজনৈতিক কমিটি গঠন করা হলে তিনি এই কমিটিতে মরহুম কাজী হেদায়েত হোসেনের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় পাকবাহিনী হামলা শুরু করলে রাজবাড়ী জেলায় এই হামলা প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে পাংশায় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ছিলেন। ১৯৯২ সালের ৪ঠা জুন তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন।[১৯]

আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরীঃ- আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী রাজবাড়ী জেলার ঘরাটের চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এল. এল. বি. পাশ করে তৎকালীন সময়ে মুনসেফ হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করেন। গণমানুষের কল্যাণ কর্মে নিবেদিত এ মহৎ ব্যক্তি চাকুরি ছেড়ে এসে রাজনীতিতে যোগদান করেন। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তিনি এম. পি. এ. নির্বাচিত হন। আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী প্রায় ত্রিশ বছর রাজবাড়ী কোর্টে আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তাঁকে জেলা গভর্নর ঘোষণা করা হয়। তিনি ১৯৯১ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি পরলোক গমন করেন।

১৯। "প্লাটিনাম জুবিলী সংখ্যা" হাবাসপুর কে. বি. রাজ উচ্চ বিদ্যালয়-১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

জেলা প্রশাসনঃ- জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক। এই উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্ব থেকে এবং বৃটিশ শাসনামলে জেলাই ছিল প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ একক। বর্তমানেও এর গুরুত্ব একটুও হ্রাস পায়নি। সাধারণভাবে এটা বলা হয়ে থাকে যে, দেশের সুষ্ঠ প্রশাসন নির্ভর করে জেলার সফল প্রশাসনের উপর। আইন শৃঙ্খলা সংরক্ষণ বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের কৃতিত্বই সফলতার চাবিকাঠি। যদিও নির্বাহী ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে, মন্ত্রী পরিষদ ও রাষ্ট্রপতি সে ক্ষমতার প্রধান নিয়ামক, আর সচিবালয় নীতি প্রণয়নের প্রধান কেন্দ্র কিন্তু যে জনসাধারণের জন্য প্রশাসন তাঁরা জেলাতেই বসবাস করেন। সরকারী নীতির কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া জেলাতেই সুষ্ঠুভাবে যাচাই করা যায়। এখানেই জনসাধারণ তাঁদের দাবি তুলে ধরে, অভিযোগ ব্যক্ত করে আর এখান থেকেই জনসাধারণ নীতি নির্ধারণের জন্য তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তাই জেলার গুরুত্ব সর্বাধিক।

জেলা বলতে বুঝায়, প্রশাসনিক সুবিধার্থে নির্দিষ্টকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলকে যেখানে সরকার সরজমিনে তার দায়িত্ব পালনে কর্মরত থাকে। জেলার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, প্রশাসনের সুবিধার জন্য জেলা সৃষ্টি হয়। তাই জেলার সীমানা পরিবর্তনশীল। সুতরাং জেলা প্রশাসন হচ্ছে জেলারূপে নির্দিষ্টকৃত এলাকায় সরকারের সার্বিক কার্যক্রম। জেলা প্রশাসন কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন ও আওতাভুক্ত। সরজমিনে প্রশাসনিক একক বলে এর সীমারেখা নির্ধারণের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। জেলার সীমারেখা নির্ধারিত হয় দেশের ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং প্রশাসনিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে।

জেলা প্রশাসনের বিবর্তনঃ- পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে জেলা অতি প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান। একককালে এ অঞ্চলে গ্রামগুলো ছিল স্বতন্ত্র এবং প্রশাসনিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। চার্লস মেটকাফ (Charles Metcalf) গ্রামের এ অবস্থা লক্ষ্য করেই বলেছিলেন যে, এদেশের গ্রামগুলো ছিল অনেকটা "পরিবর্তনহীন প্রজাতুল্য"-স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বশাসিত। তবে বহুসংখ্যক গ্রামের সমন্বয়ে কালক্রমে গড়ে ওঠে সমাজ, আর সমাজের শীর্ষে থাকতেন সমাজপতি। কালক্রমে সমাজে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য একজন সরকারী কর্মকর্তাও নিয়োজিত হন। এ অবস্থা অনেকটা জেলার আকার ধারণ করে।

আধুনিক কালের জেলা তৈরী হয় মোগল আমলে। বর্তমান জেলা প্রশাসকের পদ অনেকটা মোগল আমলের "আমলগুজার" বা "আমিল" পদটির অনুরূপ। আধুনিক কালের জেলা মোগল আমলের "সরকারের" সমতুল্য। কয়েকটি পরগণার সমন্বয়ে গঠিত হতো সরকার আর তা সংগঠিত হতো ভূ-খন্ড ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে। ভারতে মোগল

Dhaka University Institutional Repository

শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে অর্থাৎ সুলতানদের শাসনামলে শাসন ব্যবস্থার একক ছিল "সুবা" বা প্রদেশ। শেরশাহ্ প্রথম প্রশাসন ও কর আদায়ের একক হিসেবে সুবার পরিবর্তে সরকারকে ব্যবহার করেন।

বৃটিশ শাসনামলে জেলা প্রশাসকরা আমলগুজারদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাশালী হন। মোগল আমলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী "ফৌজদার"-দের যে ভূমিকা ছিল,জেলা প্রশাসক কর আদায় ছাড়াও সে ভূমিকা পালন করতেন। কোম্পানীর কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় জেলা প্রশাসক প্রভাবশালী এক শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর হাতে একাধারে নির্বাহী, কর আদায় ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার সমাবেশ ঘটে। জেলা প্রশাসক হয়ে ওঠেন জেলায় বৃটিশ শাসনের প্রতিনিধি। তাঁর বাসগৃহে বৃটেনের পতাকা উত্তোলন করা হতে থাকে।

বৃটিশ শাসনামলে সর্বপ্রথম জেলা প্রশাসকের পদ কার্যকরী করা হয় ১৭৬৯ সালে। ১৭৭৩ সালে এ পদ বিলুপ্ত হয় কিন্তু ১৭৮১ সালে তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮৬ সালে জেলা, রাজস্ব আদায়ের প্রধান একককে পরিণত হয়। ফলে জেলা প্রশাসকের পদ সুদৃঢ় হয়। ১৭৮৭ সালে জেলা প্রশাসকের হাতে রাজস্ব আদায় ছাড়াও প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ১৭৯০ সালে জেলা প্রশাসকের পদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ১৭৯০ সাল থেকেই জেলা প্রশাসন ভারতের শাসন ব্যবস্থার এক মৌল উপাদানে পরিণত হয়েছে। লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনামলে অবিভক্ত বঙ্গে জেলার সংখ্যা ছিল আটত্রিশটি। বর্তমানে বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা চৌষট্টি।

জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ডেপুটি কমিশনার । সর্বপ্রথম জেলা প্রশাসক "কালেক্টর" নামে পরিচিত ছিলেন। তখন তাঁর প্রধান কাজ ছিল কর আদায়। বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত হলে জেলা প্রশাসককে বলা হতো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। গত শতকের ষষ্ঠ দশক থেকে জেলা প্রশাসক, ডেপুটি কমিশনার নামে পরিচিত। ডেপুটি কমিশনার ও তাঁর উচ্চ পদস্থ সহকর্মীগণ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাঁর নির্দিষ্ট কোন কার্যকাল নেই। যে কোন সময়ে সরকার তাঁকে অন্যত্র বদলী করতে পারেন। তিনি সচিবালয়ের উপসচিবের মর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা। বহু সংখ্যক উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা তাঁকে সাহায্য করে।[১]

রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে প্রথম শ্রেণীর যে কর্মকর্তাবৃন্দ এ জেলায় কর্মরত তা নিম্নরূপঃ-

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	- ৩ জন
থানা নির্বাহী কর্মকর্তা	- ৪ জন
নেজারত ডেপুটি কালেক্টর	- ১ জন
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	- ১ জন

১। ডঃ এমাজ উদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, (ঢাকা) পৃষ্ঠাঃ-২৭৩-২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সহকারী কমিশনার (ভূমি) - ৪ জন
ম্যাজিস্ট্রেট - ৭ জন
সহকারী পরিচালক (স্থানীয় সরকার) - ১
ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন অফিসার - ১ জন।[২]

জেলা প্রশাসনিক ব্যবস্থাঃ- জেলায় প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য ডেপুটি কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি বড় দফতর বর্তমান। এ দফতরকে বলা হয় কালেক্টরেট। এ কালেক্টরেট কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগ একজন করে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

রাজবাড়ী জেলায় তিন জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের পদ রয়েছে। এগুলো হলোঃ-

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
এ্যাডিশনাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

বর্তমানে এ জেলায় দুই জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কর্মরত আছেন। তাঁরা হলেন- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) , অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।[৩]

জেলার শ্রেণী বিভাগঃ- বাংলাদেশে জেলা কয়েকভাগে বিভক্ত। প্রথমঃ- অধিকাংশ জেলাই "গ্রামীণ জেলা" (Rural Districts) দ্বিতীয়ঃ-ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী জেলা প্রধানতঃ "নগরায়িত জেলা" (Urban Districts)। তৃতীয়ঃ-কিছু কিছু জেলাকে "শিল্পায়িত জেলা" (Industrial Districts) বলে আখ্যায়িত করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া এ শ্রেণীভুক্ত। চতুর্থঃ-পার্বত্য এলাকার তিন জেলাঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন কে "তফসিলী জেলা" (Scheduled Dirstrict) বলে উল্লেখ করা হয়।[৪] রাজবাড়ী জেলা "গ্রামীণ বা মফস্বল জেলা" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া বাংলাদেশের মোট ৬৪টি জেলাকে "এ" "বি" এবং "সি" এ তিন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়। আয়তন ও জনসংখ্যা অনুসারে এ বিভাজন করা হয়। রাজবাড়ী জেলা "সি" ক্যাটাগরি ভুক্ত।[৫]

জেলা প্রশাসনের লক্ষ্য ও নীতিঃ-বাংলাদেশে জেলা প্রশাসনের লক্ষ্য ও নীতি মূলত ছয়টিঃ- (ক) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, (খ) ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ও আদায়, (গ) ভূমি প্রশাসন, (ঘ) নির্বাহী কার্যাবলী, (ঙ) সাহায্য ও পুনর্বাসন, (চ) উন্নয়ন।

২। রাজবাড়ী কালেক্টরেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
৩। পূর্বোক্ত।
৪। ডঃ এমাজ উদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, (ঢাকা) পৃষ্ঠাঃ-২৭৬-২৭৭।
৫। রাজবাড়ী কালেক্টরেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাঃ- জেলা প্রশাসনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা ও তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তা নির্ভর করে আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণের উপর। তাই যে কোন সরকারের এটাই প্রাথমিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্য সাতটি নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। (এক) আইন-শৃঙ্খলাই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কর্তব্য, (দুই) প্রত্যেকের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এতে নিহিত, (তিন) আইনের শাসন এতে নিশ্চিত হয়, (চার) জেলা প্রশাসন শক্তি প্রয়োগের অধিকারী যদিও উত্তম প্রশাসন কম শক্তি প্রয়োগ করে থাকে, (পাঁচ) বেসামরিক কর্তৃত্বই সর্বপ্রধান কর্তৃত্ব, (ছয়) কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য সমাজ জীবনের প্রাথমিক শর্ত, (সাত) সহনশীলতার এক নির্দিষ্ট সীমারেখা বর্তমান। জেলা প্রশাসনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে সব কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন তাঁরা হলেনঃ ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট আর জেলার বিচার বিভাগ। এক্ষেত্রে কারাগারের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য।

ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ও আদায়ঃ- জেলা প্রশাসনের দ্বিতীয় লক্ষ্য জেলায় ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর নির্ধারণ ও সকল প্রকার কর আদায়। কর আদায় ও কর নির্ধারণ ক্ষেত্রে কিছুনীতি অনুসৃত হয়।
প্রথমতঃ রাজস্ব বা কর আদায় ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন ন্যায়ানুগ কর ধার্য নীতি,
দ্বিতীয়তঃ কর পূর্ণরূপে আদায় হতে হবে,
তৃতীয়তঃ কত পরিমাণ কর আদায় হতে হবে তা কর প্রদানকারীর কাছে নিশ্চিতভাবে জানা থাকতে হবে। ভূমি রাজস্ব ও কর আদায় ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ডেপুটি কমিশনার-একজন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার, একজন যুগ্ম ডেপুটি কমিশনার ও কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তা লাভ করেন।

ভূমি প্রশাসনঃ- ভূমি প্রশাসন জেলা প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশে ১৯৫১ সালের পূর্ব বাংলা ভূমি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিদারী বিলুপ্ত হয়। জমিদার ও ভূমি মালিকদের ৩৬.৩৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। বর্তমানে ভূমি মালিকানা বিক্ষিপ্ত হয়েছে। ভূমির ক্রয়-বিক্রয়, ভূমি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি ও ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বন্টন ইত্যাদি ভূমি প্রশাসনের প্রধান প্রধান কাজ।

নির্বাহী কার্যকলাপঃ- নির্বাহী ও প্রশাসনিক কার্যাবলী জেলা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ, পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনা, অস্ত্র, পেট্রোলিয়াম ও সিনেমার জন্য লাইসেন্স দান, পাসপোর্ট দান ও ভিসা মঞ্জুরী, মাদকদ্রব্য ও পানীয়ের নিয়ন্ত্রণ, ঐতিহাসিক স্থান ও অট্টালিকা প্রভৃতির সংরক্ষণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উত্তম গণ সম্পর্ক, পরিচালনা দক্ষতা আর দায়িত্বশীলতা এক্ষেত্রের প্রধান আশীর্বাদ।

সেবা ও সহায়তাঃ- দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিলে অথবা বন্যা বা খড়ার প্রকোপ শুরু হলে অথবা অন্য কোন ধরণের সংকটের সময় জনসাধারণের সেবা জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে অতিদ্রুত খাদ্য, ওষুধ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, কেরোসিন, লবন ও কাপড় সরবরাহের দায়িত্ব জেলা প্রশাসন গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নঃ- সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য উন্নয়ন-জেলার জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধন। গ্রামীণ জনসাধারণের দারিদ্র্য মোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বদান, শিল্প ও কৃষির অগ্রগতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। জেলার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য (এক) পল্লী জীবনের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা (দুই) উন্নয়ন প্রকল্পে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ (তিন) গ্রাম উন্নয়নে গ্রামীণ জনসাধারণের দায়িত্ববোধের উন্মেষ (চার) উপদেশ ও পরামর্শের সাথে সাথে উন্নয়ন মাধ্যমের বা উপাদানের যথাযথ সরবরাহ (পাঁচ) গ্রামীণ জীবনে শিক্ষার আলো।[৬]

জেলা প্রশাসনের কাঠামোঃ- বাংলাদেশে প্রত্যেক জেলায় নিম্নলিখিত কাঠামোগুলো বর্তমানঃ (এক) গ্রাম (দুই) ইউনিয়ন (তিন) থানা (চার) জেলা। এছাড়া স্বশাসিত সংস্থা পৌরসভা রয়েছে।জেলা দেশের মৌল প্রশাসনিক একক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারের কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষভাবে জেলা প্রশাসকের উপর প্রত্যর্পিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকদের কাজকর্মের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করেন। থানা ও ইউনিয়নে অবস্থিত কার্যালয়গুলো জেলা প্রশাসনের একক। কোন কোন ক্ষেত্রে থানা নির্বাহী কর্মকর্তার হাতে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা অর্পিত হয়। সাধারণভাবে ডেপুটি কমিশনার জেলায় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন আর সরকারের সংস্থাপন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কার্য পরিচালনা করেন।

বৃটিশ শাসনামলে জেলা প্রশাসনের কাঠামো ছিল অত্যন্ত "ঐক্যবদ্ধ ও সংহত"। জেলা প্রশাসক তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তারদের সহায়তায় নিজেই সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। সরকারের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেলে জেলায় নতুন নতুন অফিস প্রতিষ্ঠিত হলেও ঐ সব অফিসের প্রধানরা জেলা প্রশাসকের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণেই কার্য পরিচালনা করতেন। জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসন ছিল অনেকটা প্রদেশপাল বা রাষ্ট্র প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের সমতুল্য। কোন সাংবিধানিক বা নির্বাহী বিভাগীয় আদেশ বা বিধিবিধান না থাকলেও জেলার সকল কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের নির্দেশ মেনে চলতেন। যতদিন পর্যন্ত জেলা প্রশাসক বৃটিশ কর্মকর্তা ছিলেন ততদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু ছিল। বৃটিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিই এ জন্য যথেষ্ট ছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের সমাপ্তি পর্বে এ ব্যবস্থায় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। এর কারণ ছিল ত্রিবিধ। **প্রথমতঃ** ভারতীয় কর্মব্যবস্থায় ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান হারে অন্তর্ভুক্তির ফলে অনেক জেলা প্রশাসক ভারতীয়দের মধ্যে থেকে নিয়োগ লাভ করতেন। **দ্বিতীয়তঃ**- সরকারী কার্যক্রমে জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমুখী কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে জেলায় প্রযুক্তিগত ও বিশেষীকৃত অফিস ও কার্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। **তৃতীয়তঃ**-স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আর স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে জেলা প্রশাসনের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অনেকাংশে হানি হয়। জেলার বিশেষীকৃত অফিসগুলো অধিক পরিমাণে স্বতন্ত্রভাবে কর্মপন্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

৬। ডঃ এমাজ উদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, (ঢাকা) পৃষ্ঠাঃ ২৮০-২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৫ সালে গঠিত "দি বেঙ্গল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ইনকোয়ারী কমিটির" রিপোর্টে এ সম্পর্কে বলা হয়েছিলঃ- বর্তমান অবস্থা জেলা প্রশাসকের দিক থেকে আর জেলায় প্রশাসনের দক্ষতা ও জেলার জনগণের কল্যাণের দিক থেকে বিচার করলে অত্যন্ত অপ্রতুল মনে হয়। জেলা প্রশাসকের অবস্থা ছিল অনেকটা অপেরার পুলিশের মতই হাস্যকর। জেলায় কোন অসুবিধা না হোক তা দেখা ছিল জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব, কিন্তু বিচার বিভাগ ও রাজস্ব আদায় পরিচালনা ছাড়া জেলা প্রশাসকের কিছু করবার ক্ষমতাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। এ কমিটি সুপারিশ করে যে, সরকারী নীতির প্রেক্ষিতে জেলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের আইনগত দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের থাকা উচিৎ। কিন্তু কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের পূর্বেই ভারত বিভক্ত হয়।

পাকিস্তানে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের কাঠামো ঠিক তেমনি থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুভূত হয় জেলা প্রশাসকের "স্বেচ্ছাধীন" ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে তাঁরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের গুরুত্ব আরও অধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। ১৯৬০ সালে গঠিত প্রাদেশিক প্রশাসনিক কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, জেলায় অসংলগ্ন কার্যাবলী উন্নয়নমুখী কর্মক্ষেত্রে এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৬১-৬২ সালে প্রাদেশিক পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সুপারিশে বিভাগীয় কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারদের বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে প্রশাসনের প্রধান বলে স্বীকার করা হয় এবং বলা হয় বিভাগ ও জেলায় অন্যান্য কর্মকর্তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। বিভাগীয় কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনারগণ যাতে সমন্বয় সাধন ও পরামর্শ দান সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন সে জন্য তাঁদের হাতে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রত্যর্পনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ (ক) বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তার নিকট থেকে রিপোর্ট দাখিল করতে বলার ক্ষমতা (খ) তাদের স্ব স্ব এলাকায় কোন প্রকল্প বা উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনের ক্ষমতা (গ) বিভাগ ও জেলায় যে কোন কার্যালয় পরিদর্শনের ক্ষমতা (ঘ) বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তার নিকট থেকে "টুর ডাইরী" দাখিলের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা (ঙ) বন্যা, দুর্ভিক্ষ, নির্বাচন বা শুমারির মত জরুরী কাজে সকল কর্মকর্তার সহযোগিতা লাভের ক্ষমতা (চ) কর্মকর্তাদের বিশেষ ছুটি দানের ক্ষমতা (ছ) প্রশাসনিক কাজে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে সকল কর্মকর্তাদের অধিবেশনে আহ্বান করার ক্ষমতা (জ) কর্মকর্তাদের বদলী করার জন্য তাদের উচচ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপনের ক্ষমতা।

এ আদেশের বলে প্রশাসন ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারন ও ডেপুটি কমিশনারদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেলেও বিভাগ ও জেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি উৎকর্ষতা লাভ করেনি। প্রায়োগিক ও বিশেষীকৃত বিভাগের কর্মকর্তাদের নিকট এ আদেশে নিহিত বাধ্যতামূলক দিকটি গ্রহণযোগ্য হয়নি। এসময়ে পাকিস্তানে সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে ওঠে। অতীতে বিশেষীকৃত বিভাগের কর্মকর্তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যেটুকু সহযোগিতা দান করতেন এসময় থেকে তাও হ্রাস পেতে থাকে। এ অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায় যখন জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয়

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনারগণ জেলা পরিষদ ও বিভাগীয় পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন আর মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর জেলা প্রশাসনের কর্তৃত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশে জেলা প্রশাসনে পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টাঃ-বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জেলা প্রশাসনে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৯(১)অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয় যে, আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমুহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একফাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে। এর লক্ষ্য ছিল প্রশাসনকে গণমুখী করা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জনগণের নিকট দায়িত্বশীল করা। ৫৯(২) অনুচ্ছেদে আরও ঘোষণা করা হয় যে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা - আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও নীতি গ্রহণ করবে। এর ফলে জেলা প্রশাসন একদিকে লাভ করবে নতুন প্রাণশক্তি অন্যদিকে হবে দায়িত্বশীল।

প্রশাসনিক ও সার্ভিসেস পুনর্বিন্যাস কমিটির রিপোর্টে জেলা প্রশাসনকে নতুনভাবে পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাবে বলা হয়, প্রয়োজনীয় ভৌগলিক ও আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসের পর প্রত্যেকটি মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হবে। ছোট ছোট মহকুমা প্রয়োজনে একত্রিত করে জেলা গঠন করা হবে। বড় মহকুমা ভেঙে একাধিক জেলা গঠন করা হবে। এলাকা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে মহকুমাই স্থানীয় প্রশাসনের একক হওয়া উচিৎ। এ রিপোর্টে মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করার পক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেখানো হয়। **প্রথমতঃ**- জেলার আয়তন ক্ষুদ্র হলে আর জনসমষ্টি কম হলে জনগণের মধ্যে ঐকানুভূতি বৃদ্ধি পাবে। **দ্বিতীয়তঃ**- এর ফলে জেলা প্রশাসন দক্ষ হয়ে উঠবে এবং জেলার অধিবাসীদের প্রায়ই একত্রিত হবার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। **তৃতীয়তঃ**- জেলার আয়তন ও জনসমষ্টির পরিমাণ সু-শাসনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কমিটির মতে, মহকুমাই প্রশাসনের মৌল এককে পরিণত হওয়া উচিত। রাউল্যান্ডস কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছিল-"জেলা ও মহকুমার সীমারেখা অলঙ্ঘনীয় কিছু নয়। এ সত্য যত দ্রুত অনুধাবন করা হবে ততই মঙ্গল"।

১৯৭৫ সালের ২১ শে জুন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এক আদেশবলে তৎকালীন বাংলাদেশের ১৯টি জেলার পরিবর্তে ৬১ টি জেলা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৭৫ সালের ১৬ই জুলাই ৬১টি জেলায় জেলা-গভর্নর নিয়োগের কথাও ঘোষণা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থা কার্যকরী হয়নি।[৭] পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ১৯টি জেলাকে ৬৪টি জেলায় রূপান্তর করা হয়। বৃটিশ শাসনের প্রথমদিকে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বড় অংশ ঢাকা জালালপুর নামে পরিচিত

৭। এমাজ উদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, (ঢাকা) পৃষ্ঠাঃ-২৮২-২৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল, যার সদর দফতর ঢাকায় অবস্থিত ছিল। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গোয়ালন্দ মহকুমা এবং গোপালগঞ্জ জেলার কিছু অংশ যশোরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭১ সালে গোয়ালন্দ মহকুমা গঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে এর সদর দফতর স্থাপিত হয় রাজবাড়ীতে।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হলে, গোয়ালন্দ মহকুমা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের একটি মহকুমা হিসেবে থাকে। পাকিস্তান শাসনামলে গোয়ালন্দ মহকুমার প্রধান প্রশাসনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ-

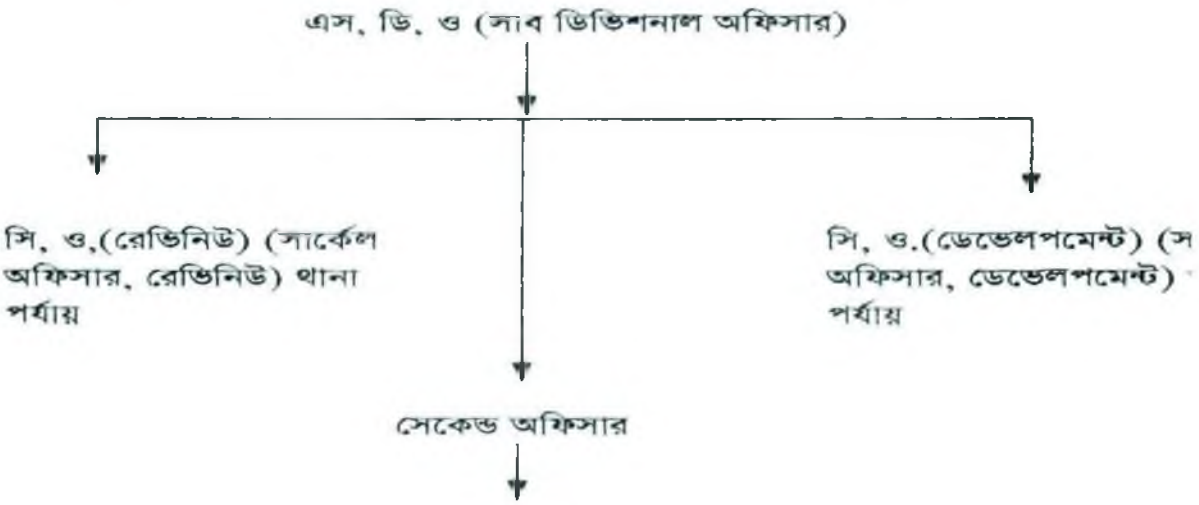

এক পর্যায়ে এস, ডি, ও -এর নিচে এ, এস, ডি, ও নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া মহকুমা সেটেলমেন্ট অফিসার ভূমি জরিপ ও রেকর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতেন।

পুলিশ প্রশাসন

সার্কেল ইন্সপেক্টর (মহকুমা পুলিশ প্রধান)

↓

ও, সি (থানা পুলিশ প্রধান)

এক পর্যায়ে মহকুমার প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে 'সার্কেল ইন্সপেক্টরের' স্থলে এস, ডি,পি, ও (সাবডিভিশনাল পুলিশ অফিসার) নিয়োগ দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। গোয়ালন্দ মহকুমা ১৯৮৪ সালে রাজবাড়ী জেলায় রূপান্তরিত হয়। রাজবাড়ী জেলা প্রশাসন পরিচালিত হয় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে। তাঁর কার্যাবলীকে প্রধানতঃ দশ ভাগে ভাগ করা হয়। **প্রথমতঃ**- আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও জননিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখা। এ ব্যাপারে জেলার পুলিশ বিভাগ তাঁকে সর্বদা সহায়তা করে। **দ্বিতীয়তঃ**- নিম্ন পর্যায়ের ফৌজদারী আদালত সমূহের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান। এক্ষেত্রে, জেলা প্রশাসক নিম্ন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করেন। **তৃতীয়তঃ**-ভূমি রাজস্ব আদায় ও সরকারের অন্যান্য দেয় কর আদায়। ভূমিস্বত্বের রেকর্ড ঠিক রাখা, জনহিতকর কর্মের জন্য ভূমি দখল ও ভূমিসংক্রান্ত আইন পরিচালনা। **চতুর্থতঃ**- জেলায় বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান। **পঞ্চমতঃ**-বিভিন্ন বিষয়ে পারমিট ও লাইসেন্স দেয়া। **ষষ্ঠতঃ**-নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ যেমনঃ- প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যদ্রব্যের আহরণ ও বিতরণ ইত্যাদি। জেলার খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগসমূহের নিয়ন্ত্রণও তিনি করেন। **সপ্তমতঃ**- বন্যা, ঝড়, অগ্নিকান্ড ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ। **অষ্টমতঃ**- তথ্য, জেল, অর্থ বিভাগের মত সরকারী কার্যক্রমের পরিচালনা, ঋণ ও অন্যান্য অনুদানের বিতরণ। **নবমতঃ**- রাষ্ট্রের কোন উচচ পদস্থ কর্মকর্তা যেমন-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী জেলায় পরিদর্শনে আসলে 'প্রোটোকলের' ব্যবস্থা গ্রহণ। **দশমতঃ**- অন্যান্য নির্বাহী কাজ পরিচালন।

এছাড়াও জেলা প্রশাসক নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করেনঃ- (এক) জেলার সামগ্রিক বা বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা সরকারকে অবহিত করেন। (দুই) সরকারী নীতি বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপারে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। (তিন) নীতি বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হলে তা নিরসনের জন্য ও নীতি নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। (চার) তিনি গণসংযোগ রক্ষা করেন। এজন্য তিনি জেলার গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সাথে সভা-সমিতিতে মিলিত হন। (পাঁচ) জেলার চাপ সৃষ্টিকারী সংস্থাগুলোর সাথেও তিনি সংযোগ রক্ষা করেন। (ছয়) তিনি জেলায় গণশিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। কলেজের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে তিনি কাজ করেন। (সাত) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন পরিচালনা করেন ও এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করেন। (আট) তিনি জেলায় আগ্নেয়াস্ত্রের পারমিট দান করে তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেন। (নয়) কোন কোন সময় তিনি জেলায় সাময়িকী ও সংবাদপত্র প্রকাশে সহায়তা করেন। (দশ) ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সরকারের নিকট সরবরাহ করেন। (এগার) জেলার আনসার বাহিনী ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী সংগঠনে তিনি ভূমিকা পালন করেন। (বার) তিনি জেলায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী পরিচালনা করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন। (তের) গ্রাম উন্নয়ন, সমবায় আন্দোলন, কৃষি উন্নয়ন ও জনস্বার্থমূলক কাজে তিনি নেতৃত্ব দান করেন। এসব কাজে জেলা প্রশাসককে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ ও অন্যান্য নিম্নপদস্থ সহকর্মীবৃন্দ।" রাজবাড়ী জেলার চারটি থানায় একজন করে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা রয়েছেন। থানার শীর্ষ নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁরা দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি থানা কিছু ইউনিয়ন পরিষদে বিভক্ত। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একজন করে নির্বাচিত চেয়ারম্যান রয়েছেন। চেয়ারম্যানকে সহায়তা করার জন্য নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ রয়েছেন।

রাজবাড়ী জেলার বিচার বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা জেলা ও দায়রা জজ। তাঁকে সহায়তা করেন একজন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, দুই জন সাব জজ, চারজন সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজ। জেলার ফৌজদারী বিচার কার্য পরিচালিত হয় জেলা ও দায়রা জজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, সাব জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও সহকর্মী ম্যাজিস্ট্রেটগণের মাধ্যমে।

রাজবাড়ী জেলা সদরে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় রয়েছে। তিনি সমগ্র জেলার পুলিশ বাহিনীর প্রধানরূপে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে জেলার চারটি থানায় চারজন ও,সি (অফিসার ইন চার্জ) বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত। রাজবাড়ী জেলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন করার জন্য জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তার কার্যালয় জেলা সদরে রয়েছে। তিনি জেলার প্রধান দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলা দুর্নীতি দমন অফিসের কাজ শুরু হয় ১৯৪৪ সালে "ডিষ্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ" নামে। ১৯৫৭ সালে এর পুনরায় নামকরণ করা হয় "জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো"। জেলা দুর্নীতি দমন কর্মকর্তাকে কাজে সহায়তা করেন ইন্সপেক্টর, সহকারী ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ। এই বিভাগের কাজ জেলায় কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, আধাসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনগণের দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত এবং মামলা দায়ের করা। রাজবাড়ী জেলা সদরে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীদের জন্য একটি ছোট কারাগার রয়েছে। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত অনেক অপরাধীকে এখানে রাখা হয়। সম্প্রতি জেলা সদরে, জেলা কারাগার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

রাজবাড়ী জেলা সদরে জেলা আনসার এ্যাডজুট্যান্ট-এর কার্যালয় রয়েছে। এই কার্যালয়ের এবং সমগ্র রাজবাড়ী জেলার আনসার সদস্যদের প্রধান জেলা আনসার এ্যাডজুট্যান্ট। জেলার আনসার সদস্যবৃন্দ স্থানীয় প্রশাসনকে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আনসার সদস্যবৃন্দ কাজ করেন। রাজবাড়ী জেলার চারটি থানায় প্রতিটিতে এক কোম্পানী করে আনসার রয়েছে (প্রতি কোম্পানীতে ১০০ জন)। প্রতি ইউনিয়নে এক প্লাটুন করে আনসার আছে (প্রতি প্লাটুনে ৩২ জন)। এছাড়া গ্রাম প্রতিরক্ষা দলে, প্রত্যেক গ্রামে এক প্লাটুন পুরুষ ও এক প্লাটুন মহিলা সদস্য আছে (প্রতি প্লাটুনে ৩২ জন)। ছোট গ্রামের ক্ষেত্রে দুই/তিনটি গ্রাম নিয়ে একটি সাংগঠনিক গ্রাম গঠিত। জেলার আনসার সদস্যদের মত গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বা ভিলেজ ডিফেন্স পার্টির সদস্য এবং সদস্যারা বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় প্রশাসনকে

৮। এমাজ উদদীন আহমদ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, (ঢাকা) পৃষ্ঠা: ২৮৬-২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা করেন। জেলা আনসার কার্যালয়ের সঙ্গে গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের কার্যালয়ও অবস্থিত।[৯]

রাজবাড়ী জেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন রয়েছে। এটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন। অগ্নি নির্বাপন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এদের ব্যবহার করা হয়। রাজবাড়ী ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনটি একজন উপসহকারী পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ অফিসটি দুই ভাগে বিভক্ত। এর জনবল নিম্নরূপঃ-

উপসহকারী পরিচালকের কার্যালয়ঃ-

উপসহকারী পরিচালক	১ জন
ষ্টাফ অফিসার	১ জন
উচচ মান সহকারী	১ জন
অফিস সহকারী	১ জন
পিয়ন	১ জন
মেসেঞ্জার কাম গার্ড	১ জন
ঝাড়ুদার	১ জন

ষ্টেশন অফিসারের কার্যালয়ঃ-

ষ্টেশন অফিসার	১ জন
সাব অফিসার	১ জন
লিডার	২ জন
ড্রাইভার	৪ জন
ফায়ারম্যান	১৬ জন
পাচক	১ জন
মশালচী	১ জন
ঝাড়ুদার	১ জন [১০]

রাজবাড়ী জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)। জেলা সেটেলমেন্ট অফিসার ভূমি জরিপ ও রেকর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

জেলায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। জেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রাজবাড়ী জেলার পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনা করেন। পল্লী উন্নয়ন বোর্ড জেলার বিত্তহীন জনগণের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ দেয়। রাজবাড়ী জেলা সদরে জেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয় আছে। জেলার সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রিকরণ সহ ঋণ

৯। জেলা আনসার এ্যাডজুটেন্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
১০। রাজবাড়ী জেলা সদরে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

বিতরণ ও অন্যান্য কার্যাবলী এই কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। জেলার সদর থানা সহ চারটি থানায় থানা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয় আছে। থানা পর্যায়ে সমবায় সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন থানা সমবায় কর্মকর্তা।

রাজবাড়ী জেলা সদরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয় আছে। জেলার জনগণের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে টিউবওয়েল বিতরণ, সেচ কাজের জন্য কৃষকদের মধ্যে গভীর নলকূপ প্রদান সহ জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

রাজবাড়ী জেলায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অফিস রয়েছে। কাষ্টমস এ্যান্ড এক্সাইজ, কর, সঞ্চয়, রাষ্ট্রায়াত্ত বিভিন্ন ব্যাংক, হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ইত্যাদি। এই অফিসগুলো জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলো জেলায় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই ব্যাংকগুলো হলো সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক। এছাড়া কৃষি ব্যাংক কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ সহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে। রাজবাড়ী জেলায় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক দায়িত্ব পালন করছে। এগুলো হলো পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক। সোনালী ব্যাংক ট্রেজারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন রাজবাড়ী জেলার জনগণের মধ্যে বাড়ী নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান করে। ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভিন্ন ভিন্ন সুদে এ ঋণ দেয়া হয়।

রাজবাড়ীতে 'কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাংকের কাজ শুরু হয় একজন শাখা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল রাজবাড়ীতে কৃষি উন্নয়নে অবদান রাখা।

রাজবাড়ী জেলা সদরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সিভিল সার্জনের কার্যালয় রয়েছে। সিভিল সার্জন জেলার প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। সিভিল সার্জনের কার্যালয় জেলার প্রতিটি থানায় অবস্থিত থানা স্বাস্থ্য অফিস এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। রাজবাড়ী জেলা সদরে স্থাপন করা হয়েছে আধুনিকৃত সদর হাসপাতাল। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক রোগী চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করার জন্য এই হাসপাতালে আসে। সরকারী ভাবে স্থাপিত মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র বহু রোগীর চিকিৎসা করে। রাজবাড়ী জেলায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় আছে : জেলা পরিবার পরিকল্পনার কর্মকর্তা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। এই জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন ই, পি, আই, কর্মসূচী এ জেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো অফিস এ জেলার জনসাধারণের স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলী পরিচালনা করে। দেয়াল লিখন, পোষ্টার প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমান চলচিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে জেলার জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী জেলায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর রয়েছে। জেলায় খাদ্য সরবরাহ ও প্রয়োজনে খোলা বাজারে বিক্রয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই দপ্তর। জেলা সদরে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে খাদ্য গুদামের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এ সংক্রান্ত জেলার সার্বিক কার্যক্রমের নেতৃত্ব দান করেন।

জেলা সদরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অধীনে রাজবাড়ী জেলার চারটি থানায় থানা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় আছে। থানা শিক্ষা কর্মকর্তারদের সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক থানায় একাধিক সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অধীন থানা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ জেলার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। রাজবাড়ী জেলায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা তথ্য কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। জেলা সদরে জেলা তথ্য কর্মকর্তার কার্যালয় অবস্থিত। জেলার চারটি থানায় থানা তথ্য কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। জেলা তথ্য কর্মকর্তা, থানা তথ্য কর্মকর্তাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন।

রাজবাড়ী জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে। জেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। জেলা সদরে অবস্থিত কৃষি ব্যাংক এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শাখা ব্যাংক সমূহ জেলার কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে। থানা কৃষি কর্মকর্তাগণ জেলার চারটি থানায় থানা পর্যায়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। ব্লক সুপারভাইজারগণ মাঠ পর্যায়ে কৃষির উন্নয়নে কৃষকদের সহায়তার জন্য নিয়োজিত আছেন।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে রাজবাড়ী জেলা সদরে। জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়ের অধীনে রাজবাড়ী জেলার চারটি থানায় থানা পশু সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। পশু সম্পদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জেলা ও থানা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে নিয়োজিত আছেন। জেলার গবাদিপশুর নানা ধরনের রোগের চিকিৎসা করাই তাদের প্রধান কাজ। এছাড়া পশু সম্পদের সঠিক পরিচর্যা, উৎপাদন বৃদ্ধি, গবাদি পশুর দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা পরামর্শ দান করেন।

রাজবাড়ী জেলা সদরে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। জেলার চারটি থানায় থানা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় আছে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জেলার মৎস্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন। থানা মৎস্য কর্মকর্তাগণ থানা পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অধীনে থানা মৎস্য কর্মকর্তাগণ কাজ করেন। জেলা পর্যায়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, পোনা উৎপাদন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি বিষয়ে জেলা ও থানা পর্যায়ের মৎস্য কর্মকর্তাগণ মূল্যবান পরামর্শ দান করেন। এছাড়া মাছের বিভিন্ন ধরনের রোগ দমন বিষয়ে তাঁরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের অধীনে "বিসিক" কার্যালয় রয়েছে রাজবাড়ীতে। জেলা সদরে স্থাপিত "বিসিক" কার্যালয়ের উদ্দেশ্য জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সহায়তা করা। "বিসিক" কর্মকর্তাগণ জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করেন। এছাড়া তাঁরা জেলার সম্ভাবনাময় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন এবং পুস্তিকা প্রকাশ করে শিল্প উন্নয়নে দিক নির্দেশনা দান করেন।

রাজবাড়ী জেলায় গণপূর্ত বিভাগের কার্যালয় রয়েছে। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত বিভাগ জেলার বিভিন্ন সরকারী পূর্তকাজ সম্পাদন করে। গণপূর্ত বিভাগের প্রকৌশলীগণ সরকারী বিভিন্ন অবকাঠামো এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত সরকারী কাজ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ বিভাগ রাজবাড়ী জেলায় সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিভাগের প্রকৌশলীগণ নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করেন। জেলা সদরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিস অবস্থিত।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেচ বিভাগের কার্যালয় আছে রাজবাড়ী জেলায়। জেলায় ফসল উৎপাদনের জন্য সেচ সহায়তা প্রদান করাই এই বিভাগের প্রধান কাজ। সেচ বিভাগের প্রকৌশলীগণ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। জেলা সদরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয় রয়েছে। জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, রক্ষনাবেক্ষণ, সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি কাজ সহ এই বিষয়ে সার্বিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে পানি উন্নয়ন বোর্ড। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীগণ এই বিভাগের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয় আছে রাজবাড়ী জেলা সদরে। জেলার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মেরামত কাজ সম্পন্ন হয় এই কার্যালয়ের মাধ্যমে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ এই বিভাগের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করেন।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে রাজবাড়ী জেলা সদরে। সমাজ কল্যাণ বিভাগের একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে জেলা সমাজ কল্যাণ অফিসের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। রাজবাড়ী জেলার সদর থানাসহ চারটি থানায় থানা সমাজ সেবা কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। থানা সমাজ সেবা কর্মকর্তার নেতৃত্বে এই কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। রাজবাড়ী জেলায় সরকারের সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম যথাঃ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান, চালু প্রকল্পে সাহায্য দান, সরকারী শিশু সদন পরিচালনা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হয় জেলা ও থানা পর্যায়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে। জেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমাজ কর্মীগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন টেলিযোগাযোগ অফিস রয়েছে জেলা সদরে। জেলার অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে ও জেলার সাথে রাজধানীসহ দেশে ও

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনায় টেলিযোগাযোগ অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিভাগের জেলা পর্যায়ে কর্মরত প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাগণ জেলা টেলিযোগাযোগ অফিসের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেন। এছাড়া রাজবাড়ী জেলা সদরে পাবলিক কল অফিস রয়েছে। এখান থেকে জনসাধারণ বিভিন্ন স্থানে দুরত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে টেলিফোন করতে পারে।

সরকারের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ডাক বিভাগের প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যতম। রাজবাড়ী জেলায় ডাক বিভাগের বিভিন্ন অফিস রয়েছে। জেলা সদরে জেলার প্রধান ডাকঘর অবস্থিত। এখানে কার্ডফোন সুবিধাসহ ডাক বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়। রাজবাড়ী জেলার প্রধান ডাক কর্মকর্তার নেতৃত্বে জেলার প্রধান ডাকঘরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া জেলার চারটি থানায় থানা পর্যায়ের ডাকঘর এবং ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়েও ডাকঘর রয়েছে। ডাকপিয়ন বাড়ী বা অন্য ঠিকানায় চিঠি বিলি করেন। জেলার প্রধান ডাকঘরের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-ইনভেলাপ, ষ্ট্যাম্প, ডাকটিকিট বিক্রি, চিঠি রেজিষ্ট্রি করা, ফ্র্যাংকিং মেশিন ব্যবহার, দ্রুততম ডাক সার্ভিস অর্থাৎ জি, ই, পি করা, বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প পরিচালনা, বৈদেশিক ডাক যোগাযোগ পরিচালনা করা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে রাজবাড়ী জেলা সদরে। জেলা শিশু একাডেমীতে তাঁর কার্যালয় অবস্থিত। জেলার শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা করা তাঁর দায়িত্ব। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর কার্যালয় চালু হয়। এর পূর্বে তাঁর পদটি শিশু সংগঠক হিসেবে পরিচিত ছিল। যুব মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা ও থানা পর্যায়ের যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে রাজবাড়ী জেলায়। তাঁদের নেতৃত্বে জেলায় যুব উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। এসব কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে জেলার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দান ও ঋণ বিতরণ। এছাড়া যুব উন্নয়ন বিষয়ক অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। জেলা মার্কেটিং অফিসারের কার্যালয় রাজবাড়ী জেলা সদরে অবস্থিত। বাজারের বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর দায়িত্ব। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন, জেলার চারটি থানায় মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের কার্যালয় ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যালয় রয়েছে জেলা সদরে।

রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যালিটিঃ-১৯২৩ সালে রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি তখন ষোল জন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের একটি বোর্ড দ্বারা শাসিত হতো, যার মধ্যে দশ জন নির্বাচিত হতেন, পাঁচ জন মনোনীত হতেন এবং এক জন ছিলেন সাবেক সরকারী কর্মকর্তা। সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাকে পাঁচটি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছিল। ১৯২৩-২৪ সালে রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যালিটির মোট জনসংখ্যার একুশ শতাংশ ধার্য পরিশোধকারী ছিল।এই সময় জনপ্রতি কর ধার্যের পরিমাণ ছিল সাড়ে বার আনা। ১৯২৩-২৪ সালে রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যালিটির মোট আয় ছিল ৮,০০০ টাকা। বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যালিটির। এটি স্থাপিত হয় ১৯১৯ সালে যখন "লোকাল সেলফ-গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট" অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন পরিচালিত

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছিল দৃশ্যত একটি ইউনিয়ন কমিটি দ্বারা। মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের প্রধান উৎস ছিল জনগণের প্রদেয় আয় কর। এর পরিমাণ ছিল প্রতি ১০০ টাকায় এক টাকা। সরকারী সহায়তা এবং জনগণের বিভিন্ন ভবনের উপর ধার্যকৃত কর যার পরিমাণ ঐ ভবনগুলোর বাৎসরিক ভাড়ার মূল্যের ৭½ শতাংশ। এ ছাড়া ল্যাট্রিন ফিঃ আদায় করা হতো। তৎকালীন সময়ে রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যালিটিতে রেলওয়ে থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হতো। মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠা থেকে রেলওয়ের প্রতিনিধি ভোলা সিং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতেন। আর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফকরউদ্দিন আহম্মেদ (প্রাক্তন চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের পিতা)। জনাব ফকরউদ্দিন আহম্মেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কমিশনার হিসেবে প্রায় ৩২ বৎসর তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে বাবু মন্মথ নাথ সেন দুইবার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। নবকৃষ্ণ চক্রবর্তী একবার চেয়ারম্যান ছিলেন। উল্লেখ্য তৎকালীন সময় চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নিযুক্ত হতেন না। কমিশনারগণ চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন। জনাব আহম্মদ আলী মৃধা একটার্ম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে প্রথম জনগণের ভোটে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এডভোকেট আব্দুল জলিল মিয়া। ১৯৫৫ সালে মাজেদ আলী খান চেয়ারম্যান এবং অমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

রাজবাড়ী টাউন কমিটিঃ- ১৯৬০ সালের 'মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন অধ্যাদেশ' অনুযায়ী রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যালিটি পুনর্গঠিত হয় রাজবাড়ী টাউন কমিটি হিসেবে। এই টাউন কমিটির আয়তন ছিল ৩.৫ বর্গমাইল। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই এলাকার জনসংখ্যা ছিল ১৬,০৬০ জন। ১৯৬৮ সালের হিসাব মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০,৯৯৮ জন হয়। এই হিসাব পরিচালনা করেছিল রাজবাড়ী টাউন কমিটি ১৯৬৮ সালের জুন মাসে।

রাজবাড়ী টাউন কমিটির প্রশাসন পরিচালিত হতো চেয়ারম্যানসহ তের জন কমিটি সদস্যের মাধ্যমে। ১৯৬৭-৬৮ সালে কমিটির কর্মচারী ছিল-একজন সচিব, একজন ট্যাক্স দারোগা, একজন কেরানী, একজন ভ্যাক্সিনেটর, একজন টিকাদানকারী এবং তিন জন পিওন। এই কর্মচারী ছিল সাধারণ বিভাগে। উন্নয়ন বিভাগের কর্মচারীগণ ছিলেন- উপতত্ত্বাবধায়ক, একজন হিসাব সংরক্ষণের কেরানী।

মিউনিসিপ্যাল কমিটির সমস্ত এলাকার মধ্যে কর প্রদানকারীর সংখ্যা ছিল ১,৮৯৪ জন। কমিটির প্রধান আয় ছিল হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে, এটি মূল্যের দশ শতাংশ হারে ধার্য ছিল। সরকারী সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য সাত শতাংশ হারে অর্থ আদায় করা হতো মোট মূল্যের উপর। বার্ষিক লাইসেন্স ফিঃ আদায় করা হতো নিম্নলিখিত হারেঃ-

প্রতি সাইকেলের জন্য তিন টাকা,
প্রতি রিক্সার জন্য দশ টাকা,
প্রতি কনফেকশনারীর জন্য ছয় টাকা,
প্রতি বেকারীর জন্য চার টাকা,
প্রতি বরফকলের জন্য ত্রিশ টাকা,
প্রতি আইসক্রীম ফ্যাক্টরির জন্য চল্লিশ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী টাউন কমিটির নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে ছিল তিন মাইল পাকা রাস্তা, ১৯½ মাইল কাঁচা রাস্তা,দু'টি প্রাইমারী স্কুল (এর মধ্যে একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের), একটি কমিউনিটি সেন্টার, একটি গ্রন্থাগার, দু'টি কবরস্থান, একটি শ্মশান ঘাট। রাজবাড়ী টাউন কমিটি বার্ষিক ১০,০০০ টাকা সাহায্য প্রদান করতো একটি দাতব্য চিকিৎসালয়কে এবং ১০,০০০ টাকা শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে। ১৯৬৭-৬৮ সালে টাউন কমিটি সতেরটি কালভার্ট নির্মাণ করে এবং সতেরটি পাকা ও কাঁচা রাস্তার নির্মাণ, মেরামত ও ব্রলস্থকরণের অঙ্গীকার করে।

রাজবাড়ী পৌরসভাঃ-বাংলাদেশ লোকাল কাউন্সিলস এন্ড মিউনিসিপ্যাল কমিটিস (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডার, ১৯৭২ অনুযায়ী রাজবাড়ী মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে রাজবাড়ী পৌরসভায় রূপান্তরিত করা হয়। সরকার কর্তৃক একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় পৌরসভার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য। পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠন না করা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত একজন প্রশাসক পৌরসভা পরিচালনা করেন।[১১]

পরবর্তীকালে রাজবাড়ী পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং কমিশনারবৃন্দ পৌর এলাকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। রাজবাড়ী পৌরসভাকে প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় রূপান্তরিত করা হয়। পৌরসভাকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে তিনজন করে মোট নয় জন কমিশনার নির্বাচিত হন।

ভূমি রাজস্ব প্রশাসনঃ- রাজবাড়ী এলাকার প্রাচীন কালের ভূমি রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে এটুকু জানা যায়, ঐ সময় গ্রাম প্রধানদের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হতো। মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে জমিদার সরকারীভাবে কর আদায়কারী ছিল। মুসলিম শাসনামলের ভূমি রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না।

শের শাহ্ (১৫৩৯-১৫৪৫ খ্রীঃ) ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম মুসলিম শাসক যিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমি জরিপ করেন, ফলে বাংলায়ও জরিপকার্য পরিচালিত হয়। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত "কবুলিয়াত" ও "পাট্টা" সিষ্টেম চালু করেন। এর ফলে ভূমির উপর সংশ্লিষ্ট কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নির্দিষ্ট ভূমির মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও এই ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল।

মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে তাঁর রাজস্বমন্ত্রী রাজা তোডরমলের মাধ্যমে রাজস্ব ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়। রাজা তোডরমল সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমি জরিপ করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমির গড় উৎপাদন নির্ধারণ করেন। তিনি মোট গড় উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য করেন। তবে তোডরমল যখন সম্রাট আকবরের অধীনে গোটা সাম্রাজ্যের ভূমি জরিপ করেন তখন সারা বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে আসেনি। রাজা

১১। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, page -342-343.

Dhaka University Institutional Repository

তোডরমলের আমলে বাংলা উনিশ (১৯)টি সরকারে বিভক্ত হয়। প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলার এই অংশে অর্থাৎ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় তাঁর ভূমি জরিপ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয় নি। এই অংশের রাজস্ব হিসেবের জন্য নিশ্চিতভাবে শের শাহ্ -এর রেকর্ডের উপর নির্ভর করতে হয়।

১৬৫৮ সালে বাংলার নবাব যুবরাজ মুহাম্মদ সুজা বাংলায় ভূমি জরিপ করেন এবং আকবরের সময়ের ১০৭ লাখ টাকা রাজস্বের স্থলে, রাজস্ব ১৩১ লাখ টাকায় উন্নীত করেন। নবাব মুর্শিদ কুলীখান বাংলাকে তেরটি চাকলায় বিভক্ত করেন। চাকলাগুলো হলো- ১. বন্দর বালাসোর ২. হিজলী ৩. মুর্শিদাবাদ ৪. বর্ধমান ৫. হুগলী ৬. ভূষণা (বোয়ালমারী) ৭. যশোহর ৮. আকবর নগর ৯. ঘোড়াঘাট ১০. কুড়িবাড়ী ১১. জাহাঙ্গীরনগর ১২. সিলেট ১৩. ইসলামাবাদ পরবর্তীকালে বাংলার বিভক্তি হয় বড় বড় জমিদারীতে। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশ অর্থাৎ বর্তমান রাজবাড়ী জেলা, রাজশাহীর নলদী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।[১২]

বাংলার গভর্নর, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁন (১৭০৩-১৭২৬ খ্রীঃ) যে তেরটি চাকলায় বাংলাকে বিভক্ত করেন, তার কয়েকটি চাকলার অধীনে ছিল বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা। এই চাকলাগুলো হলো-ভূষণা, জাহাঙ্গীরনগর, মুর্শিদাবাদ, যশোহর এবং ঘোড়াঘাট। ফরিদপুর জেলার মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চল -পরবর্তীকালে যা ঢাকা জালালপুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয় এটি সম্পূর্ণ জাহাঙ্গীরনগর চাকলার আওতাধীন ছিল। ফরিদপুর জেলার বাকি অংশ ভূষণা, যশোহর এবং ঘোড়াঘাট চাকলার অধীনে ছিল। রাজবাড়ীর পূর্বাংশ, গোয়ালন্দ, খানখানাপুর, বসন্তপুর, সুলতানপুর, রাজবাড়ী, -ভূষণা চাকলা এবং বালিয়াকান্দি, সমাধীনগর, নাড়ুয়া, মৃগী প্রভৃতি অঞ্চল যশোহর চাকলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ভূষণা এবং যশোহর চাকলাভূক্ত এ অঞ্চলে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণার উদ্ভব হয়। এ গুলো হলো- ১. নসিবশাহী ২. কাসিমনগর ৩. মহিমশাহী ৪. বেলগাছি ৫. নলদী ৬. নশরতশাহী ৭. বিরাহীমপুর

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গোয়ালন্দ মহকুমা (বর্তমান রাজবাড়ী জেলা) যশোহরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮০৭ সালে পাংশা থানা যশোহর থেকে ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭১ সালে গোয়ালন্দ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সময় পাংশা থানা পাবনা থেকে গোয়ালন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৩] বিভিন্ন সময় রাজস্ব সার্ভে করার সময় ফরিদপুর জেলার বড় অংশ অন্য জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্বের ২১০ বর্গমাইলের রাজস্ব সার্ভে হয় পাবনা জেলার সঙ্গে। ফরিদপুর জেলার পূর্ব দিকের ছয় বর্গমাইল, যশোহরের সঙ্গে সার্ভে হয় ১৮৫৬-৫৭ সালে।

১২। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, page:-267-269

১৩। পূর্বোক্ত, page:-1-2,269.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান রাজবাড়ী জেলার রাজস্ব প্রশাসন জেলা প্রশাসকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। জেলা প্রশাসককে সহায়তা করার জন্য একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কাজ করেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তহশীল অফিসগুলো পরিচালিত হয় তহশীলদারদের নেতৃত্বে। তাদেরকে সহায়তা করেন সহকারী তহশীলদারগণ। বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব আদায় ও ভূমি সংক্রান্ত কাজে তহশীল অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেলার পৌর এলাকায় পৌর ভূমি অফিস এবং প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে একজন তহশীলদার ও সহকারী তহশীলদার নিয়োজিত আছেন। তাঁরা নিজ নিজ এলাকার রাজস্ব আদায় করেন। ১৯৭২ সালের সরকারী আদেশে হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা, বেসরকারী কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ক্রেতা-বিক্রেতাদেরকে ইজারাদারদের হয়রানি থেকে রক্ষা করা।

রাজবাড়ী জেলায় ভূমি রাজস্বের পরিমাণ (বার্ষিক)

পৌর এলাকার মধ্যেঃ-

আবাসিক (একর প্রতি)	= ৭০০ টাকা
বাণিজ্যিক (একর প্রতি)	=২২০০ টাকা
কৃষি জমিঃ- ৮ একর ২৬ থেকে ১০ একর	= ৫০ টাকা (একর প্রতি)
১০ একর ১ হতে তদুর্ধ্বে	= ১০০ টাকা (একর প্রতি)

ইউনিয়নেঃ-

আবাসিক (একর প্রতি)	=৫০০ টাকা (পাকা ভিটা)
কৃষি জমিঃ- ৮ একর ২৬ থেকে ১০ একর	=৫০ টাকা (একর প্রতি)
১০ একর ১ হতে তদুর্ধ্বে	=১০০ টাকা (একর প্রতি)।[১৪]

রাজবাড়ী জেলায় ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের প্রশাসনিক কাঠামোঃ-

জেলা প্রশাসক
↓
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
↓
সহকারী কমিশনার (ভূমি) [প্রতি থানায় একজন করে]
↓
কানুনগো (দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন)
↓
তহশীলদার
↓
সহকারী তহশীলদার

১৪। জেলা সদরে অবস্থিত তহশীল অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া জেলা সেটেলমেন্ট অফিসার ও তাঁর সহকারী অফিসারগণ জেলায় ভূমি জরিপ ও রেকর্ড বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেন। জেলায় Vested Property Super (অর্পিত সম্পত্তি) হিসেবে একজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। থানা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট থানার রাজস্ব আহরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তত্ত্বাবধান করতে পারেন। জেলা প্রশাসকের (ভূমি সংক্রান্ত) অফিসের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ এ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

রাজবাড়ী পৌর এলাকার ভূমি সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাবলীঃ-

পৌর ভূমি অফিসের অবস্থান ও জনবলঃ-রাজবাড়ী হাট/বাজার এলাকাভূক্ত ১১১ নং বিনোদপুর মৌজার ১নং খাস খতিয়ানভূক্ত ১৬৭৭ নং দাগের .৪৫ একর ভূমির উপর রাজবাড়ী পৌর ভূমি অফিস অবস্থিত। এ অফিসের মধ্যে রাজবাড়ী সদর থানার দাদশী ও মিজানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস অবস্থিত।

জনবলঃ-

তহশীলদার -১ জন
সহকারী তহশীলদার -১ জন
পিয়ন -২ জন

রাজবাড়ী পৌর সভার আয়তনঃ- ১১.৭৮ কিঃ মিঃ
লোকসংখ্যাঃ-৪১,৯২৪ জন
মোট মৌজার সংখ্যাঃ-১৪টি
রেজিঃ Iএর সংখ্যাঃ-২২ খানা
রেজিঃ IIএর সংখ্যাঃ-৬৩ খানা
মোট জোত সংখ্যাঃ-৪৯৯৯টি
মোট কৃষি জমির পরিমাণঃ-৯৩৮.২৯ একর
২৫ বিঘার উর্ধ্বে কৃষি জমির পরিমাণঃ-১৪৫.০৮ একর
২৫ বিঘার নিম্নে কৃষি জমির পরিমাণঃ-৭৯৩.২১ একর
মোট অকৃষি জমির পরিমাণঃ-৫১৪.৯৪৩০ একর
সর্বমোট জমির পরিমাণঃ-২৩৮৬.৩২৪১ একর
সায়রাত মহালের সংখ্যাঃ-১টি

আবাসিক অকৃষি জমির তথ্যাবলীঃ-

পরিবার সংখ্যাঃ-৩২৮৪টি
জোত সংখ্যাঃ-৩৭৪৪টি
ভূমির পরিমাণঃ-৫০২.৫৭ একর

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি উন্নয়ন করের দাবী

বকেয়া	হাল	মোট
১৩৭২৩৭	৩৫১৭৯৯	৪৮৯০৩৬

বাণিজ্যিক অকৃষি জমির তথ্যাবলী

জোত সংখ্যা-৫২২টি, ভূমির পরিমাণ-১২.৩৭৩৬ একর

২৫ বিঘার উর্ধ্বে কৃষি জমির তথ্যাবলী

পরিবার সংখ্যা-৪১টি

জোত সংখ্যা-২৭৯টি

ভূমির পরিমাণ-১৪৫.০৮ একর

ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (১৯৯৯-২০০০)

বকেয়া	হাল	মোট
১৫,৩২১	১১,৬৫৬	২৬,৯৭৭

২৫ বিঘার নিম্নে কৃষি জমির তথ্যাবলী

পরিবার সংখ্যা-

জোত সংখ্যা-৩০৯টি

ভূমির পরিমাণ-১৬৩.৯৯ একর

ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (১৯৯৯-২০০০)

বকেয়া	হাল	মোট
১৯,৮৭৮		১৯,৮৭৮

সরকারী-আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলী

প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা-৫১টি

জোত সংখ্যা-১৪৫টি

ভূমির পরিমাণ-১৪৮.২১ একর

ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (১৯৯৯-২০০০)

বকেয়া	হাল	মোট
১৪,০১৪	২৭,২২২	৪১,২৩৬

খাস ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

খাস ভূমি প্রথম খন্ড-নাই

খাস ভূমি দ্বিতীয় খন্ড-২৮.৪৫৩৭ একর

খাস ভূমি তৃতীয় খন্ড-১০.৫৫৭৮ একর

খাস ভূমি চতুর্থ খন্ড-নাই

Dhaka University Institutional Repository

বন্দোবস্তকৃত খাস ভূমি-০.৪০ একর
বন্দোবস্ত অযোগ্য খাস ভূমি-০৩.৮৯১৪ একর
বন্দোবস্ত যোগ্য খাস ভূমি-৩৫.১২০১ একর
সর্বমোট খাস ভূমি-৩৯.০১১৫ একর

পরিত্যক্ত, অর্পিত ও অনাগরিক সম্পত্তির তথ্যাবলী

লীজকৃত এ,পি সম্পত্তির পরিমাণঃ-১৬.৫৩ একর
তালিকাভূক্ত সম্পত্তির পরিমাণঃ- ৫১.৫৭৯৬ একর
লীজকৃত সম্পত্তির পরিমাণঃ-২৩.৯৬২৪ একর
লীজ বহির্ভূত তালিকাভূক্ত সম্পত্তির পরিমাণঃ-২৭.৬১৭২ একর

সার্টিফিকেট মোকদ্দমা সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ-

অর্থবৎসর	কেসের সংখ্যা	দাবীকৃত টাকার পরিমাণ
১৯৯৬-৯৭	২২টি	১৩,৩০০/=
১৯৯৭-৯৮	৬৪টি	৬৬,২৬৪/=

পৌরসভার মোট ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (১৯৯৯-২০০০)

বকেয়া	হাল	মোট
৪৭০৫২৯	১৪১৯৫২	৬১২৪৮১

রাজবাড়ী হাট/বাজারটি পৌরসভা কর্তৃক বাংলা ১৪০৬ সনের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত ১৯,৩৭,১৯১ টাকায় আলিমদ্দিন আনসারীসহ ষোলজনের নিকট ইজারা প্রদান করা হয়।[১৫]

১৫। জেলা সদরে অবস্থিত তহশীল অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ পূর্বতন গোয়ালন্দ মহকুমা, রাজবাড়ী জেলায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলার মোট আয়তন ১১১৮.৮০ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা ৮,৩৫,১৭৩ জন।

কলেজ শিক্ষাঃ-রাজবাড়ী জেলার প্রথম কলেজ রাজবাড়ী সরকারী কলেজ। ১৯৬১ সালের ১৮ই জুন কলজেটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা প্রশাসক কাজী আজহার আলী এবং ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬১ তারিখে কলেজ উদ্বোধন করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ আজম খান।[১] জেলায় কলেজ আছে মোট তেরটি। এর মধ্যে সরকারী দুইটি, রাজবাড়ী সরকারী কলেজ এবং সরকারী আদর্শ মহিলা কলেজ। রাজবাড়ী সরকারী কলেজে উচচ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস) এবং স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীগণ অধ্যয়ন করে। উচচ মাধ্যমিক শ্রেণীতে মানবিক, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, স্নাতক (পাস) শ্রেণীতে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান বিভাগ এবং কয়েকটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। রাজবাড়ী সরকারী কলেজে সহশিক্ষা প্রচলিত। এখানে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রদের জন্য পৃথক হোস্টেল আছে।

জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী আদর্শ মহিলা কলেজ জেলার দ্বিতীয় সরকারী কলেজ। সাম্প্রতিককালে কলেজটি সরকারীকরণ করা হয়েছে। এখানে উচচ মাধ্যমিক শ্রেণীতে মানবিক, বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং স্নাতক (পাস) শ্রেণীতে বি, এ, বি, এস, এস এবং বি, কম কোর্স চালু করা হয়েছে। এই কলেজে ছাত্রী হোস্টেল নেই। জেলার সদর থানায় আরও দু'টি নব প্রতিষ্ঠিত কলেজ আছে। ডাঃ আব্দুল হোসেন মহাবিদ্যালয় ও অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম কলেজ নামে এই কলেজ দু'টি এখনও এম, পি, ও (Monthly Pay Order) ভুক্ত হয়নি। জেলার গোয়ালন্দ থানায় একটি মাত্র কলেজ আছে। কামরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় নামে এই কলেজে উচচ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) শ্রেণী চালু আছে। জেলার বালিয়াকান্দি থানায় সবচেয়ে পুরনো এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজ হলো বালিয়াকান্দি মহাবিদ্যালয়। ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে উচচ মাধ্যমিক শ্রেণীতে মানবিক, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, এবং স্নাতক (পাস) শ্রেণীতে কলা, বাণিজ্য, এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ চালু রয়েছে। এই থানায় নব প্রতিষ্ঠিত আরও দু'টি কলেজ আছে। কলেজ দু'টি হলো অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম কলেজ ও মীর মশাররফ হোসেন কলেজ-এর মধ্যে অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম কলেজ এম, পি, ও ভুক্ত।

জেলার পাংশা থানায় সবচেয়ে পুরনো এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজ, পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এটি জেলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এখানে উচচ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), কয়েকটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। কলেজটিতে

১। রাজবাড়ী সরকারী কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

সহশিক্ষা প্রচলিত এবং হোস্টেল আছে। পাংশা থানায় অন্য কলেজগুলো হলো মাছপাড়া কলেজ, কালুখালী কলেজ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন কলেজ, শহীদ দিয়ানত কলেজ। এ কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) শ্রেণী চালু রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাঃ-বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজবাড়ী জেলা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জেলার বিশিষ্ট মুসলিম জমিদার, পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলী, ১৮০১ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, কুষ্টিয়ায় একটি ইংলিশ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বাংলাদেশের প্রথম ইংলিশ হাই স্কুল এবং উপমহাদেশের দ্বিতীয়।[২]

রাজবাড়ী জেলার প্রথম হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, জেলার প্রখ্যাত রাজা সূর্য কুমার রায় বাহাদুর। ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির নাম রাজা সূর্য কুমার ইন্সটিটিউশন বা আর, এস, কে, ইন্সটিটিউশন। এরপর জেলার দ্বিতীয় হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ সালে। এটি প্রতিষ্ঠা করেন জেলার বাণীবহ ইউনিয়নের বিশিষ্ট জমিদার বাবু গীরিজা শংকর মজুমদার। শুরুতে স্কুলটির নামকরণ করা হয় "দি গোয়ালন্দ হাই ইংলিশ স্কুল"। বর্তমানে স্কুলটির নাম 'রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়'। জেলায় সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে দু'টি, সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় দু'টি, বেসরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় উনপঞ্চাশটি, বেসরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নয়টি। জেলায় সিংহভাগ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত। সরকার বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রদত্ত মাসিক মূল বেতনের শতকরা আশি ভাগ প্রতি মাসে প্রদান করেন। সরকারী এবং বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো দুপুর বারটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।

সরকার "মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প"- এর আওতায় মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়ন এবং উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই সুবিধা সংশ্লিষ্ট ছাত্রী বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পাবেন। জেলার সরকারী এবং বেসরকারী উভয় শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকার আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করে থাকে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সরকারের ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট।

জেলায় কলেজিয়েট স্কুল আছে দু,টি। মাধ্যমিক স্কুলে একাদশ শ্রেণী চালু করে কলেজিয়েট স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে বত্রিশটি।[৩] জেলার বালিয়াকান্দি থানায় মেয়েদের জন্য একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। জেলায় সরকারী শিশুসদন আছে একটি। এখানে এতিম ছেলে-মেয়েদের আশ্রয়, খাদ্য ও শিক্ষা দেয়া হয়। জেলার খ্যাতনামা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে 'রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়' অন্যতম।

২। স্মরণিকা, রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ পুর্তি সংখ্যা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৫।
৩। জেলা তথ্য অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ীর রাজা সূর্যকুমারের সঙ্গে বাণীবহর জমিদার (বাণীবহ রাজবাড়ী জেলা সদর থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে, জেলার সদর থানার একটি ইউনিয়ন) বাবু গৌরিজা শংকর মজুমদারের বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। প্রায়ই উভয়ের মধ্যে জমি নিয়ে মামলা চলত। এক মামলায় সূর্যকুমার পরাজয় বরণ করেন এবং মামলার খরচ হিসেবে জমিদার গৌরিজা শংকর মজুমদার চল্লিশ হাজার টাকা পান। ঐ টাকা দিয়ে তিনি নিজ জমির উপর ১৮৯২ সালে একটি হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম দেন "দি গোয়ালন্দ হাই ইংলিশ স্কুল"। স্কুলটির জন্য তিনি দশ একর জমি দান করেন (স্কুলটি রাজবাড়ী পৌর এলাকায়, শহরের রেলগেট এলাকা থেকে প্রধান সড়ক দিয়ে দক্ষিণ দিকে কিছু দূর এগিয়ে সড়কের পূর্ব পাশে অবস্থিত)। এটি রাজবাড়ী জেলার তৃতীয় স্কুল ও দ্বিতীয় হাই ইংলিশ স্কুল। স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানে একটি হোটেল ও জমিদার গৌরিজা শংকর মজুমদারের ডাকবাংলো ছিল।[৪] কলকাতা থেকে বাণীবহ আসা-যাওয়ার পথে তিনি এই ডাকবাংলোয় বিশ্রাম নিতেন। রাজবাড়ী শহর থেকে এক মাইল উত্তরে 'গোদার বাজার' নামক স্থান থেকে তৎকালীন সময়ে নদীপথে কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। স্কুলটি যেখানে অবস্থিত, তখন এই স্থানটি সজ্জনকান্দা গ্রামের মধ্যে ছিল (বর্তমানে স্থানটি বেড়াভাঙ্গা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত)। সজ্জনকান্দা থেকে জমিদার গৌরিজা শংকর মজুমদার আট বেহারার পাল্কিতে বাণীবহ যেতেন বলে জানা যায়।

১৮৯২ সালের জানুয়ারী মাসে কয়েকজন ছাত্র নিয়ে শুরু হয়েছিল গোয়ালন্দ হাই স্কুলের কার্যক্রম। সে দিন যাঁরা স্কুলের প্রথম ছাত্র হবার গৌরব অর্জন করে ছিলেন, কালের করাল গ্রাসে সে নামগুলো বিস্মৃত হয়ে গেছে। সেই সময় সেই শিশু বিদ্যালয়ের পরিচর্যা ও পরিচালনার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন, বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক সর্বজন শ্রদ্ধেও বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য (এম, এ, বি, এল)। তিনি ও তাঁর সহকর্মী পাঁচজন বিদগ্ধ শিক্ষক বিদ্যালয়টির উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। বিদ্যালয়ের এই প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ১৯০১ সালে শিক্ষকতা পেশা পরিত্যাগ করে কলকাতায় হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এসময় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন বাবু মহেন্দ্র কুমার পাল-বি. এ(১৯০২-১৯০৬)।

এরপর প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন বাবু অখিল ভূষন মৈত্র (বি, এ)। তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর(১৯০৭-১৯৩২) অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এসময় পার্শ্ববর্তী আর, এস, কে হাই স্কুলের লেখাপড়া, খেলাধুলা ও পরীক্ষার ফলাফল অপেক্ষা গোয়ালন্দ হাই স্কুলের মান উন্নত ছিল এবং সারা দেশেই তা সুবিদিত ছিল। অন্যান্য জেলার ছাত্ররাও এখানে এসে অধ্যয়ন করতো। এরপর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন বাবু এস, এন, সেন (বি, এ)। তিনি কয়েক বছর (১৯৩৩-১৯৩৮) দায়িত্ব পালন করার পর বিদায় নেন। এরপর প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে আসেন বাবু নরেন্দ্র কুমার দাস গুপ্ত (এম, এ, বি,এল)। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ভারতে চলে যান।

১৯৪৭ সালের শেষ দিকে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন বাবু শিবেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (বি, এ, বি, টি)। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। বিদ্যালয়ের পূর্ব পাশে তাঁর বাসগৃহ ছিল। প্রধান

৪। স্মরণিকা, রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক হিসেবে তাঁর সাফল্যের কথা রাজবাড়ীতে আপামর জনগণের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় তৎকালীন সময় পর্যন্ত অনেকগুলো উচচ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু ফরিদপুর জেলা স্কুলের পরেই সর্ব বিষয়ে উন্নত, সুপরিচিত ছিল গোয়ালন্দ হাই স্কুল। ১৯৫৩-৫৪ সালে বিদ্যালয়ে স্বল্পকালের জন্য প্রধান শিক্ষক হিসেবে আসেন জনাব মোকাররম হোসেন।

এরপর বিদ্যালয়ের অনেক দিনের সুখ-দুঃখের সাথী ও সহকারী প্রধান শিক্ষক বাবু বিজয় গোবিন্দ আচার্য (বি, এ) ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রূপে (১৯৫৪-১৯৫৫) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অংক ও ইংরেজীতে এতদঞ্চলের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এসময় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সেক্রেটারী ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ আজাহার উদ্দীন আহমদ ও অ্যাডভোকেট মাজেদ আলী খাঁন। বিদ্যালয়কে "এ" গ্রেডে উন্নীত এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করায় যে দৃষ্টান্ত তাঁরা উভয়েই স্থাপন করেছিলেন তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য।

১৯৫৫ সালে বিদ্যালয়ে আগমন করেন নিবেদিতপ্রাণ, বিজ্ঞ ও গভীর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক। তাঁর সময়কালে এ বিদ্যালয় "রাজবাড়ী মডেল হাই স্কুল" ও "এ" গ্রেডের বিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকমন্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় ১৯৬৮সালে বিদ্যালয়টি সরকারী উচচ বিদ্যালয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুল হক ১৯৭২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

এ বিদ্যালয় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক ছাত্র এস, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়াও বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করেছেন। এ বিদ্যালয়ের স্বল্পকালীন ছাত্র ছিলেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "নাসা"র প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আহমদ এর্তেজা মরজী সহ দেশ-বিদেশের সরকারী ও বেসরকারী অনেক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ সালহউদ্দীন আহমদ ও বর্তমান অধ্যাপক ডঃ এ, বি, এম, মাহমুদ এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রথম থেকেই সন্তোষজনক। অনেক মেধাবী ছাত্র প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন- ১৯৫২ সালে ফকীর আব্দুর রশীদ (জুনিয়র বৃত্তি), ১৯৫৯ সালে
এ, এম, বাশারত আলী (প্রাইমারী বৃত্তি), শহীদুল ইসলাম, শাহ মুস্তফা রশীদ আল হেলাল, শাহ মুর্তজা রশীদ আল হেলাল, আমিনুল ইসলাম, মাসুদুজ্জামান।

এছাড়া বোর্ডের ম্যাট্রিক ও এস, এস, সি পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্রগণ হলেন, ১৯৬৫ সালে এ, এম, বাশারত আলী মেধাতালিকায় এগারতম, ১৯৭৭ সালে এ, কে, এম শহীদুল ইসলাম ঢাকা বোর্ডে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ঢাকা বোর্ডের কৃষি বিভাগে বিভিন্ন সময় প্রথম স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করেন যথাক্রমে এ, কে, এম আমিনুল ইসলাম, অনিল কুমার সাহা, মোমেনুল ইসলাম। এছাড়া আমিরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

(দ্বিতীয় স্থান), নজরুল ইসলাম (চতুর্দশ স্থান), মাসুদুজ্জামান (নবম স্থান), সাইফুল হক (একাদশ স্থান), মাহবুব জান চৌধুরী(উনবিংশ স্থান) সহ আরও কিছু ছাত্র বিভিন্ন সময়ে বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে বিদ্যালয়ের সুনাম বয়ে আনেন।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ প্রতি বছরই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯৬৮ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্র শহীদুন্নবী প্রাদেলিক পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সুনাম অর্জন করেন। এ বছর রিলে-রেসে এ বিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে। এ বিদ্যালয়ের ছাত্র এরশাদুন্নবী ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় কৃতিত্ব অর্জন করেন। এ ঐতিহ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ বর্তমান সময়েও অক্ষুন্ন রেখেছে। সাহিত্য- সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের কবিতা, গল্প, রম্য রচনা প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে "আল-হেলাল" নামে ১৯৬৮ সালে, "কুহুতান" নামে ১৯৮৪ সালে এবং "রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয় বার্ষিকী" নামে ১৯৯০ সালে স্কুল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৯০ সালে এ বিদ্যালয় বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা বিভাগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি অর্জন করে পুরস্কৃত হয়।[৫]

১৮৯২ সালে বাণীবহ-র জমিদার বাবু গীরিজা শংকর মজুমদার, সজ্জনকান্দা মৌজায় কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র সমন্বয়ে যে বিদ্যানিকেতনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, কালের পরিক্রমায় সেই শিক্ষায়তন শতবর্ষ অতিক্রম করে শুধু রাজবাড়ী জেলা নয়, সমগ্র দেশের অন্যতম প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠের মর্যাদা লাভ করে শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ ইতিহাস ও উজ্জল ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। জেলার অন্যান্য খ্যাতনামা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো রাজা সূর্যকুমার ইন্সটিটিউশন (১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত), রাজবাড়ী সরকারী বালিকা উচচ বিদ্যালয় (১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত), হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ উচচ বিদ্যালয় (১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত), পাংশা। ইয়াসিন উচচ বিদ্যালয় (রাজবাড়ী জেলা সদরে রেলওয়ের উদ্যোগে ১৯৫১ সালে স্থাপিত), নাজির উদ্দীন হাই স্কুল, গোয়ালন্দ (১৯৪৩ সালে স্থানীয় জমিদার কর্তৃক মধ্য ইংরেজী স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত), তমিজ উদ্দিন খাঁন উচচ বিদ্যালয়, খানখানাপুর, রাজবাড়ী। সুরাজ মোহিনী ইন্সটিটিউশন, খানখানাপুর, রাজবাড়ী। পাংশা জর্জ হাইস্কুল, বরাট উচচ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী। রতনদিয়া হাইস্কুল,কাপ্তখালী, রাজবাড়ী। বালিয়াকান্দি হাই স্কুল (১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত), জেলা সদরে স্থাপিত দেরেবাংলা বালিকা উচচ বিদ্যালয়।

প্রাথমিক শিক্ষাঃ-রাজবাড়ী জেলায় আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। ১৮৪০ সালে নবাব মীর মোহাম্মদ আলী পদমদীতে(জেলার বালিয়াকান্দি থানার একটি গ্রাম)একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সমগ্র রাজবাড়ী জেলার প্রথম স্কুল।[৬] এরপর বিভিন্ন সময়ে জেলার অনেক স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৬৮টি এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬০ টি।[৭] জেলায় গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষকসহ চার/পাঁচ জন শিক্ষক রয়েছেন।

৫। স্মরণিকা, রাজবাড়ী সরকারী উচচবিদ্যালয় শতবর্ষ পুর্তি সংখ্যা। ১৯৯৩, পৃষ্ঠা:-১৬-১৭।

৬। স্মরণিকা, রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয় শতবর্ষ পুর্তি সংখ্যা-১৯৯৩,পৃষ্ঠা-১৫।

৭। জেলা তথ্য অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করানো হয়। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই স্তরে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম স্তর সকাল দশটা থেকে বারটা এবং দ্বিতীয় স্তর বারটা থেকে চারটা পর্যন্ত। মাঝে এক ঘন্টা বিরতি দেয়া হয়। প্রথম স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী এবং দ্বিতীয় স্তরে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সরকারী তহবিল থেকে বেতনভাতা পেয়ে থাকেন। এই বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সরকারের ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট বা সুবিধা প্রদান বিভাগ। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সরকার নির্দিষ্ট হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করেন। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রেক্ষিতে সরকারী এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এই জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক।

কারিগরী শিক্ষাঃ-রাজবাড়ী জেলায় কারিগরী শিক্ষার ঐতিহ্য রয়েছে। জেলার অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী দেশের খ্যাতনামা কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষা লাভ করে দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন পদে কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে। এই জেলায় ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট রয়েছে দু'টি। জেলার অধিবাসীদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষা বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠান দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরী শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়া জেলার বেশ কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে কম্পিউটার কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাঃ- রাজবাড়ী জেলায় মাদ্রাসা শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানে ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা প্রদান করা হয়। রাজবাড়ী জেলায় ১৯৮টি মাদ্রাসা আছে। এর মধ্যে দাখেল মাদ্রাসায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দেয়া হয়।

রাজবাড়ী জেলায় শিক্ষার হার:-

পাঁচ বছর এবং তদুর্ধ বয়সের

মোট শিক্ষিতের হার-২৪.২৩ শতাংশ
পুরুষ -২৯.৯৮ শতাংশ
মহিলা -১৮.০৫শতাংশ
জেলার গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার হার-২২.০৭ শতাংশ
পুরুষ -২৭.৭৩ শতাংশ
মহিলা -১৫.৯৮ শতাংশ

শহর এলাকার শিক্ষার হার -৪২.৬৫ শতাংশ
পুরুষ -৪৯.০৭ শতাংশ
মহিলা -৩৫.৬৮ শতাংশ

Dhaka University Institutional Repository

সাত বছর এবং তদুর্ধ বয়সের

জেলার মোট শিক্ষিতের হার-২৬.৪৩ শতাংশ
পুরুষ -৩২.৭০ শতাংশ
মহিলা -১৯.৬৮ শতাংশ।[৮]

উপরিউক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জেলার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা এগিয়ে আছে।

রাজবাড়ী জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ-

মহাবিদ্যালয়ঃ-	১৩টি
সরকারী মহাবিদ্যালয় (পুরুষ)ঃ-	১টি
সরকারী মহাবিদ্যালয় (মহিলা)ঃ-	১টি
বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ঃ-	১১টি

বিদ্যালয়সমূহঃ-

সরকারী উচচ বিদ্যালয় (বালক)ঃ-	২টি
সরকারী উচচ বিদ্যালয় (বালিকা)ঃ-	২টি
বেসরকারী উচচ বিদ্যালয় (বালক)ঃ-	৪৯টি
বেসরকারী উচচ বিদ্যালয় (বালিকা)ঃ-	৯টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ-	২৬৮টি
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ-	৬০টি
মাদ্রাসাঃ-	১৯৮টি
ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটঃ-	২টি
সরকারী শিশু সদনঃ-	১টি
কলেজিয়েট স্কুলঃ-	২টি
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ-	৩২টি
গণশিক্ষা কেন্দ্রঃ-	৯১টি
দূর শিক্ষণ কেন্দ্রঃ-	৩টি
কে, জি, স্কুলঃ-	৭টি
সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমঃ-	১৩০টি।[৯]

বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ-১০৯ টি,
পাবলিক লাইব্রেরী(সরকারী)ঃ- ১টি, বেসরকারী - ১০ টি।[১০]

৮। বাংলাদেশ পপুলেশন সেন্সাস রাজবাড়ী জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,১৯৯৫,পৃষ্ঠা-xii
৯। জেলা তথ্য অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।
১০। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী জেলায় গণশিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে একানব্বইটি। সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ পরিচালিত এসব কেন্দ্রে জেলার বয়স্ক নিরক্ষর জনসাধারণকে স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা হয়। জেলার নিরক্ষরতা দূরীকরণে এই কেন্দ্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গণশিক্ষা কেন্দ্রে বয়স্ক নর-নারীদের অক্ষর জ্ঞান দান ছাড়াও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। নিরক্ষরতা দেশের অন্যান্য জেলার মত এ জেলায়ও বড় সমস্যা। সরকার এ জেলাকে নিরক্ষর মুক্ত করার জন্য সম্প্রতি " জাগরিত রাজবাড়ী" কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। জেলায় দূর শিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে তিনটি। এ কেন্দ্রগুলোতে দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়। জেলায় কিন্ডার গার্টেন স্কুল আছে সাতটি। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এ স্কুলগুলোতে অধ্যয়ন করে। এ স্কুলগুলোর ফিঃ সাধারণ স্কুলের তুলনায় বেশী।

জেলায় সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম আছে ১৩০ টি। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোই এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। জেলার শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে এবং সার্বিক শিক্ষা উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। জেলায় বেসরকারী সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ১০৯ টি। শিক্ষা বিস্তারে এসব প্রতিষ্ঠান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জেলায় কর্মরত বেসরকারী সংস্থা গুলোর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, সংযোগ, কে. কে. এস প্রভৃতি সংস্থা সর্বাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে।

জেলায় একটি সরকারী গণ গ্রন্থাগার রয়েছে। জেলা সদরে অবস্থিত এই গণ গন্থাগারে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা রাখা হয়। এছাড়া বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ এই গ্রন্থাগারে আছে। প্রতিদিন অনেক লোক গণ গ্রন্থাগারে আসেন এবং পত্রিকা ও বই পড়েন। জেলায় বেসরকারী গণ গ্রন্থাগার আছে দশটি। জেলা সদরে একটি এবং অন্যান্যগুলো জেলার থানা সদরসমূহে ও অন্য স্থানে। এ লাইব্রেরীগুলোতে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রত্রিকা এবং বিভিন্ন বিষয়ে বই যেমনঃ উপন্যাস, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ, ধর্মীয়, আইন, নাটক, শিল্পকলা প্রভৃতি রয়েছে। অনেক পাঠক এই গ্রন্থাগারগুলোতে প্রতিদিন অধ্যয়ন করেন।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজবাড়ী জেলায় পাঁচ বছর এবং তদুর্ধ বয়সের মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্র ঃ-

শিক্ষার ক্ষেত্র	সংখ্যা	শতাংশ
সমস্ত ক্ষেত্র	২,৩৫,০৫৫	১০০.০০
সাধারণ শিক্ষা	২,২৯,৭৮৯	৯৭.৭৬
কারিগরী শিক্ষা(ভোকেশনাল)	৪৪৫	.১৯
কারিগরী শিক্ষা	৩০২	.১৩
ধর্মীয়	৪,৫১৯	১.৯২

সারণী- ১০

জেলার পাঁচ বছর বা তদুর্ধ বয়সের মানুষের শ্রেণী ভিত্তিক শিক্ষার বিবরণঃ-

১১। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস রাজবাড়ী জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,১৯৯৫,পৃষ্ঠা-xv

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী	সংখ্যা	শতাংশ
সকল শ্রেণী ও স্কুলে যায় না	৭০৪,৪৯৮	১০০.০০
স্কুলে যায় না	৪৬৯,৪৪৩	৬৬.৬৪
প্রথম শ্রেণী	২৩,৮০০	৩.৩৮
দ্বিতীয় শ্রেণী	২৫,৪৪৩	৩.৬১
তৃতীয় শ্রেণী	২৪,২৪১	৩.৪৪
চতুর্থ শ্রেণী	২২,৯০৫	৩.২৫
পঞ্চম শ্রেণী	৪৪,৮৪৮	৬.৩৭
ষষ্ঠ শ্রেণী	১৪,৫৭৬	২.০৭
সপ্তম শ্রেণী	১২,৭৩৯	১.৮১
অষ্টম শ্রেণী	১৭,১৭৫	২.৪৪
নবম শ্রেণী	১৯,৩৯৫	২.৭৫
এস, এস, সি/দাখিল	১৬,৬৪৯	২.৩৬
ট্রেনিং	৩,১৮৫	.৪৫
এইচ, এস, সি/আলিম	৫,৯৯৪	.৮৫
ডিপ্লোমা	৫৭৮	.০৮
গ্রাজুয়েট/ফাজিল	২,৪৪৭	.৩৫
অনার্স	২৮০	.০৪
মাস্টার্স/কামিল	৭১১	.১০
এম,এস,/পি,এইচ,ডি/অন্যান্য	৮৯	.০১

সারণী-১১

জেলায় চার বছর এবং তদুর্ধ বয়সের ছেলেমেয়েদের স্কুলে উপস্থিতিঃ-

ছাত্র/ছাত্রী	সংখ্যা	শতাংশ
মোট	৭,৩২,৮০৮	১০০.০০
স্কুলে উপস্থিতি	১,২৮,০১১	১৭.৪৭
স্কুলে উপস্থিত বিহীন	৬,০৪,৭৯৭	৮২.৫৩

সারণী-১২

১২। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস-রাজবাড়ী জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-xv।

Dhaka University Institutional Repository

জেলায় পাঁচ থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রীদের বয়সের গ্রুপ ভিত্তিক স্কুলে উপস্থিতিঃ- (১৯৯১সাল)

বয়স গ্রুপ	জেলা		গ্রাম		শহর	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
মোট	১,২৬১৯৬	৩২.৫৮	১,০৭,৯৯৩	৩১.১৬	১৮,২০৩	৪৪.৭৭
৫-৯	৪৭,৭৮২	৩২.৬৬	৪১,৯৩৯	৩১.৪৩	৫,৮৪৩	৪৫.৪৬
১০-১৪	৫৪,৩০৫	৫০.৭২	৪৬,৭৬৭	৪৮.৯৩	৭,৫৩৮	৬৫.৬৭
১৫-১৯	১৮,৬০৭	২৭.৭৩	১৫,০৭২	২৫.৫৬	৩,৫৩৫	৪৩.৪৩
২০-২৪	৫,৫০২	৮.২৩	৪,২১৫	৭.১৯	১,২৮৭	১৫.৭১
পুরুষ	৭৩,০৩২	৩৬.৪২	৬৩,২৪৩	৩৫.১৭	৯,৭৮৯	৪৭.৩৪
৫-৯	২৬,০৮০	৩৪.৩৪	২৩,০০৯	৩৩.১৬	৩,০৭১	৪৬.৮০
১০-১৪	৩০,৪৪১	৫২.২৫	২৬,৫১৫	৫০.৭২	৩,৯২৬	৬৫.৬০
১৫-১৯	১২,১৩০	৩৪.২৪	১০,২২৪	৩২.৬৬	১,৯০৬	৪৬.২৬
২০-২৪	৪৩৮১	১৪.১৯	৩৪৯৫	১৩.০১	৮৮৬	২২.১০
মহিলা	৫৩,১৬৪	২৮.৬৪	৪৪,৭৫০	২৬.৮৩	৮,৪১৪	৪২.১০
৫-৯	২১,৭০২	৩০.৮৫	১৮,৯৩০	২৯.৫৬	২,৭৭২	৪৪.০৭
১০-১৪	২৩,৮৬৪	৪৮.৯০	২০,২৫২	৪৬.৭৬	৩,৬১২	৬৫.৭৬
১৫-১৯	৬,৪৭৭	২০.৪৪	৪,৮৪৮	১৭.৫২	১,৬২৯	৪০.৫৩
২০-২৪	১,১২১	৩.১২	৭২০	২.২৭	৪০১	৯.৫৯

সারণী- ১৩ [১৩]

শিক্ষাক্ষেত্রে জেলার সাধারণ অবস্থাঃ- রাজবাড়ী জেলা জাতীয়ভাবে বেশ কিছু কৃতি শিক্ষাবিদ উপহার দিয়েছে। এ জেলার শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিকগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। জেলার কৃতি সন্তান ড: কাজী মোতাহার হোসেন-বরেন্য শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক এবং ক্রীড়ানুরাগী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরী, রওশন আলী চৌধুরী সহ অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি এ জেলাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জেলার অনেক কৃতি শিক্ষাবিদ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

তাই জাতীয়ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এ জেলার অবদান কম না হলেও, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমে এ জেলা পিছিয়ে আছে। জেলার বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী স্বাক্ষর জ্ঞানহীন। জেলার সিংহভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ অর্থাভাবে জর্জরিত। যাঁরা অশিক্ষিতদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁরা নিজেরা আর্থিক সংকটে আছেন বলে জেলার শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া জেলার প্রায় সব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব রয়েছে।

---

১৩ । বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস রাজবাড়ী জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,১৯৯৫,পৃষ্ঠা-২৪

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যঃ-সাহিত্য ক্ষেত্রে রাজবাড়ী জেলা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে এ জেলায়, যাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সুনাম অর্জন করেছেন। এদের সাহিত্যকর্ম সুধীমহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এরা পুরস্কৃত হয়েছেন। এ জেলায় কিছু সৃজনশীল সাহিত্য সংগঠন রয়েছে, যারা সাহিত্যের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। "কাব্যচক্র" এমন একটি সাহিত্য সংগঠন । জাতীয় জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিন যেমন: একুশে ফেব্রুয়ারী, বিজয় দিবস,স্বাধীনতা দিবসে জেলা থেকে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন রং ও ডিজাইনের প্রচ্ছদে অনেক সংগঠন এসব স্মরণিকা প্রকাশ করে। এতে জেলার নবীন-প্রবীন লেখকেরা গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা লেখেন। এছাড়া জেলার বিভিন্ন উচচ বিদ্যালয়সমূহে "স্কুল ম্যাগাজিন" প্রকাশিত হয়। এতে বিদ্যালয়গুলোর সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীরা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, প্রভৃতি লিখে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করেন। জেলার মহাবিদ্যালয়সমূহে সাহিত্য-সংস্কৃতি উৎসব পালিত হয়। এ উপলক্ষে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। এতে ছাত্র- ছাত্রীদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, প্রভৃতি ছাপা হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতি উৎসবে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার স্ব স্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ বিচারকের ভূমিকা পালন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে শ্রেষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ জেলায় কিছু শিশু সংগঠন রয়েছে। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এসব সংগঠন বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে। ছবি আঁকা, শিশু সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি জেলা সদরের "আবোল তাবোল" নামে একটি শিশু সংগঠন ঢাকায় "এষা খাঁন স্মৃতি পুরস্কার" লাভ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হেনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

রাজবাড়ী জেলার খ্যতনামা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং তাদের অবদানঃ-

রওশন আলী চৌধুরীঃ-রওশন আলী চৌধুরী ১৮৭৮ সালে রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার মাগুরাডাঙ্গী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৬ সালে মাসিক পত্রিকা "কোহিনুর" প্রকাশ এবং সম্পাদনা করেন। তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ লেখেন যা "কোহিনুর" এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এয়াকুব আলী চৌধুরীঃ-মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ১৮৮৭ সালে রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার পাংশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সমস্ত জীবন সংগ্রামমুখরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেও তিনি সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে ইসলামী দর্শন এবং ইসলামী সংস্কৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত কুশলতার সংঙ্গে। তিনি কিছুদিন "কোহিনুর" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সাহিত্য কর্মগুলি নিম্নরূপ:

শান্তিধারা, মানব মুকুট, নুরনবী, ধর্মের কাহিনী। বাংলা একাডেমী তাঁর প্রবন্ধগুচছ প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম"এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী"। ১৯৩৮ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

কাজী আব্দুল ওদুদঃ- প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক কাজী আব্দুল ওদুদ রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বাহাদুরপুর ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি যখন ঢাকা কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক, তখন কাজী মোতাহার হোসেন ও সৈয়দ আবুল হোসেনের সঙ্গে "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" নামে একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে এদেশের মুসলিমগণের মুক্ত করার জন্য এবং তাদেরকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালের ১৯ শে জানুয়ারী ঢাকায় "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজী আব্দুল ওদুদ মুসলিমগণের মধ্যে যুক্তিবাদ এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রসারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন ছোট গল্প ও উপন্যাস লেখার মধ্য দিয়ে। পরে তিনি প্রবন্ধ ও সাহিত্য সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সাহিত্য কর্মগুলো হলোঃ- মীর পরিবার (১৯১৮), নদীবক্ষ, আজাদ, তরুন, (ছোট গল্প), রবীন্দ্র কাব্য পাঠ (সমালোচনা) (১৯২৮), কবিগুরু, গ্যেটে, সমস্যা ও সমাধান, সমাজ ও সাহিত্য (১৯৫৫), বাংলার জাগরণ (প্রবন্ধ), হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, পথ ও বিপথ (নাটক), আজকের কথা, ব্যবহারিক শব্দ কোষ(অভিধান) প্রভৃতি।

কাজী মোতাহার হোসেনঃ-বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে যে সব মহান ব্যক্তি তাদের অসামান্য প্রতিভার আলোকে এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এদেশের মানুষের, বিশেষ করে বাঙালী মুসলিম সমাজের সার্বিক মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন তাদের অন্যতম। তাঁর কর্মকান্ড শুধুমাত্র প্রগতিশীল সমাজ গঠনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তিনি যে প্রতিভার উজ্জল স্বাক্ষর রেখেছেন তা অবিস্মরণীয়।

বাঙালী মুসলিম সমাজের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীন চর্চা ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অগ্রনায়ক কাজী মোতাহার হোসেন, ১৮৯৭ সালের ৩০ শে জুলাই কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থানার লক্ষীপুর গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃভূমি রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামে। কাজী মোতাহার হোসেনের পিতার নাম কাজী গওহর উদ্দীন আর মায়ের নাম তসিরুন্নেসা।

382731

কাজী মোতাহার হোসেনের শিক্ষা জীবনের শুরু তাঁর গ্রামের পাঠশালাতেই। ১৯০৬ সালে তাঁকে তাঁর মামা বাড়ীর নিকটবর্তী যদুবয়রা প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হয়। এখানে ভাল না লাগায় তিনি পুনরায় নিজের গ্রামের স্কুলে চলে আসেন এবং এখান থেকে ১৯০৭ সালে মাসিক দুই টাকা বৃত্তি নিয়ে নিম্ন প্রাইমারী পাশ করেন। এরপর কুষ্টিয়া জেলার সেনগ্রাম মাইনর স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯০৯ সালে বৃত্তি নিয়ে উচচ প্রাইমারী পাশ করেন। একই স্কুল থেকে ১৯১১ সালে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে বৃত্তি নিয়ে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৫ সালে কুষ্টিয়া হাই স্কুল থেকে কাজী মোতাহার হোসেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেসিডেন্সী ও রাজশাহী বিভাগে সর্বোচচ নম্বর পেয়ে মাসিক পনের টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এরপর কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আই, এস, সি-তে ভর্তি হন কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে পরে তিনি রাজশাহী কলেজে চলে আসেন এবং সেখান থেকেই প্রথম বিভাগে আই, এস, সি পাশ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি মেধানুসারে চতুর্দশ স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক বিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে সম্মান সহ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম জোনে

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন।

এম, এ ক্লাসের ছাত্র থাকাকালীন সময়েই ১৯২০ সালে কাজী মোতাহার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ডেমনষ্ট্রেটর হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ডঃ ডব্লিউ, এ, জেনকিন্স তাঁকে এই চাকুরিতে নিয়োগ করেন। এম, এ, পাশ করার পর তিনি বিভাগীয় লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসুর আগ্রহে ও পরামর্শে, উপমহাদেশের সংখ্যাতত্ত্বের জনক ডঃ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের অধীনের "ইন্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটে" পরিসংখ্যান বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে যান এবং ফিরে এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাতত্ত্ব পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান বিজ্ঞান ও গণিত একটি সম্মিলিত বিভাগ ছিল। ১৯৫১ সালে পরিসংখ্যান বিজ্ঞান একটি পৃথক বিভাগে পরিণত হয় এবং কাজী মোতাহার হোসেনকে এই বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এজন্য বলা যেতে পারে এদেশে সংখ্যাতত্ত্ব পঠন পাঠনের তিনিই পথিকৃত।

১৯৫০ সালে কাজী মোতাহার হোসেন "ডিজাইন অব এক্সপেরিমেন্টস" বা "অনুসন্ধানের কাঠামো" বিষয়ের উপর গবেষণার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর এই গবেষণা পত্রের পরীক্ষক ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ রোনাল্ড ফিসার, অধ্যাপক রাজ চন্দ্র বোস ও ডঃ মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন। কাজী মোতাহার হোসেন উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি যা সংখ্যাতত্ত্ব শাস্ত্রে "হোসেনস চেইনরুল" নামে পরিচিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও বহুল প্রশংসিত। ১৯৫৪ সালে তিনি প্রফেসর পদ লাভ করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তাঁকে "সুপার নিউম্যারি প্রফেসর অব ষ্ট্যাটিসটিকস" নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত "ইন্সটিটিউট অব ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং" নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "প্রফেসর এমিরিটাস" পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্তনে তাঁকে সম্মান সূচক "ডক্টর অব সায়েন্স" ডিগ্রী প্রদান করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে ১৯৭৫ সালে তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা দেয়া হয়।

সাহিত্যিক হিসেবে কাজী মোতাহার হোসেন বিশেষভাবে খ্যাত। তাঁর প্রায় শতাধিক প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও গ্রন্থ সমালোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কবিতাও লিখেছেন। তাঁর একটি কবিতা 'আসা-যাওয়া' প্রথমে 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে এটি কবি আব্দুল কাদের ও রেজাউল করিম সম্পাদিত "কাব্য মালঞ্চ" গ্রন্থে সংকলিত হয়। "ঝড়ো বাজের গান" নামে ম্যাক্সিম গোর্কীর একটি কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন। বেশ কয়েকটি পাঠ্য পুস্তকও তিনি রচনা করেন। তবে মৌলিক চিন্তাশ্রয়ী প্রাবন্ধিক হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। তাঁর গদ্যশৈলী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। কাজী মোতাহার হোসেনের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১। মৌলিক ২। অনুবাদ ৩। পাঠ্য পুস্তক

মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে আছে ১। সদ্ভরণ (১৯৩৭) ২। নজরুল কাব্য পরিচিতি (১৯৫৫) ৩। সেই পথ লক্ষ্য করে (১৯৫৮) ৪। নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৭৬)।

অনুবাদঃ- ১। গ্লেটোর সিম্পোজিয়াম (১৯৭০) ২। নিবেদন (১৯৬৭) ৩। বিরহী (১৯৬৮) ৪। কুইজমালা (১৯৬৮) ৫। বিরহিণী (১৯৬৯)।

পাঠ্য পুস্তকঃ- ১। জ্যামিতি প্রবেশ (১৯৫১) ২। সাহিত্য বিকাশ(১৯৫১) ৩। প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ (১৯৫২) ৪। পাকিস্তান ও পৃথিবী (১৯৫৩) ৫। এলিমেন্টস অব ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ (১৯৫৫) ৬। ইন্টারমিডিয়েট জিওমেট্রি (১৯৪৯) ৭। ইসলামের ইতিবৃত্ত ৮। তথ্য গণিত (১৯৬৯) ৯। গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস (১৯৭০) ১০। আলোক বিজ্ঞান।

কাজী মোতাহার হোসেনের সাহিত্য চর্চা শুরু হয় কুষ্টিয়া হাই স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায়। তাঁর আদর্শ শিক্ষক জ্যোতিন্দ্র মোহন রায়ের উৎসাহ ও প্রেরণাতেই লেখায় হাতে-খড়ি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা "গ্যালিলিও"। এটি "সওগাত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যের মত বিজ্ঞানেও কাজী মোতাহার হোসেন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। উপমহাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য পি, সি, রায় ও বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ ডঃ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলেন তিনি। বোস-আইনষ্টাইন থিওরীর সুবিখ্যাত প্রফেসর সত্যেন্দ্র নাথ বসুর সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। এদের সাহচর্য তাঁর বিজ্ঞান মানস গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কুষ্টিয়া হাই স্কুলে পড়াকালীন সময়েই কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গীত চর্চায় হাতে খড়ি। ১৯১৭-১৮ সালে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ হাকিম মোহাম্মদ হোসেনের কাছে দুই বছর টপ্পা, ঠুংরী ও খেয়াল শেখেন। সঙ্গীতের উপর তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

ক্রীড়াক্ষেত্রেও কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন সফল। ছেলে বেলা থেকেই তাঁর ক্রীড়ানুরাগ লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র জীবনেই তিনি ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, দাবা ও সাঁতারে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। দাবা খেলায় বাংলাদেশে তিনি এক কিংবদন্তীর নায়ক। তিনি দাবা খেলার প্রতি আকৃষ্ট হন সেনগ্রাম স্কুলে পড়াকালীন সময়ে, স্কুলের শিক্ষক কুবের ফুন্ডুর দাবা খেলা দেখে। কলকাতার সুফী সাহেব এবং ঢাকার মন্ডল সাহেবের কাছেও তিনি দাবা খেলা শিখেছিলেন। ১৯২৫ সালে ষ্টেটসম্যান পত্রিকার মাধ্যমে "অল ইন্ডিয়া চেস ব্রিলিয়েন্সী" প্রতিযোগিতায় মোট ১০৩ নম্বরের মধ্যে ১০১ নম্বর পেয়ে প্রথম হন এবং "মহারথী" খেতাবে ভূষিত হন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত একনাগারে চল্লিশ বছর অবিভক্ত বাংলা এবং তদানীন্তন পাকিস্তানে তিনি চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। দাবা খেলায় কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি "দাবাগুরু" খেতাবে ভূষিত হন। লন টেনিস খেলাতেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় আছে। ১৯৫১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত লন টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি চ্যাম্পিয়ন হন।

কাজী মোতাহার হোসেন আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুসংস্কারের দাসত্ব থেকে এই দেশের মুসলিমদের মুক্ত করার জন্য এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালের ১৯ শে জানুয়ারী ঢাকায় "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" নামে একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ আবুল হোসেন ও কাজী মোতাহার হোসেন। এদের আন্দোলনের পরিচিতি ছিল "বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন" নামে। "শিখা" ছিল এই গোষ্ঠীর মুখপত্র। এজন্য এই গোষ্ঠীকে শিখা গোষ্ঠীও বলা হতো। এদের শ্লোগান ছিল, "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ঠ, মুক্তি সেখানে অসম্ভব"। এই গোষ্ঠীর কার্যবিবরণী লেখার ভার ছিল কাজী মোতাহার হোসেনের উপর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে তিনি "শিখা" পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

স্বাধীনচেতা ও সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ মনের অধিকারী কাজী মোতাহার হোসেন এই দেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সব সময়ই নিজেকে সংযুক্ত রেখেছিলেন। রাষ্ট্রভাষা, ভাষা সংস্কার, হরফ পরিবর্তন, রবীন্দ্র বিরোধিতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বাংলাই হওয়া স্বাভাবিক এবং সমীচীন"। কাজী মোতাহার হোসেন ছাত্রাবস্থায়ই ১৯২০ সালের ১০ ই অক্টোবর কলকাতার মোহাম্মদ ফয়েজুর রহমান ও মুসলিমা খাতুনের কন্যা সাজেদা খাতুনকে বিয়ে করেন। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে দেশ ও বিদেশে অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। হেগ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ইন্সটিটিউটে তিনিই প্রথম বাঙালী সদস্য। রোমে অবস্থিত আন্তর্জাতিক গণিত ইউনিয়ন ও পাকিস্তান সায়েন্স এসোসিয়েশন-এর পদার্থ বিদ্যা ও গণিত বিভাগের সভাপতি ছিলেন। ভারতীয় পরিসংখ্যান ইন্সটিটিউট কাউন্সিল এবং আমেরিকান ষ্ট্যাটিসষ্টিক্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া ষ্টকহোম, আটলান্টিক সিটি, টোকিওসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

কাজী মোতাহার হোসেন জীবনে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে "সিতারায়ে ইমতিয়াজ" খেতাব প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালে প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে কুমিল্লার একটি সংস্থা তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করে। একই বছর ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা তাঁকে আজীবন সদস্য পদ প্রদান করে। মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার জন্য তাঁকে "নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক" প্রদান করা হয়। ১৯৭৮ সালের ১৫ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন তাঁকে সম্মানীয় আজীবন সদস্যপদ প্রদান করে। কাজী মোতাহার হোসেন অনেক দেশ সফর করেছেন। তিনি যুক্তরাজ্য, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, স্পেন, আর্জেন্টিনা, ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন সব্যসাচী। একাধারে জ্ঞানসাধনা ও খেলাধুলার পারদর্শিতায় তাঁর সমকক্ষ কদাচিৎ দেখা যায়। বাঙালী মুসলিম সমাজে তাঁর মত প্রাণবন্ত, সরল ও কীর্তিমান পুরুষ দুর্লভ। আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার মহান এই

Dhaka University Institutional Repository

পথিকৃত সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও ক্রীড়াক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তার মধ্য দিয়েই তিনি ভাস্বর হয়ে থাকবেন।[১৪]

পরিমল গোস্বামীঃ- পরিমল গোস্বামী ১৮৯৯ সালে রাজবাড়ী জেলার রতনদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে "সচিত্র ভারত" এবং "অলকা" পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা ছিলেন। "ঘুঘু" (১৯৪৪), "লায়কে লেংগে" (১৯৫০), "ম্যাজিক লণ্ঠন" (১৯৫৫), "পথে পথে" (ভ্রমণ,১৯৫৫), "সপ্ত পঞ্চ" (ছোট গল্প সমষ্টি, ১৯৫৭), "স্মৃতি চিত্রন", "বুদবুদ", "শিবনাথ", "গ্রামের সেই লোকটি", "ব্লাক মার্কেট", "আষাঢ়ে দেশ" প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

কাজী আবুল হোসেন ঃ- কাজী আবুল হোসেন রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার পারকুলা গ্রামে, ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পকার ছিলেন। "খুনে রাঙ্গা" (১৯৫৫), "কাশ্মীর", "কালো বৌ", "নারঙ্গী বনে ঝড়", "উমাপদ যশোদ সংবাদ" (১৩৬৫ বাংলা সন), "সতীনের ঘর" (১৩৬২ বাংলা সন), "ফেলে আসা দিন গুলি", "শিরি-ফরহাদ"(১৩৬৩ বাংলা সন), "রাঙ্গা বউ" (১৯৫৫), "নূরবানু" "মা" (১৯৬১), "বন জোৎস্না" (১৩৬৫ বাংলা সন), "বাহাদুর শাহ" (নাটক, ১৩৬৬ বাংলা সন) প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

কাজী আবুল কাশেমঃ- কাজী আবুল কাশেম রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার পারখোলা গ্রামে, ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অভিনেতা ছিলেন। তিনি শিশুদের জন্য লিখেছেন। তিনি গীতিকারও ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলো হলো- "গামা মামার সারে-গা- মা", "বীজের বুকে সবুজ পাতা" "কাঁচা মিঠা", "সবুজ চারা" এবং "গানগুলি মোর"(গানের সমষ্টি)।

সন্তোষ কুমার ঘোষ ঃ- সন্তোষ কুমার ঘোষ ১৯২০ সালে রাজবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। "কিনু গোয়ালার গলি" (উপন্যাস, ১৯৫০), "নান্দা রঙের দিন" (উপন্যাস, ১৯৫২), "চায়না মতি" (ছোটগল্প সমষ্টি, ১৯৫৩), "মোমের পুতুল" (উপন্যাস, ১৯৫৪), প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই)ঃ- রোকনুজ্জামান খান রাজবাড়ী জেলার, পাংশা থানার, পাংশা গ্রামে, ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। "দাদাভাই" হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। "আমার প্রথম লেখা" (১৯৫৭), "আজব হলেও গুজব নয়" (১৯৫৯),"হাট টিমা টিম" (১৯৬২), "ঝিকিমিকি" (১৯৭০) প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। দৈনিক ইত্তেফাকের ছোটদের পাতা তিনি সম্পাদনা করতেন। সম্প্রতি তিনি পরলোকগমন করেন।

রাজিয়া খান:- রাজিয়া খান- প্রয়াত মৌলভী তমিজুদ্দীন খান (পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পীকার)-এর কন্যা। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার এবং

১৪। "চন্দনা", পাংশা থানা সমিতি, ঢাকার মুখপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যকার। তাঁর প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম হলো: "অনুকল্প" (উপন্যাস, ১৯৫৯),"বটতলার উপন্যাস" (উপন্যাস, ১৯৫৯),"আবর্ত" (নাটক, ১৯৬০)।

আব্দুল লতিফ চৌধুরীঃ- আব্দুল লতিফ চৌধুরী রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার পাটিকাবাড়ী গ্রামে, ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" (১৯৫১), "মীর মশাররফ হোসেন" (১৯৫২), "কায়কোবাদ" (১৯৫৫)। এই সবগুলো রচনা সমালোচনা গ্রন্থ।

মুহাম্মদ শামসুর রহমান ঃ-মুহাম্মদ শামসুর রহমান রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার মহেন্দ্রপুর গ্রামে, ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকাশিত বইগুলো হলোঃ- "বৃষ্টি ঝড়া গান" (কবিতাগুচ্ছ, ১৯৬০), "সাঁঝ আকাশের তারা" (ছোটগল্প গুচ্ছ, ১৯৬২), "টান্টি হলো রাজা" (শিশুদের জন্য কবিতার মধ্যে গল্প, ১৯৬৪), "হজরত আলী" (শিশুদের জন্য-১৯৭০) "তিড়িং বিড়িং" (ছড়া গ্রন্থ, ১৯৭০)।

নজরুল ইসলাম চৌধুরী ঃ-নজরুল ইসলাম চৌধুরী রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার হোগলাডাঙ্গা গ্রামে ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লিখেছেন, "মনের বীণায়"(উপন্যাস), "মজার গল্প" (শিশুদের জন্য)।

হাজেরা নজরুল ঃ-হাজেরা নজরুল রাজবাড়ী জেলার সদর থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে ১৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ছোট গল্পকার। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হলো ঃ "জোনাকীর আলো" (ছোট গল্প, ১৩৭৫ বাংলা সন)।

ভোলানাথ সাহাঃ- রাজবাড়ী জেলার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বাবু ভোলানাথ সাহা পাংশা থানার হাবাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন এবং হাবাসপুর গ্রামে ঐ বছরই প্রতিষ্ঠিত "হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ উচচ বিদ্যালয়ে" প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ বছর অর্থাৎ ১৯১৮-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন।

১৯২৫ সালে কাশিম বাজার রাজ উচচ বিদ্যালয় ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। এর পূর্বে ১৯২৩ সালে কতিপয় দুস্কৃতকারীর অগ্নিসংযোগে গোটা স্কুল গৃহ ও আসবাবপত্রাদি পুড়ে যায়। তখন স্কুল গৃহ পাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সময় বাবু ভোলানাথ সাহার নেতৃত্বে স্কুলের সহশিক্ষক মন্ডলী গ্রামে-গঞ্জে সাহায্য ভিক্ষা করেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। ভোলানাথ সাহা তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বিদ্যালয়ের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন কর্মকান্ডে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর অসংখ্য ছাত্র দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

১৯৬০ এর দশকের মধ্যভাগে বাবু ভোলানাথ সাহা নিজগ্রাম হাবাসপুর ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে নিয়ে একমাত্র কন্যার বাড়ী পশ্চিম বঙ্গের কলকাতার

Dhaka University Institutional Repository

পার্শ্ববর্তী সোধপুর পূর্ব পল্লীতে যান। এখানেই ১৯৮৩ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আদর্শ শিক্ষক বাবু ভোলানাথ সাহার ব্যক্তিত্ব অনুকরণীয় এবং তাঁর সময়ানুবর্তিতা, নিষ্ঠা ও সততা আদর্শ স্থানীয়।[১৫]

আমানত আলী মল্লিকঃ-শিক্ষকতাকে মহান পেশা হিসেবে গ্রহণ করে দেশ ও জাতির প্রতি অবদান রেখে যাঁরা প্রভূত খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছেন, আমানত আলী মল্লিক তাঁদের অন্যতম। তৎকালীন ফরিদপুর, বর্তমান রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে ১৯০০ সালের ১লা ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম পিরু মল্লিক।

আমানত আলী মল্লিক ছিলেন তাঁর গ্রামের প্রথম বালক, যিনি শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হয়ে বাগমারা গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। তাঁর বাল্য শিক্ষক ছিলেন কাজী আবুল হোসেন। তখন পাঠশালার শিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত চলত। আমানত আলী পাঠশালার পাঠ কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করে ১৯১৩ সালে হাবাসপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বাবু প্রিয়নাথ কুন্ডু ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ১৯১৫ সালে এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করে পাংশা জর্জ হাই স্কুলে ভর্তি হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯২০ সালে তিনি পাংশা জর্জ হাই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ঐ বছরই তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে আই. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে আই. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা অনুকূল না থাকায় উচ্চ শিক্ষা লাভের আকাঙ্খা বিমর্ষ চিত্তে পরিত্যাগ করেন।

১৯২৫ সালে বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার (তদানীন্তন নদীয়া) কুমারখালী থানার অন্তর্গত সেনগ্রামের মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে (পরবর্তীকালে হাই স্কুল) আমানত আলী মল্লিক প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে কর্মজীবন শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "মুসলিম সমাজ তখন পুরোপুরি জ্ঞান বিমুখ ছিল তাই তিনি দেশে, বিশেষ করে স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন"। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি সেনগ্রাম মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৩৭ বছর শিক্ষকতা করে ১৯৬২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

আমানত আলী মল্লিক শিক্ষকতাকে কেবলমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। তৎকালীন পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। সেনগ্রাম স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর অসংখ্য মেধাবী ছাত্র তৈরী হতো। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সময়কালের বহু কৃতি ছাত্র পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে মর্যাদাপূর্ণ পদে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশে তাঁর অসংখ্য কৃতি ছাত্র রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসহ মর্যাদাপূর্ণ অনেক দায়িত্ব পালন করছেন। সেনগ্রাম স্কুল তৎকালীন নদীয়া জেলার সমস্ত এম. ই. স্কুলের মধ্যে

১৫। "প্লাটিনাম জুবিলী সংখ্যা" হাবাসপুর কে. বি. রাজ উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

ফলাফলের দিক দিয়ে শীর্ষে ছিল। এছাড়া তাঁর ছাত্র যাঁরা সেনগ্রাম স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে হাবাসপুর, পাংশা, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী হাই স্কুলে ভর্তি হতো, তাঁরা প্রতি বছর ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম দিকের সবগুলো স্থান অধিকার করতো। ইংরেজী গ্রামার ও সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি তাঁর ছাত্রদের ইরেজী শিক্ষার ভিত তৈরী করে দিতেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, মুসলিম সমাজের অগ্রজ চিন্তাবিদরা পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন পরিচালনার প্রয়াসে ঢাকায় 'শিখা' গোষ্ঠী গড়ে তোলেন, তখন আমানত আলী মল্লিক পল্লী গ্রামে থেকেও তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করতেন। সাহিত্যিক কাজী আব্দুল ওদুদের চিন্তা-চেতনা তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করে।

১৯৮৪ সালে ঢাকায় আমানত আলী মল্লিককে ঢাকাস্থ "হাবাসপুর-বাহাদুরপুর প্রাক্তন ছাত্র সমিতির" উদ্যোগে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। এই সম্বর্ধনার জবাবে তিনি বলেন, পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজে শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং চরিত্র মাধুর্যে বলীয়ান হওয়ার জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৩ সালের ১১ই জুন হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ হাই স্কুলের 'প্লাটিনাম জুবিলী' উৎসবের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দীন সরকার তাঁকে শিক্ষকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এওয়ার্ড প্রদান করেন। আমানত আলী মল্লিক প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আদর্শ, নিষ্ঠাবান শিক্ষক হিসেবে তাঁর নাম কিংবদন্তীর মত। তাঁর নির্মল চরিত্র মাধুর্য সকলের জন্য অনুসরণীয়।[১৬]

খন্দকার নাজিরুদ্দীন আহমদঃ-রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "খাতক" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। পাংশা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই পত্রিকায় লিখেছেন। পত্রিকাটির দুর্দিনে তিনি সম্পূর্ণ নিজের অর্থে এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন।

বামনদাস গুহ রায়ঃ- প্রখ্যাত জলতরঙ্গ ও গিটার বাদক বামনদাস গুহ রায় ১৯১৪ সালে রাজবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গান ও নাটক রচনা করেছেন তিনি। তাঁর একটি বিখ্যাত নাটক "ভাঙ্গা হাল ছেড়া জাল"। ১৯৬৭ সালে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমৃত্যু তিনি ফরিদপুর আর্ট কাউন্সিলের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

রশিদ চৌধুরীঃ- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী রশিদ চৌধুরী রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার হাড়োয়া গ্রামে, ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান বাহাদুর ইউসুফ হোসেন চৌধুরী। রশিদ চৌধুরী ১৯৫৪ সালে চারুকলা ইন্সটিটিউট হতে চারুকলায় প্রথম বিভাগে ডিষ্টিংকশন সহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬০ থেকে

১৬। "প্লাটিনাম জুবিলী সংখ্যা" হাবাসপুর কে. বি. রাজ উচ্চ বিদ্যালয়-১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪ সালের মধ্যে তিনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে ভাস্কর্য ফ্রেসকো এবং ট্যাপেষ্টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি ঢাকা, করাচী, রাওয়ালপিন্ডি, কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বেতে বহু চিত্র পদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত হন। ঢাকা শেরাটন হোটেল উদ্বোধন কালে যে চিত্রকলা প্রদর্শনী হয় সেটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ প্রদর্শনী।

রশিদ চৌধুরী ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা আর্ট কলেজের প্রভাষক, ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।[১৭]

সনজীদা খাতুনঃ-সনজীদা খাতুন ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী এবং ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের কন্যা। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হলো-"সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয়"(১৯৬৯)।

রাজবাড়ী জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহঃ-

কোহিনুর ঃ- মাসিক ম্যাগাজিন। সম্পাদক এবং প্রকাশক ছিলেন রওশন আলী চৌধুরী। সাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরীর বড় ভাই ছিলেন তিনি। পত্রিকাটি ১৮৯৩ সালে রাজবাড়ী জেলার পাংশা থেকে প্রকাশিত হয়। অল্পকাল পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও এটি একটি উন্নত মানের সাহিত্য পত্রিকা ছিল।

সংগ্রাম ঃ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত হয়।
রাজবাড়ী প্রত্রিকা ঃ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত হয়।[১৮]
কাঙ্গাল ঃ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাংশা থেকে প্রকাশিত হয়।
বাণী ঃ-১৯৩৬ সালে রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত হয়। "বাণী সম্পাদনা এবং প্রকাশ করেন মন্মথ নাথ পাল।
খাতকঃ- সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাটির সম্পাদক এবং প্রকাশক ছিলেন খন্দকার নাজিরুদ্দিন। পাংশা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি বেশ দীর্ঘ সময় ধরে প্রকাশিত হয়।
চন্দনা ঃ-মাসিক পত্রিকা। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মাজেদ আলী খান। এটি সাবেক গোয়ালন্দ মহকুমার মৌলিক গণতন্ত্রীদের মুখপত্র ছিল। উপরে উল্লেখিত সমস্ত পত্রিকাই বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

রাজবাড়ী জেলা থেকে প্রকাশিত বর্তমান পত্রিকাসমূহ ঃ-

দৈনিক সহজ কথাঃ-রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা। সম্পাদক- আবু রেজা আশরাফুল মাসুদ।

১৭। আবু তালেব মিঞা বাংলার গুণীজন, (ঢাকা-১৯৯৪), পৃষ্ঠা-১০৬-১০৭।
১৮। Bangladesh District Gazetteers-Faridpur-1977, page-264.

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী কণ্ঠঃ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পাদক- খন্দকার জহুরুল ইসলাম।

অনুসন্ধানঃ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। কিছুটা অনিয়মিত। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটির সম্পাদক- আবু রেজা আশরাফুল মাসুদ।

রাজবাড়ী সংবাদঃ-সাপ্তাহিক পত্রিকায়। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটির সম্পাদক- আবু মুসা বিশ্বাস।

সাহসী সময় ঃ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। কিছুটা অনিয়মিত। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

দৈনিক গতকাল ঃ-রাজবাড়ী থেকে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা।

পাংশা বার্তাঃ-সাপ্তাহিক পত্রিকা। পাংশা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ, সদর, বালিয়াকান্দি এবং পাংশা থানা থেকে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস যেমন-শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে, "স্মরণিকা" প্রকাশ করা হয়।

লোক সাহিত্যঃ-রাজবাড়ী জেলার লোক সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ধুয়া, কবি, কীর্তন, বারাশি, মুর্শিদী, জারি, সাড়ী, বিচ্ছেদ, প্রভৃতি গান খুব জনপ্রিয় জেলার পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে। লোক কাহিনী নির্ভর এই গানগুলো বিভিন্ন সময় গীত হয় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। নিম্নে এসব গানের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলোঃ-

ধুয়া গান ঃ- মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা ধুয়া গানের আসর জমায়। এই গানে প্রতিযোগিতা হয় দুই জন বয়াতি বা প্রধান গায়কের মধ্যে। দুইজন বয়াতিকে দুই দল দোহার বা সাহায্যকারী গায়ক সাহায্য করে। এরা বয়াতিদের অনুসরণ করে গান গায়। জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাসে জেলার কৃষকেরা যখন পাট এবং ধান ক্ষেতে কাজ করে তখন তারাও ধুয়া গান গায়।

মিছা কেন কান্দো বইসা
শোন হে ওহে জীবের মন
তুমি কান্দো অকারণ।
(হায়) সাধনের মানুষ চিনে
আন্‌গ্যা তালা কিনে!
পরশ ধন সিন্দুকে পুইর‍্যা
চাবিতে করগ্যা মোড়প।
সিন্দুক যদি হয় লোহার
ধুয়ে কর দুধেরি মতন।
কর পরশের যতন
(হায়) পরশে লোহা লাগি

Dhaka University Institutional Repository

সোনা হয় কপাল গুণে
খাঁটি লোহা সোনা করে
তুমি হবা সেই সোনার মহাজন।
ছয় চোরায় যুক্তি কইরে
পরের মাল লুটে লইয়া যায়
ও মাল রাখা বড় দায়
(হায়) ইট দিয়া পোক্তা কর
তার মধ্যে সোনা ভর
থাকবেনা চোর ডাকাতের ভয়।

বারাশিঃ- দুঃখ ভারাক্রান্ত ভালবাসা কাতর স্ত্রী, যার স্বামী দূরে আছে তার অনুভূতি বর্ণনা করা হয় বারাশি গানে। জেলার কৃষকেরা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ধান এবং পাট ক্ষেতে কাজ করার সময় সমস্বরে বারাশি গান গায়।

শীত গেল বসন্ত আইল
সুখের ফাল্গুন মাস
ওরে সবে খেলে সুখের পাশা
আমার পতি পরবাস।
পায়ে ধরি মিনতি করি
পতি যাইসনা বিদেশে
ওরে বিদেশের ও রজত কাঞ্চন
কে তোমার খাবে।
যার পতি আছে ঘরে
ওরে তারতো বড় সুখ
ওরে শুয়ে পড়ে দেখে ভাল
পতির চন্দ্র মুখ।
ওরে পরের নৌকায় ব্যাপার কর
ওরে সাধু সওদাগর
ওরে নিজের নৌকায় ব্যাপার করে
সে বড় ব্যাপারী।
ওরে বিদেশেতে যাবা বন্ধু
কইয়া যাবা না
থুইয়া যাবা নতুন যইবন
আইসা পাবা না।
বিদেশেতে যাবা সাধু
খাইয়া যাবা কি
ওরে কাঁন্দের গামছা ফেলে দেও
দুইটা ডালিম বেন্দে দেই।
কালো বরণ কোকিল রে
তার মুখে মধুর বোল
ও তুই বনের কোকিল না হইলে
তোরে ধরে দিতাম কোল।

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছেদ গানঃ-বিচ্ছেদ গান মূলতঃ বিচ্ছেদ বিরহে গাওয়া হয়ে থাকে। হারমোনিয়াম এবং দোতরা সহযোগে এই গান গাওয়া হয়।

মনের আগুনে দেহ
পুড়ে হল ছাইরে
বন্ধু বুঝি দ্যাশে নাইরে।
বন্ধু আমার গলের মালা
আমি চোখের মনি
বন্ধুরে না দেখলি পরে
হই পাগলিনী
বন্ধু বুঝি দ্যাশে নাইরে।
আজকে বন্ধু কইবে কথা
নিবে যাবে মনের ব্যথা
আমার ব্যথা রবেনা।
ব্যথার ব্যথিত আর কে আছে
বইলা দিবা বন্ধুর ঠিকানা
বন্ধু থাকে ঐ বিদ্যাশে
আমি কান্দি পাগল ব্যাশে
বন্ধুর আগুনে দেহ
পুড়ে হল ছাইরে
বন্ধু বুঝি দ্যাশে নাইরে

মুর্শিদী ঃ-মুর্শিদী এক প্রকার আধ্যাত্মিক গান। সারিন্দার বাদ্য সহযোগে এই গান গাওয়া হয়।

ও আমার দয়াল চান
আমারে চাকুরে রাখিও
তোমার বাজারে।
আমি টাকা চাইনা, পয়সা চাইনা
খাটলি আমার না শোধ অলি
ও আমার দয়াল চান
আমারে চাকুরে----------
ভোক লাগিলে দিও খাতি
শুধু তুমি প্যাট ভরিয়া
ও আমার দয়াল চান
আমারে চাকুরে ----------
ঘোম আসিলে শুতি দিও
জংগোলেতে আমারে
ও আমার দয়াল চান
আমারে চাকুরে--------
তোমার কথা মনে কইরারে
দয়াল চান ফিরি দ্যাশে দ্যাশে
তুমি আমার, আমি তোমার রে
দয়াল চান জানে সর্বলোকে
তুমি আমারে চাকুরে----------

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েলি গান ঃ-গ্রামীণ মহিলারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাধারণত মেয়েলি গান গেয়ে থাকে। রাজবাড়ী জেলার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে মেয়েলি গান গীত হয়। মেয়েলি গান নিম্নরূপ ঃ-

আগে যদি জানতাম শীতল
তোরে নিবি পরে
আহার নানদোন আহায় থুইয়া
কোলে করতাম তোরে
আমি ক্যানবা গেলাম ঘাটে।
শীতলের মা কান্দে
সানে পাছাড় খাইয়া
আমি ক্যানবা গেলাম ঘাটে
আগে যদি জানতাম শীতল
ডেকচির মুহি সরবত দিয়া
ছাপাইয়া রাখতাম তোরে
আমি ক্যানবা ----------
আগে যদি জানতাম শীতল
তোরে নিবি পরে
আহার নানদোন আহায় থুইয়া
দুকখির মধ্যে বিষ মিশাইয়া
মাইর‍্যা ফেলতাম তোরে
আমি ক্যানবা----------

মেয়েলি ছড়া ঃ-মেয়েলি ছড়া গ্রামের যুবতি মেয়েরা গেয়ে থাকে। মেয়েলি ছড়ার উদাহরণঃ-

অল্‌দি কুটা কুটা
জামাই বড় মুটা।
আর অল্‌দি কুট্‌বনা
ম্যায়া বিয়্যা দেবনা।
ম্যায়া কাঁচা দুধির সর
ক্যামনে করবি পরের ঘর।
পর ব্যাটারা মারবি
কান্‌ছি খাড়া কাঁদবি।
কান্‌ছি আছে ছিট্‌কের ডাল
তাই দে উঠ্যাবি পিঠির খাল।
বাপের নাগাল পাবি
দুঃখির কথা কবি।
এছাড়া গ্রামের মানুষের মধ্যে রূপকথা, কিচ্ছা, প্রবাদ, প্রবচন, হেয়ালী প্রভৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয়।[১৯]

১৯। Bangladesh District Gazetteers-Faridpur-1977, page-248.

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী জেলায় অধিবাসীদের ভাষায় আঞ্চলিক উচচারণ প্রণালীঃ- বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। মাতৃভাষা বাংলা হলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার আঞ্চলিক রূপ প্রচলিত রয়েছে। রাজবাড়ী জেলার অধিবাসীদের ভাষায় ব্যবহৃত আঞ্চলিক রূপঃ- নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ।

(১)"গোরে" শব্দটি বহু বচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ-"আমাগোরে"। উন্নত ভাষায় শব্দটি উচচারিত হয়"আমাদের" হিসেবে। একইভাবে "তোমাগোরে"→"তোমাদের", "চাকরগোরে"→"চাকরদের"

(২) "হ"-এর উচচারণ "অ" এর মত হয় যেমনঃ- "হাট" শব্দটি উচচারিত হয় "আট" হিসেবে। একই ভাবে "হাতি"→"আতি" "হাত"→"আত", "হারাইছে"→ "আরাইছে" ইত্যাদি।

(৩) "ক" এবং "খ" অক্ষর শব্দের মাঝখানে থাকলে শব্দের উচচারণ আঞ্চলিকতার রূপ পায়। যেমনঃ- "বকরী" শব্দটি উচচারিত হয় "বহরী" হিসেবে (ছাগল)। একই ভাবে "শুকুর"→"শুহুর" (জনৈক নাম), "মাখন"→ "মাহন" ইত্যাদি।

(৪) শব্দের মাঝখানে "ক" অক্ষর থাকলে সেই শব্দে "ক"- এর উচচারণ প্রায়শই "গ"-এর মত হয়। যেমনঃ-"সকল" শব্দটি উচচারিত হয় "হগল" হিসেবে। এখানে "স" অক্ষরটিও "হ" এর মত উচচারিত হয়।

(৫) শব্দের শেষের "ক" অক্ষরটি "গ"-এর মত উচচারিত হয়। যেমনঃ-"বক"→"বগ"।

(৬) কখনও কখনও "র" অক্ষরটি "ন"- এর মত উচচারিত হয়, যেমনঃ- "রাঙ্গা"→"নাঙ্গা", "রহিম"→"নহিম", "রেকাবি"→"নেকাবি" (প্লেট), "রাস্তা"→ "নাস্তা" (পথ) প্রভৃতি।

(৭) "ল" অক্ষরটি মাঝে মাঝে "ন"- এর মত উচচারিত হয়। যেমনঃ- "লবন"→"নবন", "লাল"→"নাল" (রং) প্রভৃতি।

(৮) শব্দের প্রথমে "স" অক্ষরটি বসলে শব্দের উচচারন পরিবর্তিত হয়। "স"-এর স্থানে "হ" অক্ষর ধরে শব্দটি উচচারিত হয়। যেমনঃ- "সাক্ষী"→"হাক্ষী", "সবুজ"→"হবুজ" "শুনা"→"হুনা" (কানে শুনা) প্রভৃতি।

রাজবাড়ী জেলার সদর থানা ও গোয়ালন্দ থানাসহ সর্বত্র সাধারণভাবে উপরিউক্ত আঞ্চলিক শব্দাবলী উচচারিত হয়।

জেলার দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ বালিয়াকান্দি থানার অধিবাসীদের ভাষার আঞ্চলিক রূপ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

শব্দের শেষে "া" (আকার) এবং "ে" (একার) থাকলে শব্দটির উচচারণ পরিবর্তিত হয়। "া" (আকার) এবং "ে" (একার)-এর উচচারণ "ো"(ওকার)- এর মত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। যেমনঃ-"কুত্তা"→"কুত্তো" (কুকুর), "কুমড়া"→"কুমড়ো", "পেপে"→"পেপো", "তেলে"→"তেলো" প্রভৃতি।

এই একই শব্দ রাজবাড়ী জেলার সদর থানা এবং গোয়ালন্দ থানায় কখনও কখনও নিম্নলিখিতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ- "কুত্তা"→"কুত্ত্যা", "কুমড়া"→"কুমড়্যা", "পেপে"→"পেপ্যা", "তেলে"→"তেল্যা" প্রভৃতি।

জেলার পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ পাংশা থানার অধিবাসীদের উচ্চারণ নিম্নরূপঃ-

"করেছে"→"করেচে"-এখানে শব্দের শেষে "ছ" অক্ষর -এর উচ্চারণ "চ" হয়েছে। এছাড়া একই শব্দের উচ্চারণে বিশেষ আঞ্চলিক টান সহযোগে শব্দের প্রথমে "ক" অক্ষর -এর উচ্চারণ "কো" এর মত না হয়ে "ক"-এর মত হয়েছে। একইভাবে "সেরেছে" →"সারেচে" প্রভৃতি।

<u>নিম্নে রাজবাড়ী জেলার অধিবাসীদের কিছু সংলাপ প্রদান করা হলোঃ-</u> একজন মানুষির দুই ছাওয়াল ছিল। তার মুদি ছোট ছাওয়াল তার বাপের কাছে ক'লঃ বা'জান বিষয়-সম্পত্তির যে অংশ আমি পাব, তা' আমার ভাগ করে দে'ও। তার বাপ তহন তার অংশ ভাগ করে' দিল। সে তহন সব বেচে' এ'ক দূর দ্যাশে চলে' গে'ল। সেহানে বাউটেমি করে' কিছু দিনির মুদি সব খোয়্যা ফেলল। তহন হে দ্যাশে ভারি আহাল অ'ল। আর হে বড় কষ্টে প'ল।[২০]

<u>সংস্কৃতিঃ</u>- রাজবাড়ী জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। জেলার বেশ কিছু কৃতি সন্তান সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সুনাম অর্জন করেছেন। প্রয়াত বামন দাস গুহ রায় প্রখ্যাত জলতরঙ্গ বাদক ছিলেন। সন্জীদা খাতুন রবীন্দ্র সঙ্গীতের খ্যাতনামা শিল্পী। রশিদ চৌধুরী প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। সরকারীভাবে জেলার শিল্পকলা একাডেমীসমূহে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, পল্লীগীতি, আধুনিক গান, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হয়। জেলায় নাট্যচর্চা হয় ব্যাপকভাবে। জেলার "চারণ থিয়েটার", "রাজবাড়ী থিয়েটার" নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করে। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জেলার প্রত্যেকটি থানায় নাট্য সংগঠন রয়েছে। প্রায় সারা বছর ধরে তারা নাট্য চর্চা করে। এছাড়া জেলায় রয়েছে অসংখ্য ক্লাব। এ ক্লাবগুলো নাটক মঞ্চায়ন করে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোতে জেলায় বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলার মহাবিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন করা হয়। এ সময় গান, নাটক, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুকাভিনয় প্রভৃতির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার গ্রামাঞ্চলে জারি, যাত্রা, শারী, মুর্শিদী, কবি প্রভৃতি গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। লোকজ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এসব গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রায়ই। বিশেষ করে শীত মৌসুমে জেলার গ্রামে গ্রামে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় প্রতি রাতেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলায় মাঝে মাঝে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এতে শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শিত হয়।

২০। Bangladesh District Gazetteers-Faridpur-1977, page-239-240.

Dhaka University Institutional Repository

খেলাধুলাঃ- খেলাধুলার ক্ষেত্রে রাজবাড়ী জেলার সুনাম এবং ঐতিহ্য রয়েছে। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, হকি প্রধানত শহর অঞ্চলে এবং দাড়িয়াবান্দা, হা-ডু-ডু, বউচি প্রভৃতি খেলা গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়। এ জেলা বর্তমানে সাঁতারে জাতীয়ভাবে সুনাম অর্জন করেছে। জেলার বেশ কয়েকজন মহিলা সাতারু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কয়েকটি ইভেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। জেলার বয়াটের আব্দুস সাত্তার, রাজবাড়ী শহরের অমিয় গুহ, নুর হোসেন, যোগেশ দত্ত কৃতি ফুটবল খেলোয়ার ছিলেন। তাঁরা কলকাতার লীগে ফুটবল খেলতেন। পঞ্চাশের দশকে জেলার কৃতি ফুটবল খেলোয়ার ছিলেন ডি. এম. এম. ইসলাম, কে. এম. রহমান, অমল চক্রবর্তী, নীলু ভট্টাচার্য, শৈলেশ গুহ, কাদের নেওয়াজ, নিরোদ ভাজন প্রমুখ। রাজবাড়ী জেলার গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যবাহী ফুটবল টুর্নামেন্টের মধ্যে "রাম কানাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট" দীর্ঘদিন সুনামের সাথে জেলার খানখানাপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জেলা সদরে "ফাজী হেদায়েত হোসেন স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট" দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ টুর্নামেন্ট বন্ধ রয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে জেলা ও থানা পর্যায়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

লাঠিখেলাঃ- রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে লাঠিখেলা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। জেলার গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় এ খেলায় দুই দল খেলোয়ার অংশগ্রহণ করে। একক এবং দলীয় দুইভাবে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ খেলার বৈশিষ্ট্য হলো, খেলা চলাকালীন সময় ঢোলবাদ্য পরিবেশিত হয়। মূলতঃ এ খেলায় একজন প্রতিযোগী অপর জনকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। অপরজন সেই আঘাত লাঠি দিয়ে প্রতিহত করে পাল্টা আঘাত করে। খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক খেলোয়াড়কে একটি করে লাঠি দেয়া হয়। এছাড়া লাঠির সাহায্যে বিভিন্ন শারীরিক কসরত প্রদর্শন করা হয়।

বিনোদনঃ- জেলার শহর অঞ্চলের মানুষের বিনোদনের প্রধান উৎস সিনেমা, নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান প্রভৃতি। বাড়ীতে টেলিভিশন বিনোদনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামাঞ্চলে জারি, শারী, কবি, যাত্রা প্রভৃতি গানের আসর বসে। গ্রামের মানুষ এসব অনুষ্ঠান উপভোগ করে।

জেলার বিভিন্ন স্থানের স্বনামখ্যাত খাদ্যদ্রব্যঃ- পাংশার চমচম ও চানাচুর, গোয়ালন্দের ইলিশ ও তরমুজ, খানখানাপুরের সন্দেশ, রামদিয়ার মটকা, রাজবাড়ীর চমচম, খলিলপুরের পুঁটিমাছ, বেলগাছির গুর। এসব খাদ্যদ্রব্য সারাদেশে পরিচিত এবং সমাদৃত।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী জেলার প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন ঃ-

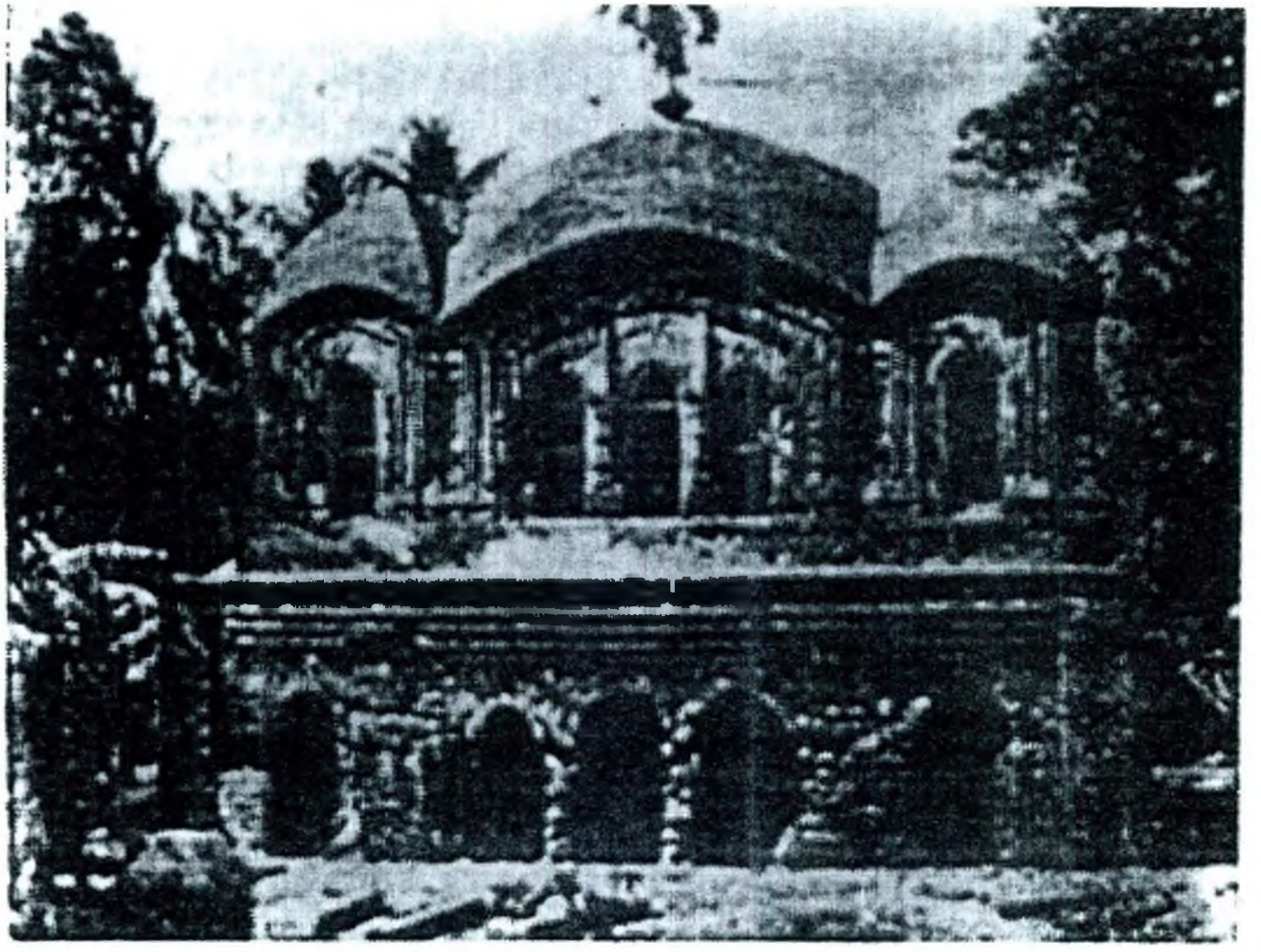

জোড় বাংলা মন্দির

নলিয়ার জোড় বাংলা মন্দির ঃ- রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার অধীনে নলিয়া নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। নলিয়া রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত এই গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি ছিল একটি জোড় বাংলা মন্দির এবং দু'টি দোচালা ঘরের চালকে সংযুক্ত করে মন্দিরের পাকা ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। মন্দির গাত্রে অতি মনোরম পোড়া মাটির চিত্র ফলক ছিল। মোঘল আমলের শেষ দিকে নির্মিত মন্দিরটি সংস্কারের অভাবে বর্তমানে অতি জীর্ণ অবস্থায় আছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাঝিবাড়ী মঠঃ- রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ থানায় রয়েছে মাঝিবাড়ী মঠ নামে পরিচিত একটি মঠ। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন এই মঠ। উঁচু চূড়াসহ অনেকখানি জায়গা জুড়ে মঠের অবস্থান। কথিত আছে, এই অঞ্চলের মাঝিরা এটি নির্মাণ করে। এই এলাকায় অনেক মাঝি পরিবারের বাস ছিল। তারা সম্মিলিতভাবে এই মঠটি নির্মাণ করে। এই মঠ প্রাঙ্গনে বর্তমানে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। পূজার সময় অনেক পূণ্যার্থীর আগমনে মঠ প্রাঙ্গন জমজমাট হয়ে ওঠে। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে মঠটি জড়াজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

মেলাঃ-মেলা- রাজবাড়ী জেলার সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপর্ণ স্থান দখল করে আছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়। সাধারণত বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে লোকজ সংস্কৃতি তথা মূল সাংস্কৃতিক ধারায় মেলা গুরুত্বপূর্ণ। রাজবাড়ী জেলায় বৈশাখী মেলা, নববর্ষের মেলা, চৈত্র সংক্রান্তী মেলা, বারুনী মেলা, বিজয়া দশমী মেলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মেলা।

জেলার সদর থানার পাঁচুরিয়ায় চৈত্র-সংক্রান্তী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় গ্রামীণ লোক ঐতিহ্য নির্ভর অনেক পণ্যের আমদানি হয়। অনেক মানুষ এখানে সমবেত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় করে। জেলা সদরে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়া দশমী উপলক্ষে দুর্গাপূজার মন্দির প্রাঙ্গনে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সদর থানার খানখানাপুরে অন্নপূর্ণা মন্দিরে ও পাংশা, বালিয়াকান্দি এবং গোয়ালন্দে বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এসব মেলায় নাগরদোলা, বিভিন্ন ধরনের গান যেমন- যাত্রাগান, বিচার গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।[২১]

২১। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page-251

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনৈতিক অবস্থা

রাজবাড়ী জেলার অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। জেলার অধিকাংশ জনগণের আয় এবং কর্মসংস্থান কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিকাজ প্রধানত সনাতন পদ্ধতির ফলে উৎপাদন অনেক কম। ঔপনিবেশিক আমল এবং ১৯৪৭ পরবর্তী পাকিস্তান আমলে অবহেলা ও অনাগ্রহের ফলে এই জেলায় ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি। ফলে অর্থনীতিতে এর কোন ব্যাপক প্রভাব পড়েনি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের তেমন উন্নতি হয়নি। স্বাধীনতার পরেও জেলায় ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কিছু বেড়েছে। জেলা সদরে বিসিক শিল্প নগরী স্থাপিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও জনসাধারণের দারিদ্র্য ঘোচেনি বরং ভূমিহীন দরিদ্র জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলায় নগরায়ন হচ্ছে ধীরগতিতে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজবাড়ী জেলার মোট নগরে বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে ৪৪,৬৫৯ জন পুরুষ এবং ৪১,১৩২ জন মহিলা নগরে বসবাস করে। নগরে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যা ৮৫,৭৯১ জন। এই জেলায় নগরে বসবাসকারী জনসংখ্যা, বাংলাদেশে নগরে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার ০.৪১ শতাংশ।

উইলিয়াম উইলসন হান্টার ১৮৭৫ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় জনগণের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করেনঃ- জনগণের বৃহত্তর অংশ কৃষকশ্রেণী দৃশ্যত পূর্বতন বছরগুলোর চেয়ে ভাল অবস্থায় ছিল এবং পর্যায়ক্রমে সচ্ছলতা অর্জন করছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাঁরা নির্ধারিত বেতনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাদের জীবনযাত্রা কষ্টকর হয়ে পড়ছিল। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি তাদের দারিদ্র্য বাড়িয়ে তুলছিল ফলে তাঁরা কোন রকমে জীবনধারণ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ধুতি, চাদর এবং উৎসবে টিলা কোট বা পিরাণ ছিল সচ্ছল লোকের সাধারণ পোষাক। সাধারণভাবে মানুষ ধুতি এবং চাদর ব্যবহার করতো। সচ্ছল পরিবারের গৃহকর্তা তাঁর বাড়ীতে সাধারণত পাঁচটি ঘর নির্মাণ করতেন। প্রত্যেকটি ঘর একেকটি কাজে ব্যবহৃত হতো। একটি ঘর গৃহকর্তার ও তাঁর নিজের পরিবারের বসবাসের জন্য। অন্য একটি ঘর, বাড়ীর অন্য সদস্যদের বসবাসের জন্য, একটি ঘর রান্নার জন্য, একটি গবাদি পশুর জন্য এবং একটি ঘর ছিল ধান ভানা ও পারিবারিক অন্যান্য কাজের জন্য।

বড় বারান্দাসহ যে ঘরে সচ্ছল গৃহকর্তা বাস করতেন সেটি মজবুতভাবে নির্মিত এবং ঘরের বারান্দায় সাধারণত অভ্যাগতদের বসতে দেয়া হতো। এই জাতীয় ঘর নির্মাণ করতে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা খরচ হয়। সাধারণ গৃহকর্তার বাড়ীতেও একই সংখ্যক ঘর থাকে কিন্তু এই ঘর গুলো মজবুতভাবে নির্মাণ করা হয় না। সচ্ছল এবং সাধারণ উভয় শ্রেণী র মানুষের নির্মাণ সামগ্রী একই শুধু পার্থক্য গুণগত মানে। অল্প কিছু পাকা বাড়ীঘর ছাড়া সবই বাঁশ, খড়, পাট, কাঠ, মাদুর প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত। সচ্ছল গৃহস্থের আসবাবপত্র ছিল সিন্দুক, যেখানে তাঁরা মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ছিল তক্তপোষ, এক বা দু'টি কাঠের বেঞ্চ। সাধারণ মানুষের আসবাবপত্র ছিল না। শুধুমাত্র কিছু মাদুর ছিল, যাতে তাঁরা বসতেন এবং ঘুমাতেন।[১]

বৃহত্তর ফরিদপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা জে. সি. জ্যাক (১৯০৬-১৯১০) বিগত শতাব্দীর শেষার্ধের দিকে পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেনঃ-একত্রে সব শ্রেণী র মানুষের গড় মাথাপিছু আয় বার্ষিক ৫২ টাকা। গড় ট্যাক্স ২.৭৫ টাকা। গড় ঋণ এগার টাকা। পরিবারের ব্যয় বিশেষভাবে পরীক্ষা করার পর পারিবারিক বাজেট তৈরী করা হতো। জে. সি. জ্যাক পর্যবেক্ষণে দেখেন, মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় পঞ্চাশ টাকা হলে একটি পরিবার সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে। একটি খুব গরীব পরিবারের বার্ষিক মাথাপিছু ব্যয় ছিল বিশ টাকা। পাঁচ জন সদস্য নিয়ে সাধারণত পরিবার গঠিত হলে এবং এর মধ্যে দুইজন বয়স্ক পুরুষ, একজন বয়স্ক মহিলা ও দুইজন ছেলে-মেয়ে থাকলে, এরকম একটি পরিবারের সচ্ছলভাবে জীবনধারণের জন্য বার্ষিক মোট ব্যয় হতো ২৫০ টাকা। ঐ একই পরিবারের কোন রকমে টিকে থাকতে প্রয়োজন হতো ১০০ টাকা।

একটি পরিবারের মোট ব্যয় হয় (১) খাদ্য ক্রয়-এর মধ্যে চাল, লবন, তেল, মাছ, শাক-সবজি, দুধ এবং ঘি অন্তর্ভুক্ত (২) অন্যান্য প্রয়োজনীয় যেমনঃ কাপড়, আসবাবপত্র, ঘর, কেরোসিন তেল, পান-সুপারী এবং ধুমপানের জন্য তামাক প্রভৃতি ক্রয় (৩) বিভিন্ন ভাড়া, স্থানীয়কর , চিকিৎসা, নৌকা ও গবাদি পশুক্রয়, ঘরবাড়ী সংস্কার, পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আপ্যায়ন খাতে।[২]

রাজবাড়ী জেলার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাঃ- এই জেলার জনগণ প্রধানত কৃষিজীবী। মোট জনসংখ্যার আশি ভাগের বেশী কৃষক। এই কৃষকেরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং তাদের জীবন যাত্রা দারিদ্র্য সীমার নীচে। জমির উৎপাদনের উপর কৃষকের আয় নির্ভর করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে রাজবাড়ী জেলার কৃষকেরা জমির উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হয় বিভিন্ন উৎপাদন মৌসুমে। ফলে প্রত্যেক বছর তাদের আয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। জেলার একজন কৃষকের সম্পদের মধ্যে আছে, কৃষি সরঞ্জাম-লাঙ্গল, গরু এবং বাড়ীতে একটি বা দু'টি ঘর। দরিদ্র কৃষকদের নিজের জমি নেই। অন্যের জমি বর্গা চাষ করে। কৃষকদের অনেকের নিজস্ব লাঙ্গল এবং হালের বলদ নেই। রাজবাড়ী জেলায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে অনেকের নিজের বাড়ী নেই। সরকারী জমি বা অন্যের বাড়ীতে বসবাস করে। এই জেলায় ধনী কৃষকের সংখ্যা খুবই অল্প। এরা বিত্তবান কৃষক।

রাজবাড়ী জেলার অকৃষক জনগণের মধ্যে আছে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষি বহির্ভূত শ্রমিক, অন্যান্য পেশাজীবী সম্প্রদায়। জেলার কিছু সংখ্যক মানুষ বিদেশে কর্মরত। এই জেলায় শিল্প কারখানা গড়ে না ওঠায় শিল্প ক্ষেত্রে পেশাজীবী লোকের সংখ্যা খুবই কম। এর ফলে অর্থনীতির উন্নয়ন হয়নি।

১। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page:-113-114.
২। পূর্বোক্ত, Page:-114

Dhaka University Institutional Repository

জেলার কিছু সংখ্যক লোক, যাঁরা বিত্তবান এবং শিল্প কারখানা স্থাপন করতে সক্ষম-কিন্তু করেনি। এর কারণ হিসেবে জানা যায় শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে, মুনাফা সহ পুঁজি ফেরৎ আসতে যে সময় অপেক্ষা করতে হয় এই সময় পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করতে রাজী নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা দ্রুত মুনাফা চায়। ফলে এদের অধিকাংশের ব্যবসায় দিকে ঝোঁক বেশী। এছাড়া রাজবাড়ী জেলার সঙ্গে রাজধানীর সহজ যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকাও এই জেলায় শিল্প কারখানা স্থাপন না করার অন্যতম কারণ। বর্তমানে এই জেলার দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের আরিচা ঘাটের মধ্যে ফেরী চালু আছে। এই ব্যবস্থায় রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ (মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে) ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। পদ্মা নদীতে সেতু নির্মিত হলে এই জেলায় শিল্প কারখানা স্থাপিত হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন। জেলার অধিবাসীদের একটা অংশ মাছ চাষ করে। মাছ চাষ লাভজনক পেশা।

<u>জেলার অধিবাসীদের বাসস্থান</u>ঃ- কৃষকদের বাসস্থান সাধারণত বাঁশ, খড় ও বন দ্বারা নির্মিত। জেলার অধিবাসীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আর্থিক অবস্থা সচ্ছল যাদের, তারা তাদের ঘরের ছাদ সি. আই. শিট, এবং বাশ বা টিন দিয়ে ঘরের বেড়া তৈরী করে। ইট নির্মিত ঘর বা দালান খুব কম। জেলার মোট অধিবাসীদের অল্পসংখ্যক তাদের ঘর ইট-সিমেন্ট সহযোগে পাকা করেছে। গ্রামের নির্দিষ্ট অংশের কিছু বাড়ী অধিক ঘন। কিছুটা দূরে অবস্থানকারী বাড়ীঘরও রয়েছে। যদিও সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গায়ও বাড়ীঘর দেখা যায়। এসব বাড়ীঘরের কোন সাজ সজ্জা নেই বললেই চলে। জেলার-শহরে বসবাসকারী জনগণের বাড়ীঘর তুলনামূলকভাবে মজবুত ভাবে তৈরী।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজবাড়ী জেলায় শহর ও গ্রামের বাড়ীর সংখ্যা নিম্নরূপঃ-

জেলার মোট বাড়ীর সংখ্যা	-১,৪৭,২৯৯টি
গ্রামের বাড়ীর সংখ্যা	-১,৩২,০৮১টি
শহরের বাড়ীর সংখ্যা	- ১৫,২১৮টি

রাজবাড়ী জেলার গ্রাম ও শহরের বাড়ীর সংখ্যা, জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের মোট গ্রাম ও শহরের বাড়ীর সংখ্যার অনুপাতে যথাক্রমে ০.৮৫ শতাংশ এবং ০.৪০ শতাংশ।

বাড়ীর ধরন এবং শতকরা হারঃ-

<u>মোট বাড়ী</u>	<u>শতাংশ</u>
১,৪৭,২৯৯	১০০%
<u>সাধারণ</u>	
১,৪৬,২২৩	৯৯.২৭%
<u>প্রাতিষ্ঠানিক</u>	
৪০৬	.২৮%
<u>অন্যান্য</u>	
৬৭০	.৪৫%

সারণী -১৪

Dhaka University Institutional Repository

জেলায় জনগণের বাড়ীর প্রধান ঘর অথবা ওয়ালের নির্মাণ সামগ্রী, বাড়ীর সংখ্যা এবং শতকরা হারঃ-

প্রধান ঘর অথবা ওয়ালের নির্মাণ সামগ্রী	বাড়ীর সংখ্যা	শতকরা হার
	১,৪৭,২৯৯	১০০%
খড়-বাঁশ/পাটকাঠি	১,২১,৮৮৮	৮২.৭৫%
কাদা/ পোড়া ছাড়া ইট	২,৫৪৫	১.৭৩%
লৌহশীট	১৫,৫৯৩	১০.৫৯%
কাঠ	২,৫০৭	১.৭০%
সিমেন্ট-ইট	৪,৭৬৬	৩.২৪%

সারণী-১৫

প্রধান ঘর অথবা ছাদের নির্মাণ সামগ্রী	বাড়ীর সংখ্যা	শতকরা হার
	১,৪৭,২৯৯	১০০%
খড়-বাঁশ/পাটকাঠি/পলিথিন	৬৬,৫০৮	৪৫.১৫%
লৌহ / লৌহশীট	৭৯,০৫২	৫৩.৬৭%
সিমেন্ট	১,৭৩৯	১.১৮%

সারণী-১৬

রাজবাড়ী জেলায় অধিবাসীদের বাড়ীর হিসেবে আয়ের প্রধান উৎস, বাড়ীর সংখ্যা এবং শতকরা হারঃ-

জেলার অধিবাসীদের বাড়ীর হিসেবে আয়ের প্রধান উৎস	বাড়ীর সংখ্যা	শতকরা হার
	১,৪৭,২৯৯	১০০%
কৃষি	৬২,৬৬৭	৪২.৫৪%
পশুপালন	৭৫৪	.৫১%
বন	৩৫	.০২%
মৎস্য চাষ	১,৮৩৯	১.২৫%
নৌনাহি চাষ	১৯৬	.১৩%
কৃষি শ্রমিক	৩৪,৬২৬	২৩.৫১%
অকৃষি শ্রমিক	৪,৩৩৬	২.৯৪%
তাঁত	১,২০৯	.৮২%
শিল্প/ওয়ার্কশপ	১,১৫০	.৭৮%
ব্যবসায়	১৭,১৪৪	১১.৬৪%
হস্তশিল্প	৪২২	.২৯%
পরিবহন-অযান্ত্রিক	২,৬৯৬	১.৮৩%
পরিবহন-যান্ত্রিক	৪৫৯	.৩১%
নির্মাণ কাজ	১,৫১৮	১.০৩%
ধর্মীয় কাজ	২৪৯	.১৭%
চাকুরি	৯১৯০	৬.২৪%
ভাড়া	১৭৭	.১২%
স্বকর্ম সংস্থানকারী	১,০৯৬	.৭৪%
অন্যান্য	৭,৫৩৬	৫.১২%

সারণী-১৭

৩। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস- রাজবাড়ী জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-XIV

Dhaka University Institutional Repository

জেলার বিদ্যুৎ সংযোগযুক্ত ও সংযোগবিহীন বাড়ীর সংখ্যা এবং শতকরা হারঃ-

বিদ্যুৎ সংযোগ	বাড়ীর সংখ্যা	শতকরা হার
	১,৪৭,২৯৯	১০০%
বিদ্যুৎ সংযোগযুক্ত	৬,৭৪০	৪.৫৮%
বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন	১,৪০,৫৫৯	৯৫.৪২%

সারণী-১৮

জেলার দ্বি-একক বিশিষ্ট বাড়ীর ধরনঃ-

	১৯৯১ সাল	১৯৮১ সাল	শতাংশে পরিবর্তন ১৯৯১ / ১৯৮১
জেলা	৫.৬৬	৬.০৭	(-) ৬.৭৫
গ্রাম	৫.৬৭	৬.০৮	(-) ৬.৭৪
শহর	৫.৬১	৫.৯৮	(-) ৬.১৯

সারণী-১৯

জেলার পাঁচ বছর বা তদুর্ধ বয়সের মানুষের প্রধান আর্থিক কাজের ক্ষেত্র এবং শতকরা হারঃ-

পাঁচ বছর বা তদুর্ধ বয়সের মানুষের প্রধান আর্থিক কাজের ক্ষেত্র	সংখ্যা	শতকরা হার
	৭,০৪,৪৯৮	১০০%
কাজ করে না	১,৮৯,১৭৯	২৬.৮৫%
কর্ম অনুসন্ধানকারী	৪,২৮৮	.৬১%
সাংসারিক কাজ	২,১৪,৬৭৯	৩০.৪৭%
কৃষি	১,৫৬,৫৩৬	২২.২২%
শিল্প	৪,২০৯	.৬০%
পানি/গ্যাস/ইলেকট্রিসিটি	২২৭	.০৩%
নির্মাণ	২,৮৩০	.৪০%
পরিবহন এবং যোগাযোগ	৪,৫৮৬	.৬৫%
ব্যবসায়	২৯,৭৮০	৪.২৩%
সেবা	৪,১১২	.৫৮%
অন্যান্য	৯৪,০৭২	১৩.৩৫%

সারণী-২০

৪। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস রাজবাড়ী জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-Xii
৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-XV

Dhaka University Institutional Repository

আসবাবপত্রঃ- জেলার মধ্যম পর্যায়ের সচ্ছল কৃষকের আসবাবপত্র বলতে ঘুমানোর জন্য একটি বা দু'টি চৌকি, একটি বড় সিন্দুক-যেখানে সে তার মূল্যবান সামগ্রী রাখে, দু'টি বা তিনটি কাঠের টুল এবং বসার জন্য একটি বা দু'টি কাঠের বেঞ্চ। এদের মধ্যে যাঁরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত তাঁরা তাদের বৈঠকখানায় অভ্যাগতদের বসার জন্য কিছু চেয়ার এবং টেবিল রাখেন। সাধারণ কৃষকদের বসার এবং ঘুমানোর জন্য কিছু মাদুর ছাড়া অন্য কোন আসবাবপত্র নেই।

জেলার মোট অধিবাসীদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক মানুষ সচ্ছল তাঁরা তাদের ড্রয়িংরুমে আধুনিক আসবাবপত্র ব্যবহার করেন। তাঁরা শোবার ঘরে খাট ব্যবহার করেন। ড্রয়িং রুমে সোফা, ষ্টীল-আলমারী, চেয়ার, চায়ের টেবিল ও ডাইনিং রুমে ডাইনিং টেবিল ব্যবহার করেন। রাজবাড়ী জেলার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা বিদেশে কর্মরত তাঁরা সাধারণত অধিক সচ্ছল এবং মূল্যবান আসবাবপত্র ব্যবহার করেন।

*এই গবেষকের গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় ব্যক্তিগত ভাবে বেশ কিছু পরিবারের আসবাবপত্র দেখার সুযোগ হয়েছে।

খাদ্যঃ-জেলার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত। সাধারণত ডাল, শাক-সবজি এবং মাছ সহযোগে আহার করা হয়। অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতার উপর গোস্ত খাওয়া নির্ভর করে। এছাড়া সহযোগী খাদ্য হিসেবে গম, মিষ্টি আলু, স্থানীয় ফল যেমনঃ কাঁঠাল, নারিকেল, আম প্রভৃতি খাওয়া হয়। বিভিন্ন ধরণের উৎসব ও অনুষ্ঠানে জনগণের খাদ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় পোলাও, কোরমা, কালিয়া, ফিরনী, সেমাই, জর্দা এবং গোস্ত। এছাড়া দুধ দিয়ে তৈরী অন্যান্য রান্না। গ্রামের জনগণের মধ্যে খিচুড়ি একটি সাধারণ খাবার। কৃষকের প্রধান খাদ্য ডালভাত। কখনও শাক-শবজির ভাজি সঙ্গে খাওয়া হয়। কৃষকেরা গ্রীষ্মকালে তাদের দিন শুরু করেন পান্তভাত খাওয়ার মধ্য দিয়ে। কারণ তাঁরা অধিকাংশই দরিদ্র। পান্তভাত সহজলভ্য। এছাড়া গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড রোদে তাদের ক্ষেতে কাজ করতে হয়, এক্ষেত্রে জল সহযোগে ভাত বা পান্তভাত খেলে কিছুটা প্রশান্তি মেলে।

পোষাকঃ- জেলার কৃষকেরা যখন কাজ করেন তখন তাদের পরণে লুঙ্গি এবং গামছা থাকে। গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক সচ্ছল ব্যক্তিরা লুঙ্গির সঙ্গে গেঞ্জি এবং জামা পরিধান করেন। জেলার বেশীরভাগ জনগণ লুঙ্গি এবং গামছা পরিধান করে নগ্নপায়ে মুক্তভাবে চলাচল করে। যাঁরা অফিস এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তাঁরা শার্ট, প্যান্ট, পাজামা এবং জুতা পরিধান করেন। কাজের পোষাকে শহর এবং গ্রামে তেমন পার্থক্য নেই। বাড়ীতে এবং কর্মক্ষেত্রে শীতের দিনে চাদর ব্যবহৃত হয় ব্যাপকভাবে। বিত্তবানরা কোট-প্যান্ট পরিধান করেন। এছাড়া গরম পোষাক হিসেবে উলের সোয়েটার ব্যবহৃত হয়। কৃষকেরা যখন মাঠে কাজ করেন, তখন পাতা ও বাঁশ সহযোগে তৈরী "মাথাল" (পাতা ও বাঁশ দিয়ে তৈরী ছোট ছাউনি বিশেষ) মাথায় দেন-রোদ এবং বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

জেলার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা কিনতে সমর্থ তাঁদের প্রায় সকলেই স্যান্ডাল ব্যবহার করেন। অনেকেই শুধুমাত্র উৎসব-অনুষ্ঠানে পাদুকা ব্যবহার করেন। গ্রামের কৃষকদের মধ্যে অনেকে পায়ে কাঠের খড়ম (স্যান্ডেলের অনুরূপ) ব্যবহার করেন। গ্রামের যাঁরা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল এবং জুতা ব্যবহার করেন তাঁরাও বাড়ীতে খড়ম ব্যবহার করেন। গ্রামের কৃষকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের পর্যাপ্ত কাপড়ের সংস্থান করতে পারেন না। ফলে প্রায়শঃ তাদের ছেলেমেয়েদের জীর্ণ কাপড় পরিধান করতে দেখা যায়। শীতকালে কৃষকেরা তাদের সন্তানদের জন্য কিছু কাপড় সংগ্রহের চেষ্টা করেন। উৎসব-অনুষ্ঠানে জেলার অধিবাসীদের অনেকে সাধারণ পোষাকের সাথে শেরওয়ানী-টুপি পরিধান করেন। তবে দরিদ্র কৃষকেরা পাদুকা ছাড়াই উৎসব-অনুষ্ঠানে আগমন করেন। সাধারণ পরিধানের পোষাক ছাড়া অন্য পোষাক তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন না দারিদ্র্যের কারণে। মহিলারা সাধারণত শাড়ী, ব্লাউজ পরিধান করেন। সচ্ছল পরিবারের মাহিলারা স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করেন। মেয়েরা সালোয়ার, কামিজ ও অন্যান্য পোষাক পরিধান করেন। দরিদ্র পরিবারের মহিলারা কৃত্তিম গহনা ব্যবহার করেন। সচ্ছল মহিলাদের ব্যবহৃত স্বর্ণালংকারের মধ্যে কানের রিং, নেকলেস, ব্রেসলেট অন্যতম।

বর্গা ব্যবস্থাঃ-রাজবাড়ী জেলায় কৃষিক্ষেত্রে বর্গা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় জমির মালিক, একজন কৃষকের কাছে তার জমি চাষ করার জন্য প্রদান করেন। এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, কৃষক ঐ জমি চাষ করে যে ফসল উৎপাদন করবেন, ঐ ফসলের অর্ধেক জমির মালিককে প্রদান করবেন। কৃষক জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য অর্ধেক অংশ পায়। কখনও জমির মালিক কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের বেশী আদায় করেন। এক্ষেত্রে জমির মালিক কৃষককে ফসলের বীজ, সার প্রভৃতি নিদিষ্ট অংশ প্রদান করেন। কৃষক এবং জমির মালিকের মধ্যে উৎপাদিত ফসলের বন্টন ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

দাদনঃ- রাজবাড়ী জেলার গ্রামাঞ্চলে ধনীকৃষক অথবা পুঁজিপতি মহাজনরা দরিদ্র কৃষকদের সরকারী ব্যাংক রেটের চেয়ে চড়া সুদে নগদ টাকা ধার দেয়। দরিদ্র কৃষকগণ তাদের অভাবের সময় এই ধার গ্রহণ করেন। এটি দাদন ব্যবসায় নামে পরিচিত। এটি একটি পুরনো প্রথা হিসেবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কৃষকেরা চড়া সুদ জেনেও কাছাকাছি অবস্থানের কারণে এবং ব্যাংক বা অন্যান্য বিধিবদ্ধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা ও ক্ষেত্র বিশেষে অব্যবস্থা এবং দুর্নীতির কারণে মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে বাধ্য হন। জেলায় এমন অনেক কৃষক আছেন যাঁরা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে নানা কারণে সময় মত তা পরিশোধ করতে না পেরে জমি ও অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন। উল্লেখ্য, দাদন ব্যবসায় আইনত নিষিদ্ধ।

সমবায় আন্দোলনঃ- দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কৃষি ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে তৎকালীন ফরিদপুর জেলায় সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সময় "কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাংক সোসাইটি" নামে একটি সমবায় ব্যাংক এবং চৌদ্দটি গ্রামীণ সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রথম রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠান "ফরিদপুর কো-

Dhaka University Institutional Repository

অপারেটিভ আরবান ব্যাংক" এবং "কুরশি গ্রাম্য বাইতুলমাল" ও "পাঁচমিঞা গ্রাম্য বাইতুলমাল"। শেষের দু'টি প্রতিষ্ঠান তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা অর্থাৎ বর্তমান রাজবাড়ী জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর অনেকগুলো পল্লী সমিতি ও আরবান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে। ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়।[৬] তৎকালীন ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গোয়ালন্দ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ধীরে ধীরে উন্নতি করেছিল। বর্তমানে রাজবাড়ী জেলায় সরকারীভাবে সমবায় ব্যাংক এবং বেসরকারীভাবে অনেক সমবায় সমিতি কাজ করছে।

বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য তালিকাঃ-

সাল	পণ্যদ্রব্য	মান	ওজন	মূল্য
১৮৬৬	চাল	সবচেয়ে ভাল মানের	৮সের ১৪ ছটাক	১ টাকা
	চাল	সাধারণ মানের	১২ সের	১ টাকা
	গম	-------	১১সের১২ ছটাক	১ টাকা
	লবন	-------	৭সের ৩ ছটাক	১ টাকা
১৮৬৭	চাল	সবচেয়ে ভাল মানের	১৯ সের	১ টাকা
	চাল	সাধারণ মানের	২০সের ১৩ ছটাক	১ টাকা
	গম	--------	১৯সের ৯ ছটাক	১ টাকা
	লবন	--------	৭সের ৩ ছটাক	১ টাকা
১৮৭০	চাল	সবচেয়ে ভাল মানের	১১সের ৯ ছটাক	১ টাকা
	চাল	সাধারণ মানের	২১সের ৫ ছটাক	১ টাকা
	গম	--------	১৫সের ৩ ছটাক	১ টাকা
	লবন	--------	৭সের ৫ ছটাক	১ টাকা
১৮৭৮	চাল	সবচেয়ে ভাল মানের	৬ সের ১৩ ছটাক	১ টাকা
	চাল	সাধারণ মানের	১১সের ১২ ছটাক	১ টাকা
	গম	--------	১৩সের ১৩ ছটাক	১ টাকা
	লবন	--------	৯সের	১ টাকা
১৯১১	চাল	--------	১০ সের ১০ ছটাক	১ টাকা
	গম	-------	১০ সের	১ টাকা
	লবন	----------	১৬ সের	১ টাকা

সারণী-২১

৬। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page:-133.

Dhaka University Institutional Repository

সাল	পণ্যদ্রব্য	ওজন	গড়মূল্য
১৯৩৯	চাল	১০সের ২ ছটাক	১ টাকা
১৯৪০	চাল	৯ সের ১ ছটাক	১ টাকা
১৯৪১	চাল	৮ সের ২ ছটাক	১ টাকা
১৯৪২	চাল	৭সের ১০ ছটাক	১ টাকা
১৯৪৩	চাল	১ সের ১৩ ছটাক	১ টাকা

সারণী-২২

সাল	পণ্যদ্রব্য	মান	ওজন	মূল্য
১৯৬৩	চাল	উন্নত মানের	প্রতি মণ	৩২ টাকা ৪০ পয়সা
	গম	-----	প্রতি মণ	১৩ টাকা ১০ পয়সা
	দুধ	-------	প্রতি মণ	২১ টাকা
	চিনি	---------	প্রতি মণ	৬৫ টাকা ৮৮ পয়সা
	লবন	উন্নত মানের	প্রতি মণ	৭ টাকা ৩৩ পয়সা

সারণী-২৩

সারণীগুলোতে দেখা যাচ্ছে, ১৮৬৭ সালে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অনেক কমে যায়। শুধু লবনের দাম অপরিবর্তিত থাকে।

রাজবাড়ী জেলার কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য তালিকাঃ-

২০০০ সাল

পণ্যদ্রব্য	মান	ওজন	মূল্য
চাল	মধ্যম মানের	প্রতি কেজি	১৮ টাকা
আটা	-------	প্রতি কেজি	১৩ টাকা
লবন	-------	প্রতি কেজি	৭ টাকা

সারণী-২৪

পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ সংযোগঃ- রাজবাড়ী জেলায় মাত্র ০.২১ শতাংশ পরিবার তাদের পানীয় জল সংগ্রহ করে ট্যাপ বা নলকূপ থেকে। ৯৩.৫১ শতাংশ পরিবার টিউবওয়েল থেকে। ৪.৭৬ শতাংশ পরিবার কূয়া থেকে। ০.৯৩ শতাংশ পুকুর থেকে এবং ০.৫৯ শতাংশ ক্যানেল বা নদী থেকে। জেলার ৪.৫৮ শতাংশ পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। ৯৫.৪২ শতাংশ পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।[৮]

৭। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page:-137-140.

৮। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস রাজবাড়ী জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-Xiii

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী জেলায় (স্থান ও লিঙ্গ ভিত্তিক) অর্থনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণকারীদের তালিকাঃ-

স্থান	১৯৮১		১৯৯১	
	স্থূল	সঠিক	স্থূল	সঠিক
মোট এলাকা	২৫.৮৬	৪০.৪১	২৮.৩১	৪২.৩৫
পুরুষ	৫০.৪০	৭৫.৪৮	৫২.০১	৭৭.৫৩
মহিলা	১.৮৪	২.৭৯	২.৯৯	৪.৪৯
পল্লী এলাকা	২৭.৪৪	৪০.৮০	২৮.২৮	৪২.৬৪
পুরুষ	৫১.৬২	৭৬.৪১	৫২.২১	৭৮.৪৬
মহিলা	১.৮০	২.৬৯	২.৭৬	৪.১৮
শহর এলাকা	২১.১৫	৩৫.৯৯	২৮.৫৪	৩৯.৯৮
পুরুষ	৩৮.৬১	৬৫.১৮	৫০.২৩	৭০.০৪
মহিলা	২.২৮	৩.৯১	৫.০০	৭.০৪

সারণী-২৫

শিল্পঃ- ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, রাজবাড়ী জেলার অধিবাসীরা মূলতঃ কৃষি নির্ভর। এই জেলায় শিল্প-কারখানা খুব অল্প পরিমাণে গড়ে উঠেছে। শিল্প বলতে প্রধানতঃ কুটির শিল্প। অল্প কিছু মাঝারি ও ভারী শিল্প গড়ে উঠেছে। এই জেলায় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কিছু শিল্প গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে তার বেশির ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জেলায় উন্নীত হবার পর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন করা হয়েছে। আর্থিক ঋণ ও পরামর্শগত সুবিধা প্রদান করে জেলার উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা বিসিক শিল্প নগরী স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজবাড়ী জেলায় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছিল। চল্লিশের দশকেও কিছু কুটির শিল্প গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। এই জেলার শিল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল নিম্নরূপঃ-

তাঁত শিল্পঃ- তাঁত শিল্প জেলার একটি পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্প ছিল। তাঁত বুনন শিল্পে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন তাদের "জোলা" বা "কারিগর" বলা হয়। জেলার অধিবাসীদের এই অংশ একচেটিয়া ব্যবসা করত। এই শিল্প একদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প হিসেবে স্থান করে নিয়েছিল এবং বিপুল সংখ্যক কৃষি বহির্ভূত মানুষের কর্মসংস্থান করেছিল। তাঁত শিল্পে তৈরী করা হতো প্রধানত গামছা, লুঙ্গী, ধুতি, বিছানার চাদর, শাড়ী প্রভৃতি। স্থানীয় বাজারে এই সব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল। উন্নত মানের লিনেন কাপড়, কোট এবং শার্টের ডোরাকাটা কাপড়ের জন্য রাজবাড়ী তাঁত শিল্পের সুনাম ছিল। ভাল মানের কাপড় ঢাকার বাজারে সরবরাহ করা হতো।

মাদুর এবং ঝুড়ি তৈরী শিল্পঃ- মাদুর এবং ঝুড়ি তৈরী শিল্প রাজবাড়ী জেলায় একদা উল্লেখ্যযোগ্য শিল্প ছিল। সাংসারিক প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে

৯। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস রাজবাড়ী জেলা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

মাদুর এবং বাঁশের ঝুড়ি তৈরী করা হতো গ্রামে। এছাড়া চেয়ার, টিপয়, টিফিন বাক্স প্রভৃতি তৈরী করা হতো। জেলার বালিয়াকান্দি এবং পাংশা থানায় এই ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছিল বেশী।

কুমার শিল্পঃ-রাজবাড়ী জেলার ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের মধ্যে কুমার শিল্প বা পোড়া মাটির তৈরী শিল্প অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকেই এই শিল্প জেলায় জনপ্রিয়। বর্তমানেও এই শিল্প বিদ্যমান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের। এদেরকে "কুম্ভকার" বলা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বিপুল সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে চলে গেলে এই শিল্পে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শিল্পে বিশেষ ধরণের মাটি শিল্পরূপ দিয়ে ভালভাবে পুড়িয়ে তারপর কাজ করা হয়। মাটি নরম করে পুড়িয়ে তারপর শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, বিভিন্ন নক্সা এঁকে হাড়ি, কলস, পাতিল, কড়াই প্রভৃতি তৈরী করে।

ঘানি শিল্পঃ- রাজবাড়ী জেলায় ঘানি শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল। ঘানি হলো তেলবীজ কর্ষন করে তেল বের করার দেশে প্রস্তুত কাঠের যন্ত্র বিশেষ। ঘানি শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বলা হতো "কলু"। কৃষকেরা তৈলবীজ উৎপন্ন করে কলুদের কাছে নিয়ে যেত এবং এরা ঘানির সাহায্যে তেল উৎপন্ন করতো। বিনিময়ে পারিশ্রমিক পেত। বর্তমানে জেলায় এই শিল্প বিলুপ্তির পথে।

বর্তমানে বিলুপ্ত জেলার মাঝারি ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম, স্থান ও অন্যান্য তথ্যাবলী প্রদান করা হলোঃ-

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা	যে ধরণের প্রতিষ্ঠান	স্থাপনের সন	মোট বার্ষিক উৎপাদন
মেসার্স আনোয়ার সোপ ফ্যাক্টরী, পোঃ ও জেলা-রাজবাড়ী	সাবান এবং কেমিক্যাল	১৯৫৫	৪,০০০ মণ
মেসার্স গোয়ালন্দ আইস কোম্পানী লিমিটেড, পোঃ ও জেলা-রাজবাড়ী	বরফ উৎপাদন	১৯৩০	২,৯০০ টন
মেসার্স দি পদ্মা আইস ফ্যাক্টরী, পোঃ ও জেলা-রাজবাড়ী	বরফ উৎপাদন	১৯৩৬	৩২,৮৫০ মণ
মেসার্স ড্রাই আইস এ্যান্ড কার্বনিক গ্যাস কোঃ লিমিটেড, পোঃ ও জেলা-রাজবাড়ী	কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপাদন	১৯৫৬	৩৬০ টন
মেসার্স রাজবাড়ী অয়েল মিলস্, পোঃ ও জেলা-রাজবাড়ী	ভোজ্য তেল উৎপাদন	১৯৫৭	১৯,৭০০ মণ

সারণী-২৬

শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে বর্তমানেও উৎপাদন অব্যাহত আছে।

১০। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page:-160-161.

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ী জেলায় বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ-

বিসিক শিল্প নগরী	ঃ- ১টি
বৃহৎ শিল্প	ঃ- ১টি
মাঝারি ও কুটির শিল্প	ঃ- ৪৭০৮টি

রাজবাড়ী জেলা সদরে বিসিক শিল্পনগরী রয়েছে। এই নগরী প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হলো জেলার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে পরামর্শ ও ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে বিসিক। জেলার বৃহৎ শিল্প রয়েছে সদর থানার খানখানাপুরে। এটি জেলার একমাত্র টেক্সটাইল মিল যা কাপড় উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া জেলায় মাঝারি ও কুটির শিল্প রয়েছে অনেকগুলি।

ব্যবসায়-বাণিজ্যঃ-রাজবাড়ী জেলার অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর হওয়ায় জেলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রধান স্থান দখল করে আছে কৃষি পণ্য। বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বাণিজ্য এই জেলায় চলে। জেলার প্রধান আমদানি ও রফতানি পণ্য কৃষি হলেও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর আমদানি ও ক্ষেত্র বিশেষে রফতানি করা হয়। সাধারণভাবে জেলার অধিবাসীদের চাহিদা অনেকাংশ সনাতনী।

ব্যবসায় কেন্দ্রঃ- রাজবাড়ী জেলায় সদর থানাসহ চারটি থানা রয়েছে। জেলার প্রধান ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হয় জেলা সদরে। এছাড়া গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি ও পাংশা থানা সদরে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হয়। জেলার যে সমস্ত ব্যবসায় কেন্দ্র বাজার হিসেবে পরিচিত সেসব স্থানে প্রতিদিন সবসময় ক্রয়-বিক্রয় হয়। এছাড়া "হাট" হিসেবে পরিচিত ব্যবসাকেন্দ্র রয়েছে। এখানে প্রধানত সপ্তাহে দু'দিন বাণিজ্য পরিচালিত হয়। হাট প্রধানত জেলার গ্রামাঞ্চলের কাছাকাছি জায়গায় বা অন্য কোন ছোট স্থানে বসে। হাটে গ্রামের কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে আসেন বিপণনের জন্য এবং একই সঙ্গে তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করেন। অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যের পণ্য গ্রামের মানুষ থানা অথবা জেলা সদর থেকে ক্রয় করেন।

ব্যবসায় পদ্ধতিঃ- বাজারে বা হাটে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়। বাজারে স্থায়ী এবং অস্থায়ী দুই ধরণের দোকান রয়েছে। বাজারে স্থায়ী দোকানের সংখ্যাই বেশী। হাটে অস্থায়ী দোকানের সংখ্যা বেশী। বাজারে অর্থাৎ যেখানে দিনের সবসময় ক্রয়-বিক্রয় হয় সেখানেও সাধারণত দুই দিন হাট বসে। এই দুই দিন বাইরে থেকে অনেক মালামাল আমদানি ও রপ্তানি হয়। জেলার বাজার ও হাটগুলোতে খুচরা ও পাইকারি দুই ভাবেই ক্রয়-বিক্রয় হয়। বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণত পাইকারিভাবে ক্রয়-বিক্রয় করেন।

জেলার গ্রামাঞ্চলে ও প্রত্যন্ত এলাকার ছোট বাজারগুলোতে ফড়িয়াদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। এরা প্রত্যন্ত এলাকার ছোট বাজার থেকে এবং কখনও গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য কমদামে ক্রয় করে। মৌসুমকালে স্থানীয় বাজারে অথবা বাড়ীতে কৃষি পণ্যের দাম স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। এসময়ই ফড়িয়ারা কমদামে

Dhaka University Institutional Repository

পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে। তারা ধান, পাট, পিঁয়াজ, বিভিন্ন তৈল বীজ, তরকারী ও অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয় করে। এছাড়া মুরগি, ডিম, ছাগল প্রভৃতি কিনে নেয়। ক্রয় করা পণ্যসামগ্রী তারা জেলা শহর, অন্যান্য বড় শহর ও রাজধানীতে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জন করে। মাঝে মাঝে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদাকালীন সময়ে ঐ পণ্য কিনে গুদামে আটকে রেখে কৃত্তিম সংকট সৃষ্টি করে। তারপর চড়াদামে বিক্রি করে। এরা মজুতদার হিসেবে পরিচিত। জেলার বিভিন্ন বাজার এলাকায় মজুতদারদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। জেলার পণ্যসামগ্রী আমদানি এবং রফতানি হয় প্রধানত ট্রাক, রেল ও অন্যান্য মোটর যানে। রাজবাড়ী জেলা পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় জলপথেও পণ্য আমদানি ও রফতানি হয়। বর্ষাকালে জলপথের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

যে সব পণ্য বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহৃত হয়ঃ- রাজবাড়ী জেলা ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই জেলার বাজার ও ব্যবসায় কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন কৃষিপণ্য যেমনঃ- ধান, পাট, সরিষা, নানা ধরণের ডাল, ভোজ্যতেল, চিনি, লবন এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়। পদ্মা নদীর তীরে অবস্থানের কারণে এবং জেলার অভ্যন্তরে খাল, বিল, জলাশয়, পুকুর থাকায় মাছ ব্যবসায় এই জেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী, নানা ধরণের মিষ্টি এখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়। শিল্পজাত সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রায় সবই আমদানি করা হয়। শিল্প কারখানা গড়ে না ওঠায় জেলার অধিবাসীদের আমদানির উপর প্রধানত নির্ভর করতে হয়। জেলার ব্যবসায় কেন্দ্রগুলোতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতিও ক্রয়-বিক্রয় হয়।

রাজবাড়ী জেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রের তালিকাঃ-

রাজবাড়ী সদর থানা

কেন্দ্র	হাট/বাজারের দিন
রাজবাড়ী	রবিবার, বৃহস্পতিবার হাট এবং দৈনিক বাজার
কুঠি পাঁচুরিয়া	মঙ্গলবার এবং শুক্রবার
খানখানাপুর	মঙ্গলবার এবং শুক্রবার
বসন্তপুর	মঙ্গলবার এবং শুক্রবার
রাজাপুর	সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
বরাট	সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
উড়াকান্দা	মঙ্গলবার এবং শুক্রবার
মাটিপাড়া	শনিবার এবং মঙ্গলবার
বাণীবহ	সোমবার এবং শুক্রবার
কোলাহাট	রবিবার এবং সোমবার
কুঠির হাট	শনিবার এবং বুধবার
পাঁচুরিয়া	মঙ্গলবার এবং শুক্রবার

সারণী -২৭

Dhaka University Institutional Repository

গোয়ালন্দ থানা

কেন্দ্র	হাট / বাজারের দিন
গোয়ালন্দ	দৈনিক
উজানচর হাট	শনিবার এবং বুধবার

সারণী-২৮

বালিয়াকান্দি থানা

কেন্দ্র	হাট / বাজারের দিন
বালিয়াকান্দি হাট	রবিবার এবং বৃহস্পতিবার
নারুয়া হাট	সোমবার এবং শুক্রবার
বহরপুর	শনিবার এবং বৃহস্পতিবার
সমাধিনগর	শনিবার এবং বুধবার
জামালপুর হাট	রবিবার এবং বুধবার
নটাপাড়া হাট	শনিবার এবং সোমবার

সারণী-২৯

পাংশা থানা

কেন্দ্র	হাট/বাজারের দিন
পাংশা হাট	রবিবার এবং বুধবার
পাংশা রেলওয়ে ষ্টেশন বাজার	দৈনিক
সেনগ্রাম	সোমবার এবং শুক্রবার
হাবাসপুর	দৈনিক
মাছপাড়া	সোমবার এবং শুক্রবার
মেঘনাহাট	শনিবার এবং মঙ্গলবার
কলাবা মাজাইল হাট	রবিবার এবং বৃহস্পতিবার
মৃগীহাট	রবিবার এবং বৃস্পতিবার
বৃথি ডাঙ্গা হাট	সোমবার এবং শুক্রবার
রতনদিয়া হাট	বুধবার
বেলগাছি (দাদপুর)	সোমবার এবং শুক্রবার

সারণী-৩০ [১১]

রাজবাড়ী জেলায় মোট হাট/বাজারের সংখ্যা ছিয়াশিটি।

১১। Bangladesh District Gazetteers, Faridpur-1977, Page -181-183

Dhaka University Institutional Repository

জেলার কৃষি ফসলগুলো নিম্নরূপঃ-ধান, পাট, আঁখ, নানা ধরনের ডাল যেমনঃ মশুরী, মাসকলাই, ছোলা, মুগ, খেসারী, অড়হর প্রভৃতি। নানা ধরনের শবজি যেমনঃ আলু, লাউ, বাঁধাকপি, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, কাঁচামরিচ, মূলা, ফুলকপি, ওল, ধনেপাতা, বেগুন, পেঁপে, কাঁচাকলা, গাজর প্রভৃতি। নানা ধরনের ফল যেমনঃ আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, বাতাবিলেবু, নারিকেল, তাল, সুপারি, ছবেদা, পিচফল, লেবু প্রভৃতি।

পানচাষঃ-জেলার সম্ভাবনাময় উৎপাদিত পণ্য পান। জেলার বিভিন্ন স্থানে পান চাষ করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শ্রেণী , যাদের "বাড়ৈ" বলা হয় তাঁরা পারিবারিক ঐতিহ্যগতভাবে পান চাষ করে থাকে। পানের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ পান খায়। গ্রাম অঞ্চলে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে পান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শহর অঞ্চলেও পান ব্যাপকভাবে সমাদৃত। পানের চাহিদা দেশের বাইরেও ব্যাপক। পরিকল্পিতভাবে পান চাষ করে দেশের বাইরে রফতানি করা সম্ভব। পান উঁচু জমির ফসল। যেখানে বৃষ্টি বা বন্যার পানি আটকে থাকে না সেখানে পান চাষ সম্ভব। জেলার অর্থনীতিতে পান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জেলার বিভিন্ন হাট-বাজারে প্রচুর পান ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। বড় বাজারগুলোতে পান বিক্রি করার জন্য নির্দিষ্ট এলাকা রয়েছে। বাজারের এই অংশকে পান বাজার বলা হয়।

রাজবাড়ী জেলায় কৃষি জমির পরিমাণঃ-

(ক)	আবাদীঃ-	৮১,২৫৩,৩৩৮ হেক্টর
(খ)	অনাবাদীঃ-	২৫,১৩৯,২১৪ হেক্টর
(গ)	এক ফসলীঃ-	২৭,৯৭৮,৫৫১ হেক্টর
(ঘ)	দো-ফসলীঃ-	৪০,৯১৬,৬৩২ হেক্টর
(ঙ)	তিন ফসলীঃ-	১২,৩৫৮,১৫৪ হেক্টর

নলকূপঃ-

(ক)	তারা ডিপ সেটঃ-	২১৩৪ টি
(খ)	অগভীর নলকূপ	৭২৯৪ টি

আদর্শ গ্রামঃ-	১০ টি
উপকৃত পরিবারের সংখ্যাঃ-	৩৪৯ টি

খাস জমির পরিমাণঃ-

(ক)	কৃষিঃ-	৬১২৯.৮৬ একর
(খ)	অকৃষিঃ-	১২৫০.৬৯ একর

বন্দোবস্তকারী খাস জমির পরিমাণঃ-

(ক)	কৃষিঃ-	৩২৯৮.৩০ একর
(খ)	অকৃষিঃ-	১১.১৫ একর
(গ)	উপকৃত পরিবারের সংখ্যাঃ-	৪৩৪৭ টি

Dhaka University Institutional Repository

বন্যায়নঃ-

(ক) রোপিত গাছের সংখ্যাঃ-	৩৬১৬৯ টি
(খ) জীবিত বৃক্ষের সংখ্যাঃ-	৩২৫৪৬৯ টি
বিদ্যুতায়িত গ্রামঃ-	১৫৭ টি
জলমহালঃ-	১১ টি
ব্যাংক শাখাঃ-	৩৫ টি
ফুডগোডাউনঃ-	৪ টি
জেলার মৌজা সংখ্যাঃ-	৮০৪ টি
গ্রামঃ-	১০৩৬ টি
বাড়ীর সংখ্যাঃ-	১,৬৮১৩৮ টি
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধঃ-	৫৭ কিলোমিটার
পুকুরের সংখ্যাঃ-	১২২৫ টি
হাঁস-মুরগির খামারঃ-	৪৪ টি
দুগ্ধ খামারঃ-	২৫ টি
মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রঃ-	৪ টি
গ্রামীণ ব্যাংক শাখাঃ-	১২ টি

ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশীল)ঃ- ৪৩ টি।[১২]

বিসিক শিল্প নগরী, রাজবাড়ীঃ- অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীলতা একটি দেশকে উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে না। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। কৃষি নির্ভর এই দেশের যথার্থ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। কারণ কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার এদেশে নিতান্ত অপ্রতুল। ফলে এখাতেও যথার্থ উন্নয়ন ঘটেনি। এছাড়া দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব নিরসনে শিল্পায়নের বিকল্প নেই। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের পিছনে শিল্পখাত মূল ভূমিকা পালন করেছে।

শিল্পায়ন ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়-মূলত এই চেতনা থেকেই বর্তমান রাজবাড়ী জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য, সরকারী উদ্যোগে বিসিক শিল্প নগরী স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাসের একুশ তারিখে জমি দখল করা হয়। এই জমিতে শিল্পনগরী উদ্বোধন করা হয় বাইশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ সালে। এই উদ্দেশ্যে দখলীকৃত মোট জমির পরিমান ১৫.২৮ একর।

বিসিক শিল্পনগরী-প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীঃ-

১।	জমি দখলের তারিখঃ-	২১-০৮-১৯৬৩ সন
২।	শিল্প নগরী উদ্বোধনঃ-	২২-০২-১৯৬৪ সন
৩।	মোট জমির পরিমাণঃ-	১৫.২৮ একর
৪।	প্লটভুক্ত জমিঃ-	১৩.০২ একর

১২। জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

৫। প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জমির পরিমাণঃ- ২.২৬ একর

৬। প্রতি একর জমির নির্ধারিত মূল্যঃ-

(ক) পুরাতন হারঃ- ০.৭৫ লক্ষ টাকা

(খ) নতুন হারঃ- ১.২৫ লক্ষ টাকা (০১-০৬-১৯৯৬ ইং হতে কার্যকর)

৭। মোট প্লট সংখ্যাঃ- ৭৭ টি

৮। অফিসের কাজে ব্যবহৃত প্লট সংখ্যাঃ- ০৩ টি

৯। মোট বরাদ্দযোগ্য প্লট সংখ্যাঃ- ৭৪ টি

১০। এ পর্যন্ত মোট বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যাঃ ৬৫ টি

১১। বর্তমানে বরাদ্দের অপেক্ষায় প্লট সংখ্যাঃ- ৯টি

বরাদ্দকৃত শিল্প ইউনিট সংক্রান্ত তথ্যঃ-

(ক) বরাদ্দকৃত মোট শিল্প ইউনিটঃ- ৩৮ টি

(খ) উৎপাদনরত শিল্প ইউনিটঃ- ০৯ টি

(গ) নির্মাণাধীন শিল্প ইউনিটঃ- ০২ টি

(ঘ) নির্মাণের অপেক্ষায় শিল্প ইউনিটঃ- ১১ টি

(ঙ) রুগ্ন/নিষ্ক্রিয় শিল্প ইউনিটঃ- ১৬ টি।[১৩]

প্লটের বিবরণঃ-

প্লটের শ্রেণী	সংখ্যা	সাইজ প্রতিটি
'এ' টাইপ	১৪ টি	১৫০ ফুট X ১০০ ফুট = ১৫,০০০ বর্গফুট
'বি' টাইপ	২৩ টি	১২০ ফুট X ৭৫ ফুট = ৯,০০০ বর্গফুট
'সি' টাইপ	২০ টি	৯০ ফুট X ৫০ ফুট = ৪,৫০০ বর্গফুট
'ডি' টাইপ	২০ টি	৭৫ ফুট X ৪০ ফুট = ৩,০০০ বর্গফুট
মোট	৭৭ টি	

সারণী-৩১

বিভিন্ন পাওনা আদায় সংক্রান্ত তথ্য

বিবরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার
জমির কিস্তি	৫.৭১ লক্ষ	৪.২৮ লক্ষ	৭৫%
সার্ভিস চার্জ	০.৬৩ লক্ষ	০.৪১ লক্ষ	৬৫%
ভূমি উন্নয়ন কর	০.৯৬ লক্ষ	০.৬৫ লক্ষ	৬৮%
মোট	৭.৩০ লক্ষ	৫.৩৪ লক্ষ	৭৩%

সারণী-৩২[১৪]

১৩। বিসিক শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

১৪। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প নগরীর জনশক্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ-

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	বর্তমানে কর্মরত পদ	কম/বেশী	মন্তব্য
শিল্প নগরী কর্মকর্তা	১ জন	১ জন	------	----
কারিগরী কর্মকর্তা	১ জন	---	১ জন কম	------
হিসাব রক্ষক তথা কোষাধ্যক্ষ	১ জন	-----	১ জন কম	------
করণিক তথা মুদ্রাক্ষরিক	১ জন	১ জন	------	দৈনিক ভিত্তিক
পাম্প ড্রাইভার	১ জন	----	১ জন কম	-----
পিয়ন	১ জন	১ জন	-------	দৈনিক ভিত্তিক
দারোয়ান	২ জন	২ জন	--------	১ জন দৈনিক ভিত্তিক
মোট	৮ জন	৫ জন	৩ জন কম	------

সারণী-৩৩

বিসিক শিল্পনগরীর বাইরে রাজবাড়ী জেলায়, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগ প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে।[১৫]

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজবাড়ী জেলাঃ- আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজবাড়ী জেলার অবস্থান সার্বিকভাবে দারিদ্র্যসীমার নিচে। জেলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান, সমগ্র দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মানদন্ডের তুলনায়ও নিম্নে। এই অবস্থার জন্য বেশ কয়েকটি কারণের মধ্যে দু'টি প্রধান কারণ-জেলার অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শিক্ষার অভাব।

বাংলাদেশে যোগাযোগ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভিত্তিতে উন্নতি হচ্ছে প্রচুর। কিন্তু রাজবাড়ী জেলা এক্ষেত্রে অবহেলিত রয়ে গেছে। ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নদী সিকস্তি জনগণ আশ্রয়ের আশায় বাইরের জেলাগুলোতে, বিশেষ করে রাজধানীতে এসে ভীড় জমাচ্ছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, বন্যার কারণে জেলার বিস্তর আবাদযোগ্য জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। ১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী দীর্ঘস্থায়ী বন্যা জেলার অর্থনীতির দুর্বল ভিত-কে দুর্বলতর করে দিয়েছে। সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়েছে। সবগুলো বিধ্বস্ত সেতু ও কালভার্ট এখনও মেরামত করা সম্ভব হয় নি।

বিভিন্ন সময়ে একথা উচ্চারিত হয় যে, বাংলাদেশে সম্পদের প্রাচুর্য নেই। তবুও যা আছে তার সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে দেশের আপামর জনগণের প্রভূত উপকার হবে। রাজবাড়ী জেলার অভ্যন্তরীন সম্পদের অপ্রতুলতা আছে বলে ধারণা করা হয় না। তথাপি সামগ্রিকভাবে জেলাটি একটি ঘাটতি এলাকা। প্রতি বছরই বিভিন্ন

১৫। বিসিক শিল্প নগরী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

জেলা, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলো থেকে ধান-চাল আমদানি করে ঘাটতি মেটাতে হয়। জেলায় আবাদযোগ্য ভূমি যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু যান্ত্রিক চাষাবাদ ও উচচ ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহারে জেলা যথেষ্ট অনগ্রসর।

একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে জেলার জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার কারণে প্রযুক্তিগত চাষাবাদ ও মননশীলতার প্রতি সাধারণ উন্নাসিকতা অথবা অসচেতনতাজনিত অবহেলা বিরাজ করছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে থানা পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় অনুদান বিভিন্ন খাতে যথেষ্ট আসছে। বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। কিছু সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ও হচেছ প্রচুর। কিন্তু সাধারণ গণমানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে না।[১৬] জেলার গোয়ালন্দ থানা পদ্মা নদীর পাশে অবস্থিত। এখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বালুর চর। আগে যেখানে শস্য-শ্যামল প্রান্তর ছিল এখন সেখানে শুধু বালু-যা আগাম মরুভূমির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পদ্মা নদী শুষ্ক মৌসুমে শীর্ণকায়া হয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও পানির গভীরতা এতটা কমে যায় যে, আরিচা বা অন্যান্য স্থানের সঙ্গে মাঝে মধ্যে লঞ্চ যোগাযোগ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। প্রয়োজনীয় ড্রেজিং- এর অভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চর জেগে ওঠায় নদীর গতিপথেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে জেলার বেকার জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ অকৃষিজাত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যেহেতু কৃষিক্ষেত্রে জেলা তেমন অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি তাই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু আনুপাতিক হারে এই জেলাতে উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানা এখনও গড়ে ওঠেনি। কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলেও তার অধিকাংশ জন্মলগ্ন থেকেই নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে অন্যরা শিল্প স্থাপনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। সরকার এক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয়ার কথা ঘোষনা করেছেন। কিন্তু ঋণদানের ক্ষেত্রে বিধি সম্মত নিয়মাবলীকে সহজসাধ্য করেননি। ফলে অনেকেই ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচেছন। জেলার পাংশা থানায় কিছু শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জেলার সদর থানার খানখানাপুরের "গোয়ালন্দ টেক্সটাইল মিল" বেসরকারী খাতে হস্তান্তরিত হলেও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে লাভবান হতে পারছে না। মূলতঃ চলতি মূলধনের অভাব ও ঋণ গ্রহীতার আনুপাতিক হারে বিনিয়োগের অক্ষমতা প্রকল্প স্থাপনের কাজকে দুরূহ করে দিচেছ।

সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ দুর্ভোগ পোহাচেছন। থানা পর্যায়ে বেশ কিছু সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রোথ সেন্টারের সঙ্গে পাকা রাস্তার সংযোগ সাধনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। জেলায় সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের কারিগরী সাহায্যাধীন প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয়েছে। এই প্রকল্পে শুধুমাত্র রাস্তা ও বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না, একই সঙ্গে গ্রামীণ দুস্থ জনসাধারণকে কর্মজীবী ও স্বাবলম্বী

১৬। <u>রাজবাড়ী দর্পন</u>, রাজবাড়ী জেলা সমিতি ১৯৮৯, পৃষ্ঠাঃ-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে থাকে। এর জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মূলধনও দেয়া হয় যাতে তারা নিজস্ব পেশায় স্বনির্ভর হতে পারে। সরকারের 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ' এই প্রকল্পের কাজ দাতা দেশসমূহের সঙ্গে যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

জেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে 'আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থা' (ডাব্লিউ. এফ. পি) সরকার কর্তৃক গৃহীত গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছেন। মাঠ পর্যায়ে শ্রমিক ও সর্দারদের গ্রুপ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে জেলায় কর্মসংস্থান বেড়েছে। বেকার জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ কাজের সন্ধান পেলেও এই ধরণের কাজ স্থায়ী নয়। কর্মসূচী বন্ধ হলে নিয়োজিত জনগণ বেকার হয়ে যায়। জেলায় যেন কিছু বেসরকারী সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছেন। এতে কিছু কর্মসংস্থান হয়েছে। রাজবাড়ী জেলার প্রশাসনযন্ত্রের সঙ্গে যাঁরা জড়িত আছেন, স্ব স্ব - ক্ষেত্রে নিজস্ব দায়িত্ব পালন ছাড়াও তাঁরা অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব পালন করলে জেলার কল্যাণমুখী প্রকল্পগুলোকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। চালু প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা হচ্ছে তা তাঁরা নির্ধারণ করে এর সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করবেন। রাজধানীতে জেলার সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে তাঁরা সমস্যার কথা নিয়মিত জানাবেন। এভাবেই সমন্বয় সাধিত হবে।[১৭] জেলার আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ঢাকা প্রবাসী এবং দেশের ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কর্মরত এই জেলার অধিবাসীরা এগিয়ে আসলে জেলা উপকৃত হবে।

১৭। রাজবাড়ী দর্পণ, রাজবাড়ী জেলা সমিতি, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ৪৭,৪৯ ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে রাজবাড়ী জেলা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এই মুক্তিসংগ্রাম আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলনা। এটা ছিল বাঙালীর আত্ম-উপলব্ধী, দীর্ঘদিনের আন্দোলন এবং ইতিহাসের অমোঘ প্রক্রিয়ার পরিণতি। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ দ্বি- জাতিতত্ত্ব এবং তৎকালীন ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকবর্গের "Divide and Rule" নীতি ভারত-পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্মের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায় অর্থাৎ বাঙালী মুসলিমদের চিন্তা-চেতনায় গত পাঁচ দশকে বিভিন্ন কারণে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

বাংলার মুসলিমগণ তাঁদের আত্মপরিচয় এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে নিরীক্ষণ করে এসেছেন। তাঁরা বাঙালী না মুসলিম এই প্রশ্ন তাঁদের মানস চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কেউ কেউ নিজেদের বাঙালিত্বকে অর্থাৎ দেশজ সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে ইসলামের সর্বব্যাপক আবর্তের মধ্যে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করতে চেয়েছেন। বস্তুত এঁদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই বহিরাগত মুসলিমদের বংশধর।[১] সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও এঁরা ছিলেন নগরবাসী অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত। এঁরা কেবল নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে চাননি, এঁদের ভাষাও ছিল উর্দু। এদের সঙ্গে উত্তর ভারতের উর্দুভাষী মুসলিমগণের ঘনিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে, এঁরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। অন্যদিকে বাংলার অধিকাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম তাঁদের দেশজ বাঙালী সত্তাকে কখনও বিসর্জন দেননি। তাঁরা যেমন ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলিম, তেমনি ছিলেন নির্ভেজাল বাঙালী। কিন্তু তাঁরা ছিলেন দরিদ্র ও অশিক্ষায় নিমজ্জিত। সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার মত তাঁদের ক্ষমতা বা যোগ্যতা ছিলনা। ফলে বাংলার মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দীর্ঘকাল ধরে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়সীমা পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে অভিজাত শ্রেণীর অবাঙালী মুসলিমগণের হাতে ছিল।

এছাড়া গ্রাম বাংলার সাধারণ মুসলিমদের উপর এক শ্রেণীর অল্পশিক্ষিত মোল্লা-মৌলভী, যাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ওয়াহাবি ও ফরায়জি আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন- তাঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সাধারণ দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের উপর নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য নগরবাসী অভিজাত শ্রেণীর নেতারা এবং উপরিউক্ত মোল্লা-মৌলভীরা, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন অবাঙালী বা বাঙালী হলেও বাংলা ভাষার চেয়ে উর্দু ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতেন, এমনকি বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে

১। খৃষ্টীয় তের শতকের প্রথমদিক থেকে আগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কী আফগানদের দ্বারা বাংলাদেশ অধিকৃত হয়। কিছু কিছু আরব মুসলিম বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে চট্টগ্রামে ও নোয়াখালীতে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যায়িত করতেন, তাঁরা এদেশের মুসলিমগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে তাঁদেরকে হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা বেশ কিছুটা সহজ হয়েছিল এই কারণে যে, বাংলার জমিদার ও মহাজন - যাঁরা ছিলেন অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁদের শোষন ও অত্যাচারের ফলে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে পড়েছিল অসহনীয়। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু বিরোধী সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জাগ্রত করা সহজ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের প্রতি হিন্দু সমাজের, বিশেষ করে নগরবাসী মধ্যবিত্ত "বাবু" শ্রেণীর উন্নাসিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবও মুসলিমদের মধ্যে হিন্দু বিরোধী মনোভাব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করতে অনেকখানি উৎসাহিত করেছে।

উপমহাদেশের মুসলিমগণ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করলেও এক স্বতন্ত্রজাতি, এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, সুতরাং তাদের আশা-আকাংখা এক স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পূরণ হওয়া সম্ভব -এ বিশ্বাস পাকিস্তান সৃষ্টি করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।[২] ধর্মের ভিত্তিতে উপমহাদেশের জনগণ হিন্দু ও মুসলিম এ দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকায় ফলে ইংরেজ শাসকদের পক্ষে এদেশে "বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন চালানো" সহজ ছিল। ইংরেজ শাসকেরা এ ব্যাপারে সচেতন ছিল। এর ফলে উদ্ভব হয়েছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর বড়লাট লিন লিথগো বৃটেনের পক্ষে ভারতের যুদ্ধে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঐ ঘোষণার বিরোধিতা করে। পক্ষান্তরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যুদ্ধে বৃটেনকে সহযোগিতা করার ঘোষণা দেন এবং ২৭শে মে পত্রিকায় তাঁর ঐ ঘোষণার কথা প্রকাশিত হয়। কংগ্রেসের সঙ্গে এই মতবিরোধ তাঁর দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণার একটি কারণ।[৩]

বৃটিশ শাসনামলে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রের শুধু প্রাদেশিক শাসন সংক্রান্ত অংশ কার্যকর করা হয়। কংগ্রেসের বিরোধিতার দরুন ফেডারেল অংশ অকার্যকর থাকে। মুসলিম লীগ ফেডারেল অংশকে সমর্থন দিয়েছিল। উক্ত শাসনতন্ত্রের ফেডারেল কাঠামো কার্যকর করে দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করা সম্ভব হলে হয়তো ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের প্রয়োজন পড়তো না। ফেডারেল সরকার গঠনে ব্যর্থতার জন্য সর্বাংশে কংগ্রেস দায়ী। কংগ্রেসের ভুল থেকেই জন্ম নিল ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাব। কংগ্রেসের অবিমৃষ্যকারিতার পুনরাবৃত্তি হলো ১৯৪৬ সালের কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা পরিত্যাগের মাধ্যমে। কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতা জিন্নাহর পাকিস্তান পরিকল্পনার সাফল্যের কারণ হলো। মুসলিম লীগের ন্যায় কংগ্রেসও যদি উক্ত পরিকল্পনা মেনে নিত তাহলে আদৌ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হতো কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ

২। এ, এফ, সালাহ উদ্দীন আহমদ " বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গে " গ্রন্থে "স্বাধীনতার বিশ বছর : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা "শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা:১৫-১৬, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র (ঢাকা-১৯৯৬)।

৩। আবুল কালেম ফজলুল হক, মুক্তিসংগ্রাম (ঢাকা-১৯৯৪), পৃষ্ঠা-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

আছে।[৪] তবে একথা অনস্বীকার্য যে, কংগ্রেসের প্রত্যেকটি ভুল পদক্ষেপের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন জিন্নাহ।[৫]

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সভায় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সভায় ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী জানানো হয়। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি নিয়ে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী করা হয়।[৬]

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন এবং এর ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যে আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের সৃষ্টি সেটি কোন ধর্মীয় আন্দোলন ছিলনা। এটি ছিল স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। নানা কারণে ভারতীয় মুসলিমদের মনে এই আশংকা জাগ্রত হয়েছিল যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এদেশে হিন্দুদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ফলে মুসলিমদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে-এই আশংকাই পাকিস্তান আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পাকিস্তান আন্দোলন মূলত রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল, ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। (যদিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছিল)।[৭]

১৯৪৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম লাভের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভূ-খন্ডটির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু হয়। বাঙালী জাতির প্রতি বিদ্বেষ এবং সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও নির্যাতনের অনিবার্য পরিণতি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

বাঙালী জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের সাবেক সামরিক শাষক আইয়ুব খাঁন তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ,"Friends not Masters"-এ উল্লেখ করেছেনঃ-

"পাকিস্তানের জনসাধারণ গঠিত হয়েছে বৈচিত্রপূর্ণ জাতিগোষ্ঠী নিয়ে, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সংস্কৃতি রয়েছে। পূর্ব বাংলার বাঙালীরা, যারা জনগণের বৃহৎ অংশ, সম্ভবত আদি ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী সম্ভূত। এটা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে, পাকিস্তানের সৃষ্টি পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব কি তা তারা জানত না। একে একে তারা শাসিত হয়েছে হয় বর্ণহিন্দু, মোঘল, পাঠান অথবা

৪। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি (ঢাকা-১৯৯৩),পৃষ্ঠা:-৩০-৩১

৫। পূর্বোক্ত , পৃষ্ঠা-৩১।

৬। আসাদুজ্জামান আসাদ, মুক্তির সংগ্রামে বাংলা, (ঢাকা-১৯৯৭), পৃষ্ঠা-৮-৯।

৭। এ, এফ সালাহ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ , (ঢাকা-১৯৯১), পৃষ্ঠা-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ শাসকবর্গের দ্বারা। সেই সঙ্গে বেশ কিছু হিন্দু সাংস্কৃতিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রভাবাধীনে তারা এখনও আছে। উৎপীড়িত জাতিগোষ্ঠীর সব ধরনের আভ্যাসিক সঙ্কোচ বা নিগ্রহ তাদের আছে এবং নবলব্ধ স্বাধীনতার সঙ্গে মানসিকভাবে সন্তোষজনক সমন্বয় সাধন তারা করতে পারছে না। তাদের জনসাধারণ সম্বন্ধীয় জটিলতা, একচেটিয়াত্ব, সংশয় এবং খানিকটা আত্মরক্ষামূলক আগ্রাসিতা সম্ভবত এই ঐতিহাসিক পটভূমি সৃষ্টির জন্য দায়ী"।[৮]

১৯৪৭-৭১ কালপর্বে পূর্বপাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যঃ-১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত সময় বাঙালী জাতীয়তাবাদ বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এসময় পূর্ব বাংলার বাঙালীরা পাকিস্তানের নাগরিক ছিল। তবে এটা ঠিক যে, বাঙালী জাতীয় চেতনার বিকাশের ইতিহাস পূর্বযর্তী আরো কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি বাঙালীদের চেতনায় সংক্রমিত হতে শুরু করে। এ চেতনায় প্রাথমিক অভিব্যক্তি ঘটে পাকিস্তানের জন্য বাঙালী মুসলিমদের সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ব বাংলার জনমন থেকে আপেক্ষিক বঞ্চনার অনুভূতি দূর করতে পাকিস্তান সরকার ব্যর্থ হয় এবং এ ব্যর্থতা ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালী জাতীয়তাবাদের শক্তিগুলোকে জোরদার করে তোলে ও ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে সহায়তা করে।

১৯৪৭-৭১ কালপর্বে বাঙালীদের প্রতি অর্থনৈতিক বঞ্চনার বস্তুগত মাত্রা বা পরিমাণঃ- তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সমিতিভুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর নিজ নিজ হেড অফিস থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কর দেওয়ার বিবরণ পাওয়া যায় না। আদমজী, বাওয়ানী, আমিন, দাউদ প্রভৃতি কতিপয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আয়ের একটি বড় অংশ আসত পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে। অথচ তারা ট্যাক্স দিতো পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত তাদের হেড অফিস থেকে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে, টেলিযোগাযোগ ও রেলওয়ের মতো খাতে অঞ্চল বিশেষকে সুনির্দিষ্ট সুযোগ- সুবিধা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বরাদ্দ করা যথেষ্ঠ সহজ ছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসন, বৈদেশিক সার্ভিসসমূহ ও প্রতিরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যয় প্রধানত কর্মচারী ও দফতরসমূহের জন্য হলেও এবং এসব বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৃহত্তর অংশ পশ্চিম পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এসব বিভাগের চাকুরিতে পাকিস্তানের উভয় অংশের লোকদের সমঅধিকার রয়েছে বলে গণ্য করা হতো, এবং এসব ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য ব্যয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করা হতো। বাঙালী অর্থনীতিবিদরা দৃঢ়ভাবে এ অবস্থার বিরোধিতা করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, প্রতিরক্ষা ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সুফলসমূহ যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানই পায়, সেহেতু এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে একটা যথাযথ অংশ বা হার অনুযায়ী ঐ সব ব্যয় ভাগ করা উচিত।

৮। Ayub Khan Friends not Masters, (Lahore-1967), Page-275.

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে এটাও দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিভাগের চাকুরির সুফলও পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানই অনেক বেশি ভোগ করে। ঐ সব সুফল পক্ষপাতহীনভাবে বন্টন করা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের এরকম অ-বরাদ্দযোগ্য সম্পদ বন্টনের পরিমাপ করতে গিয়ে বাঙালী অর্থনীতিবিদরা দেখেন যে, চাকুরি এবং কেন্দ্রীয় ব্যয় অন্যায়ভাবে অঞ্চল বিশেষে চলে গেছে। ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ ও অর্থের বেশিরভাগ কোথায় যায় সেটার হিসাব নেয়াটা সম্ভব করে দেয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের হিসাব নিরূপনঃ- বৈষম্যের অতিসহজ প্রাপ্য পরিমাপটি আঞ্চলিক জি, ডি, পি (Gross Domestic Product) ও মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাপের সঙ্গে সম্পর্কিত। আঞ্চলিক মাথা পিছু আয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের যে কোন সূচক সহজলভ্য। এসব হিসাবের বেশিরভাগ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের জাতীয় আয় সংক্রান্ত হিসাব থেকে নেওয়া উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বলে বছরে বছরে বিভিন্ন উৎসের হিসাবে গরমিল দেখা যায়। পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রণেতা অর্থনীতিবিদদের জন্য পেশকৃত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের দুটো পৃথক রিপোর্টে প্রদত্ত মাথাপিছু বৈষম্যের হিসাব এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। আঞ্চলিক অর্থনীতির বৈষম্যের পূর্ণতর বিবরণের জন্য অন্যান্য উপাত্তগুলিও দেখা প্রয়োজন।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশ যে অর্থনীতির উত্তরাধিকারী হয় তাতে তাদের বিকাশের স্তরে আকাশ পাতাল বৈষম্য ছিল না। উভয় অঞ্চলের শিল্প ভিত্তি ছিল উপেক্ষণীয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তান রাস্তাঘাট, সেচ ব্যবস্থার সুবিধা ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি থেকে একটা উন্নততর অবকাঠামো লাভ করে। উভয় অংশের জি, ডি, পি প্রায় সমানই ছিল। দেশজাত উৎপন্ন দ্রব্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জি, ডি, পি পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে সামান্য পরিমাণে বেশি এবং তা ১৯৫৩ -৫৪ সাল পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে। তবে জি, ডি, পি -এর অবরাদ্দযোগ্য অংশগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের সাথে যুক্ত করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে সামান্য পরিমাণে বেশি ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের মাত্রা বেশি হবার কারণেই এটি ঘটে। ১৯৪৯-৫০ সালে জি, ডি, পি-এর পশ্চিম পাকিস্তানি হিস্যা ছিল ৫০.৫%। ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের হিস্যা বেড়ে ৫২.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। এ ব্যবধান ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ আরো প্রসারিত হয়ে পাকিস্তানের জি, ডি, পি-তে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ দাঁড়ায় ৫৭.৪%।

কাঠামোগত পরিবর্তনে ভিন্নতাঃ-এসব আঞ্চলিক বৈষম্য দেখিয়ে দেয় যে, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০ -এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জি, ডি, পি পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে দ্রুততার সঙ্গে বর্ধিত হয়। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ১.৯% -এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হারের গড় ছিল ২৭%। ষাটের দশকে এ ব্যবধান আরো বেড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের ৪.৩% -এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.৪%-এ।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতির এ দ্রুততর বিকাশের হার পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির সঙ্গে তুলনায় উচ্চতর হারে বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বৈচিত্র্য আনয়নের ফল। ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের ক্ষেত্রে শিল্পের হিস্যা ৭% থেকে ১০%-এ উন্নীত হয়। একই সময়ে শিল্পখাতের মধ্যে বৃহৎ শিল্পের হিস্যা দাঁড়ায় ৪১% থেকে ৭২%। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫% থেকে ৪৩%। পাকিস্তানের উভয় অংশে শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এভাবেই ঘটেছিল। ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোৎপাদন ৩২ কোটি থেকে ৬৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায় কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বৃদ্ধি পায় ৮৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৮০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায়। এ থেকেই বোঝা যায় যে, শিল্পের বিকাশ পাকিস্তানের উভয় অংশে ঘটলেও পঞ্চাশের দশকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ব্যবধান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে যায়।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতির দ্রুততর উন্নতি ও কাঠামোগত বৈচিত্র সৃষ্টি ষাটের দশকেও অনুরূপ বৈষম্যকে স্থায়ী রাখার পরিবেশ তৈরী করে। এ একই সময়ের মধ্যে ১৯৬৯-৭০ নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের জি.ডি.পি-তে শিল্পের হিস্যা ১৬% -এ বর্ধিত হয়, পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় ৮.৯%।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য (টাকার অঙ্কে)

সন	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত (২-১) $\frac{(২-১)}{২} \times ১০০$
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

সারণী-৩৪

পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের রিপোর্ট (পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের রিপোর্ট)

রপ্তানি খাতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় ১৯৫৫-৬০ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি বাণিজ্য পশ্চিম পাকিস্তানি রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮.৬%। ১৯৬০-৬৫ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানির হিস্যা ৪০.৫%-এ বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

পায়। ১৯৬৫-৭০ সালের তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক রপ্তানির পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানির পরিমাণকে অতিক্রম করে ৫০.২% এ দাঁড়ায়।

পূর্ব পাকিস্তান শুধু যে রপ্তানির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছিল তা-ই নয়, এর রপ্তানি কাঠামো গোটা পাকিস্তানী শাসনামলে অত্যধিক পরিমাণে পাট নির্ভর থেকে যায়। ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৮-৫৯ -এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আন্তর্জাতিক ও আন্তঃ আঞ্চলিক রপ্তানি বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের হিস্যা ছিল ৭৬.১ শতাংশ। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পাটের উপর পূর্ব পাকিস্তানের নির্ভরশীলতা সামান্য পরিমাণে হ্রাস পায় এবং মোট আঞ্চলিক রপ্তানির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের হিস্যা দাঁড়ায় ৬৯.৫ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে, গোড়ার দিকে বিদেশে পাকিস্তানের মোট রপ্তানির ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির হিস্যা ছিল ৯০.৫ শতাংশ। আরো সাম্প্রতিককালে এটা ৯১.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি কাঠামোর মধ্যে যে পরিবর্তন আনা হয় সেটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানমুখি পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে কাঁচা তুলা, সুতা ও সুতিবস্ত্রের উপর তার যে নির্ভরশীলতা ছিল সেটার অবসান ঘটে।[৯]

জীবন যাত্রা মানের বৈষম্যঃ-পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থনীতির অধিকতর দ্রুত উন্নতি ও বহুমুখীকরণ অনিবার্যভাবে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। উপরিউক্ত সারণীতে মাথাপিছু আয়-বৈষম্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দেখা যায়, মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে চূড়ান্ত ও আপেক্ষিকভাবে বেড়ে যায় ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে। ১৯৫০ এর দশকে বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটে ৫০ শতাংশ এবং ১৯৬০ এর দশকে তা প্রায় দ্বিগুন হয়ে যায়। ১৯৫৯-৬০ সালে বৈষম্য ছিল ৩২.৫ শতাংশ, ১৯৬৯-৭০ সালে এটা দাঁড়ায় ৬১ শতাংশে।

কেউ কেউ বলেছেন, এসব হিসাবে উচ্চহারের ও ক্রমবর্ধমাণ বৈষম্যকে কম করে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মাথাপিছু আয়ের হিসাব তৈরী করার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের টাকার আপেক্ষিক কম ক্রয় ক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয় নি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য চাল ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান খাদ্য গমের মূল্যের তারতম্য লক্ষ্য করলেই এ বৈষম্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের ক্যালোরিযুক্ত চালের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি পড়ে যায়। এ সত্যটি অনুভব করেন পশ্চিম পাকিস্তানের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক। ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন এক টন চালের দাম ছিল ৫১৮ টাকা, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে তার দাম ছিল ৩৩৪ টাকা। ঐ সময় এক টন গমের দাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ৫১৭ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে তার দাম ছিল ২৬৭ টাক। এ সত্যের ভিত্তিতে মাহবুবুল হক আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের হিসাবটা নতুন করে তৈরী করেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৯-৬০ সালে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে ৬০ শতাংশে দাঁড়ায়। জনাব হক দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত পদ্ধতির হিসাবে এ বৈষম্যটা ৬০ শতাংশের স্থলে মাত্র ২৭ শতাংশ হয়। ১৯৬৯-

---

৯। রেহমান সোবহান বাংলাদেশের অভ্যুদয়-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য (ঢাকা-১৯৯৪), পৃষ্ঠাঃ-২৪-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এক মণ চালের দাম ছিল ৪২ টাকা ২৭ পয়সা আর পশ্চিম পাকিস্তানে এক মণ গমের দাম ছিল মাত্র ২২ টাকা। তখন যদি মাহবুবুল হকের পদ্ধতিতে হিসাব করা হতো তাহলে বৈষম্য পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৃদ্ধি পেয়ে ৬১ শতাংশে পৌঁছতো।

মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের সাথে সাথে অগ্রসর হয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, সেবা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যাপারে বিরাজমাণ বৈষম্য। এক হিসাবে দেখা যায় যে, কৃষিজাত দ্রব্যাদি ভোগের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে বৈষম্য তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়, যদিও অপরিশোধিত ও পরিশোধিত চিনির চাহিদা পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি এবং কালক্রমে এ বৈষম্য বেড়ে চলে। অত্যন্ত স্থূল বৈষম্য সৃষ্টি হয় কারখানাজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। কাপড়, কাগজ, সিগারেট, দিয়াশলাই ও বিদ্যুৎ শক্তির মাথাপিছু ব্যবহারের মাত্রা পশ্চিম পাকিস্তানে লক্ষ্যণীয়ভাবে অনেক বেশি। এতে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর হারে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি তথা শিল্পায়নের দ্রুততর গতি প্রতিফলিত হয়। এ বৈষম্য বছর বছর বেড়ে চলে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের গৃহস্থালির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত জরিপ রিপোর্টে প্রাপ্ত মোটামুটি মাথাপিছু ভোগের প্রবণতাগুলোর দিকে তাকালে পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দ্রুততর গতিতে শিল্পায়ন সংক্রান্ত বক্তব্যটি আরো সুদৃঢ় হয়। এতে দেখা যায় যে, ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় ১৯৬০ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে।

পণ্য	মাথাপিছু পরিমাণের ইউনিট	১৯৫১/৫২		১৯৫৯/৬০		১৯৬৩/৬৪	
		পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম
১। খাদ্য শস্য	প্রতি আউন্স পি. ডি	১৪.৯	১৫.৭	১৬.৫	১৫.২	১৬.৮	১৭.৪
২। চিনি	গ্রাম আউন্স পি. এম	২৪.৫	৪৩.৭	২১.২	৭৫.৭	১০.২	৩৮.৪
৩। চা	গ্রাম আউন্স পি. এম	০.১৩	০.৬	০.১৩	১.৩	০.১৬	১.১২
৪। দিয়াশলাই	না. পি. ওয়াই	৭.০	১০.০	১৩.০	১৬.০		
৫। কাপড়	গজ পি. এ	১.৭	১.৪	৩.০	৯.০		
৬। সিগারেট	না গ্রাম পি. এ	৫.০	৭৬.০৯	৩৩.০	১৮৩.০		
৭। কেরোসিন	গ্যালন পি. এ	০.৫	০.৫	০.৬	১.৯		
৮। কাগজ	পাউন্ড পি. এ	০.২	০.৫	০.৩	১.৪		
৯। দুধ-মাখন	পাউন্ড পি. এম			১৯৬১			
				৩.৭	৯.৭	২.১	৮.৭
১০। গরু,খাসির মাংস ও মাছ	পাউন্ড পি. এম			৩.১	০.৭	০.৪	১.৭
১১। গৃহস্থালী টাকায় মাসিক ভোগ্য ব্যয়		১৯৬০		১৯৬৩/৬৪		১৯৬৬/৬৭	
		১২১.৯	১৪৩.৮	১২৩.২	১৭০.২	১৫১.৫	২১১.৪
১২। বৈষম্য% সূচক পশ্চিম পূর্ব (*১০০) পূর্ব		১২১.৯ ২৬.৬	১৪৩.৮	১২৩.২ ৩০.৮	১৭০.২	১৫১.৫ ৪০.০০	২১১.৪

সারণী-৩৫

১০। মোহাম্মদ সোবহান বাংলাদেশের অভ্যুদয়-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য (ঢাকা-১৯৯৪), পৃষ্ঠা:-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্য দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্যের অনুরূপ বৈষম্য দেখা দেয় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদিতে সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হাসপাতাল, মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ও ডিসপেনসারির সংখ্যা এবং ডাক্তার ও নার্সদের সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি এটা মেনে নিলেও দেখা যায় যে, এ অঞ্চলের জনগণের জন্য চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অত্যন্ত কম এবং এ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বছরের পর বছরব্যাপী প্রায় কিছুই করা হয় নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির অনুপাত ঐতিহ্যগতভাবে বেশি ছিল কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার সর্বস্তরে ছাত্র সংখ্যার অনুপাত বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক ও বাহ্য অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বৈষম্যঃ-

বিষয়	পরিমাপের ইউনিট	১৯৫১-৫২		১৯৫৯-৬০		১৯৬৭-৬৮	
		পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১. বিদ্যুৎ	কিলোওয়াট পি, এ	০.৫	৮.৬	১.৬	২৮.৮	৩৭৮ মেগাওয়াট (১৯৫৯-এর ডিসেম্বরে মোট জেনারেটিং ক্যাপাসিটি	১৫৫৯ মেগাওয়াট
২.রেলওয়ের রুট মাইলেজ	মাইল	১৬৮২	৫৩১৬	১৭১৪	৫৩২৭	১৭১২	৫৩৩৪
৩.রোড মাইলেজ	মাইল	৪০৫	১৭১৫২	১৯৪০	১৯৬৮৪	২৫৮৮	২২৫০৮
৪.মোটর গাড়ীর সংখ্যা				১৪৪১০	১০৯২২৮	৫৬২৮৫	২৫৯৩৯৫
৫.প্রদত্ত রেডিও লাইসেন্স		৮৮৪৮	৭০৫১৩	৩৭৭১৩	২৯৩৬০৭	৩৫৮২৪১	৭৩৮২১৫
৬.হাসপাতাল বেড		--	--	৪৯৭৩	২২১০০	৬৯৮৪ (১৯৬৬ সালে)	২৬২০০ (১৯৬৬ সালে)
৭. ডাক্তার		--	--	৫৪৯২	৬১৩২	৮৮১০০(১৯৬৯ সালে)	১৩১০০০ (১৯৬৯ সালে)
৮. প্রাইমারি স্কুল		২৯৬৩৩	৮৪১৩	২৬৫১৩	১৭৯০১	২৮২২৫	৩৩২৭১
৯. প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র ভর্তি (মিলিয়নের হিসাবে)		২.০২	০.৫৪	৩.১৮	১.৫৫	৪.৩১	২.৭৪
১০.প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক		৭৫৬২৪	১৭৮২০	৭৮৪৬২	৪৪৮৪৮	৯৭২৫৬	৭৫৬৯৭
১১. মাধ্যমিক স্কুল		৩৪৮১	২৫৯৮	৩০৫৩	৩০৪৩	৪৩৯০	৪৫৬৩

Dhaka University Institutional Repository

১২. মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা (মিলিয়নের হিসেবে)		০.৫২৬	০.৫০৮	০.৫৩০	০.৯১২	১.০৫৭	১.৫২৯
১৩. মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা		৭৪৩৬২	১৮৮৪৮	২৩৫৭১	৩১৩৫৫	৩৮২৮৩	৫৬২২৮
১৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি		১৬২০	৬৫৪	৩৯৭০	৫০৮৪	৯৯৮৪	১৪৪২৫

সারণী-৩৬ [১১]

১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা, রেলপথ, মোটরগাড়ি ও ব্যবহারাধীন রেডিওর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট পরিমাণে বেশি। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে এসব বৈষম্য আরো ব্যাপক হয়। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা ১০ গুণ বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে রাস্তার দৈর্ঘ্য তখনো ২০ হাজার মাইলের বেশি থেকে যায়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের রাস্তায় ২ লাখের বেশি মোটরগাড়ি চলাচল করতে থাকে। এ বৈষম্য অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের নদীমাতৃক প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা ও যানবাহন বৃদ্ধির তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের নদীপথের অনুরূপ সম্প্রসারণ ঘটেনি। স্থায়ীভাবে নাব্য নদীপথ মাইলের হিসেবে ১৯৫৯-৬০ সালে ছিল ২৬৬৮ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তা দাঁড়ায় ৩৩৫২ মাইল।

খাত	সময়কাল	মোট আয়	মোট ব্যয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
বৈদেশিক মুদ্রা আয়	১৯৪৭-৬৭ সাল	৩৯৯৯ কোটি	---	২২৪০ কোটি	১৭৫৯ কোটি
শাসন খাতে ব্যয়	১৯৪৭-৬১	--	২২১৬ কোটি	২৬৯ কোটি	১৯৪৭ কোটি
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	১৯৫০-৭০	--	৭৫০৯ কোটি	২১১৪ কোটি	৫৩৯৫ কোটি
সামরিক খাতে ব্যয়	১৯৪৭-৬৯	--	২৪৪৪ কোটি	২৪৪ কোটি	২২০০ কোটি
মাথাপিছু ব্যয়	১৯৪৭-৫৫	--	২৩৮ কোটি	৩৭ কোটি	২০১ কোটি

সারণী-৩৭ [১২]

১১। রেহমান সোবহান বাংলাদেশের অভ্যুদয়-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য (ঢাকা-১৯৯৪), পৃষ্ঠাঃ-৭৫।
১২। দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৯ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

নানা প্রকার বৈষম্য থেকে বাঙালীদের বিশ্বাস জন্মে যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ ভোগ করে, উন্নততর স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিক্ষা লাভ করে, উন্নততর যানবাহন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাসহ অধিকতর উন্নত পরিবেশে বাস করে। এ বিশ্বাস তাদের আপেক্ষিক বঞ্চণার ধারণাকে তীব্র করে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানসমূহ অধিকাংশ বাঙালীর এ বিশ্বাসকেই শুধু বদ্ধমূল করে যে, স্বাধীনতার সুযোগগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরাই অনেক বেশি পরিমাণে ভোগ করে।

বৈষম্য এবং রাষ্ট্রের ভূমিকাঃ-

অঞ্চলসমূহের উত্তরাধিকারঃ-পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক বিশ্বাস জন্মে যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের মূলে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতদুষ্ট নীতি ও বরাদ্দমূলক সিদ্ধান্তসমূহ। এ অভিমত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক কাঠামো, প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা ও বাজার শক্তিগুলোর অবদানকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের উপর কিছু বেশি ক্ষমতা আরোপ করে। কাঠামোগত উত্তরাধিকার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল ছিল না, যদিও রাস্তাঘাট, রেলপথ, সেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাসহ তার ছিল একটা উন্নততর অবকাঠামো। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বৃষ্টি হতো অনেক বেশি পরিমাণে, এখানকার জমি ছিল অধিকতর উর্বর এবং এখানে ছিল নদী পথে মালামাল ও যাত্রী পরিবহনের একটি বিশেষ উন্নত ব্যবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি সম্ভাবনা পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল বলে বিশ্বাস করার কোন কারণই ছিল না। যদিও জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানের ভূমির উৎপাদন ক্ষমতাও ছিল বেশি। শিল্পক্ষমতার দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের মতোই শোচনীয় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আর কিছু না থাকলেও একটি অনেক উন্নত গ্রামীণ শিল্পাঞ্চল ছিল। তাঁত শিল্প এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের একটি বড় অংশের বস্ত্রের যোগান দিতে পারতো। শিক্ষা সম্পদের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে নিকৃষ্ট ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের স্তর এখানে উৎকৃষ্টতর ছিল, যদিও পশ্চাৎপদতার মাত্রায় তেমন কোন ইতর বিশেষ ছিল না।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীসমূহে অফিসার-কর্মচারী, উচ্চ পদাধিকারী প্রশাসক, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সংখ্যা ও অবস্থানের দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান সুস্পষ্টভাবে বেশি লাভবান হয়। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ছিল ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তান যে সশস্ত্র বাহিনীগুলো পায় সেগুলো ছিল প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে গঠিত। অনেকগুলো ক্যান্টনমেন্ট এবং অর্ডন্যান্স ডিপোর অবস্থানও ছিল সেখানে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্রের আঞ্চলিক উৎপত্তিস্থল- শতকরা কতজন বাঙালী

বিষয়	সেনাবাহিনী	বিমান বাহিনী	নৌবাহিনী
১। সামরিক সংস্থাপনা (১৯৬৩)			
(ক) কমিশন্ড অফিসার	৫	১৭	১
(খ) জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার	৭.৪		
(গ) ওয়ারেন্ট অফিসার		১৩.২	
(ঘ) অন্যান্য র‍্যাঙ্ক	৭.৪	২৮.০	
(ঙ) শাখা অফিসার			৫
(চ) চীফ পেটি অফিসার			১০.৪
(ছ) পেটি অফিসার			১৭.৩
(জ) লীডিং সীম্যান ও তার নীচে			২৮.৮
২। আমলাতান্ত্রিক সংস্থাপনা (১৯৬৬)		পূর্ব	পশ্চিম
কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটে প্রথম শ্রেণীর অফিসার		১৭০	৬৩১
পশ্চিম-পূর্ব বৈষম্য $\left[\frac{WP-EP}{EP} X১০০\right]$			২৭১
৩। ব্যবসায়ী শিল্পপতি (১৯৫৯)		১১% (স্থির পরিসম্পাতের শতকরা হিসেবে বাঙালী মুসলিম ও বাঙালী হিন্দু মিলিয়ে)	

সারণী-৩৮ [১৩]

বাজার শক্তিগুলোর ভূমিকাঃ- উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের হাতে যে অসমঞ্জস্য কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়, তা উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে বাজার শক্তিসমূহের সীমাবদ্ধতাকে আবারো প্রকটিত করে তোলে। এ কথা বার বার বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারের আকার বড় হওয়ায় সেখানে অর্থনৈতিক বিকাশে গতি সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ সালের জি.ডি.পি -এর হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের জি.ডি.পি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছুটা বেশি (পূর্ব পাকিস্তানে ১২৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ, পশ্চিম পাকিস্তানে ১২০৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা)। জি.ডি.পি-এর আকারই প্রাথমিকভাবে বাজার স্থির করে, বাজারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের করাচীতে অবস্থান, তার নিরাপত্তা ও বেসামরিক খাতে ব্যয়, চাকুরি ইত্যাদিকে যুক্ত করা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজার সম্ভাবনা কিছু পরিমাণে বেশি দাঁড়ায়। তবে পূর্ব পাকিস্তান রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস থেকে যায়। ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে অর্জিত সকল বৈদেশিক মুদ্রার ৫১.৫% আসে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি থেকে।

এর বিপরীতে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে গোড়ার দিকের বছরগুলোতে অনিয়ন্ত্রিত আমদানির সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান সকল আমদানির ৭০% গ্রাস করে। এতে দেখা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি ক্ষমতা বেশি। তবে আমদানির চাহিদা গড়ে ওঠে

১৩। রেহমান সোবহান বাংলাদেশের অভ্যুদয়-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য (ঢাকা-১৯৯৪), পৃষ্ঠাঃ-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

যতোটা না সমষ্টিগত চাহিদা থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি আয়ের বন্টন থেকে। এভাবে মনে হয় পশ্চিম পাকিস্তানে উচ্চতর আমদানি চাহিদা সম্পন্ন অধিকতর সচ্ছল মানুষের একটা বৃহত্তর শ্রেণী রয়েছে। তদুপরি, পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা খাতে ক্রয়, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য ব্যয় এবং কেন্দ্রের করাচীতে অবস্থান -এগুলো আমদানিগ্রাসী। জনগণের চাহিদা, দাবি ও উন্নয়নের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে এভাবে ক্ষমতা-কেন্দ্রের অবস্থান ও আয়ের ভিত্তিতে আমদানি চাহিদা নির্ধারিত হতে দেয়া ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান অর্জনকারী পূর্ব পাকিস্তান হলেও তার প্রধান ব্যবহারকারী হতে দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানকে।

তখন থেকে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, উদার আমদানির এ পর্যায় চলাকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পুঞ্জীভূত পাকিস্তানের ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের হিস্যা এবং তার বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হ্রাস পায়। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার উপরও কিছু কাল ধরে খুব বেশি চাপ পড়ে এবং টাকার মূল্যমাণ বৃদ্ধি করতে হয়।

ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বসতি স্থাপনকারী উদ্বাস্তু বণিকশ্রেণী আমদানি বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া দখল কায়েম করে এবং এ বাণিজ্য থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। এসব মুনাফাই পরে ১৯৫০ -এর দশকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়নে বীজ-পুঁজি যোগায়। শিল্পায়নের এ প্রক্রিয়াকে কঠোরভাবে আমদানি নিরোধ ও মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সংরক্ষণ দিয়ে জোরদার করে তোলা হয়।

এটা সুস্পষ্ট যে, কিছুটা উন্নততর বাহ্যিক অবকাঠামো, কেন্দ্রীয় সরকার ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সদর দপ্তরের উপস্থিতি, পশ্চিম পাকিস্তানে বসতি স্থাপনের ইচ্ছা নিয়ে আগত উদ্বাস্তু পেশাজীবী ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের বৃহত্তর অংশের আকস্মিক উপস্থিতি ইত্যাদি ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তান উত্তারাধিকার সূত্রে কতিপয় নিশ্চিত সুবিধা লাভ করে। ১৯৪৯-৫২ কালপর্বে আমদানি উদারকরণের পর্যায়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে বিপুল পুঁজি সঞ্চিত হয়। ঐ পর্যায়ে পাকিস্তান অবাধ অর্থনীতি গ্রহণ করলে হয়তো পশ্চিমপাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এগিয়ে যেতো। কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে দেখা যায়, কোরীয় যুদ্ধের দরুণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার আকস্মিক অবসানের পরে বাজার নয় বরং রাষ্ট্রই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে কোথায় কি পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ ও অর্থনৈতিক তৎপরতা চলবে সেটাকে প্রভাবিত করার প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ সরাসরি রাষ্ট্রীয় নীতির এখতিয়ারের ছিল। বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্র কর্তৃক বা প্রদেশ কর্তৃক বিতরিত হতো, ওটা কোন অঞ্চলে ব্যয় করা হবে, কোন খাত অগ্রাধিকার পাবে এবং প্রায় ঐ গোটা সময়টায় বৈদেশিক মুদ্রা পেয়ে কোন্ কোন্ ব্যক্তি লাভবান হবেন এসবই রাষ্ট্রীয় নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটা শিল্পায়নের স্থান ও গতিপ্রকৃতি, তাকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা কোন অঞ্চলে কতটুকু রয়েছে এবং আমদানি ও পুঁজি সঞ্চয়জনিত চলতি ভোগের পরিমাণ কোন অঞ্চলে কতটা হবে এসবকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। পাকিস্তানের ইতিহাসের পুরো সময়টায় টাকার অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারাই এসব করা সম্ভব হয়। টাকার মূল্যবৃদ্ধি পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিখাতকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্থ করেনি, বরং আমদানিকারক কিম্বা শিল্পপতি হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা হস্তগত করাকে উৎসাহিত করে। এমনি করে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইচ্ছামতো সম্পদ ও অনুগ্রহ বন্টনের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়। বৈদেশিক সাহায্য বন্টনের সিদ্ধান্তগুলোও প্রধানত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই থেকে যায়।

সরকারি ব্যয়ঃ-১৯৫৯-৭০ কালপর্বে রাজস্ব থেকে পূর্ব পাকিস্তান সকল ব্যয়ের মাত্র ২৩ শতাংশ পায়। পরবর্তী সময়ের মধ্যে এই প্রবণতার কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থিতি কোথায় সেটা বিবেচনা করলে আঞ্চলিক ব্যয়ের নমুনাটা সম্পূর্ণভাবে বিস্ময়কর মনে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে অবস্থান করে করাচীতে পরে ইসলামাবাদে। তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ার অর্থ ছিল যে, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় প্রধানত সেখানেই হতো। সশস্ত্র বাহিনীসমূহের গঠনে দেখা যায় যে, সেনাবাহিনীতে জওয়ানদের মধ্যে ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৭.৪ জন, বিমান বাহিনীতে ২৮ জন এবং নৌবাহিনীতে ২৮.৮ জন। অফিসারদের অনুপাত ছিল আরো নিম্নে। আমলাদের মধ্যে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রীয় অফিসারদের শতকরা মাত্র ৩০ জন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানী। কেন্দ্রীয় সরকারের নিম্নতর পদের চাকুরিতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল আরো কম। এসব কর্মচারীরা ছিল প্রধানত করাচীবাসী।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য ব্যয়, ষ্টোরগুলোর জন্য কেনাকাটায় ব্যয়, আবাসিক ভবনাদি ও দপ্তরসমূহের যেসামরিক বিনির্মাণের ব্যয়, বৈদ্যুতিক শক্তি, টেলিযোগাযোগ ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ব্যয় প্রধানত করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। অনুরূপ কেন্দ্রীয় ব্যয় দ্বারাই গড়ে ওঠে করাচী, রাওয়ালপিন্ডি এবং পরে ইসলামাবাদে একটি সম্পূর্ণ নতুন জাতীয় রাজধানী। এসব ব্যয়ের দরুন সৃষ্ট নিয়োগের বেশিরভাগও পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে চলে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরিউক্ত ব্যয়সমূহ পশ্চিম পাকিস্তানে পণ্য দ্রব্যাদির ও জনসেবামূলক ব্যবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি করে বেসরকারি অর্থনৈতিক তৎপরতাকে জোরদার করে তোলে।

বাঙালীরা রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এ গুরুতর অসমতাকে পাকিস্তানের দুই অংশের অসমতা স্থায়ীকরণের নিয়ামক কারণ রূপে দেখে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে প্যারিটি বা সমতার দাবি, নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর চট্টগ্রামে এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানাদির অংশ বিশেষ পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরের দাবি কেবল ক্ষমতা, চাকুরি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতায় অংশীদার হবার আকাঙ্খা থেকেই ওঠেনি। ঐ দাবিগুলো উঠেছিল কেন্দ্রীয় সরকারে সম্ভাব্য ব্যয়ের সুফল লাভের আশায়। প্রশাসন ও সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরির জন্য বাঙালীদের যোগ্যতা কম-এ অভিমত বাঙালীরা কখনো মেনে নেয়নি। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের মতো উচ্চতর পদের প্রথম শ্রেণীর চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা প্রবর্তন, আদিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান করাচীতে হওয়ার দরুন সৃষ্ট অসমতা ও বিভাগকালে ভারত সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অসমতাকে কখনো দূর করতে পারেনি। সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালীদের নিয়োগ বৃদ্ধির

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে দৈহিক সামর্থ সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা হয়। অথচ স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীসমূহের বিকাশ প্রমাণ করে যে, সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরিতে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বাঙালীর কোন অভাব ছিলনা এবং নিয়মিত উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং শরীরচর্চা যে কোন জাতিসত্তার দৈহিক স্বাস্থ্য ও যোগ্যতা বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে।

উন্নয়ন ব্যয়ঃ- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের মূল কারণ থেকে যায় সরকারি উন্নয়ন ব্যয় বন্টনে পক্ষপাত। পাকিস্তানের শুরু থেকেই জাতীয় সংসদে এ মর্মে প্রশ্ন উঠতে থাকে যে, সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান তার প্রাপ্য হিস্যার চাইতে কম পাচ্ছে। ১৯৫০-৫৫ সালের প্রাক পরিকল্পনা আমলে সরকারি উন্নয়ন ব্যয়ের মাত্র ৭০ কোটি টাকা পূর্ব পাকিস্তানে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান পায় ২০০ কোটি টাকা। সরকারি ব্যয় বরাদ্দের পিছনে কোন কৌশলগত চিন্তা ছিলনা- একথা বলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্ব পাকিস্তানকে সরকারি ব্যয়ের শতকরা মাত্র ৩৬ ভাগ প্রদান করা হয়। আদায়কৃত ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আরো খারাপ হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারি ব্যয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ পায় পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৫৬ সালে বাঙালী অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমালোচনা করেন। তাঁরা শুধু সরকারি সম্পদের অধিকতর পক্ষপাতশূন্য বন্টনই নয়, পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বতন্ত্র উৎপাদনকারী ও ভোক্তা ইউনিটরূপে গণ্য করারও দাবি তোলেন। তাঁরা পাকিস্তানকে একটি অখন্ড পরিকল্পনা-সত্তা হিসেবে না দেখে দুটো অর্থনীতি হিসেবে গণ্য করার এবং দুই অর্থনীতির জন্য দু'টি পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলেন।

	পূর্ব পাকিস্তান					পশ্চিম পাকিস্তান				
	রাজস্ব	মোট	উন্নয়ন সরকারি	খেলয়-কারি	মোট সরকারি (১+৩)	রাজস্ব	রাজস্ব মোট	সরকারি	উন্নয়ন খেলয়-কারি	মোট সরকারি (৬+৮)
সন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৯৫০/৫১	১৭১০	১০০০	৭০০	৩০০	২৪১০	৭২০০	৪০০০	২০০০	২০০০	৯২০০
১৯৫৪/৫৫										
১৯৫৫/৫৬	২৫৪০	২৭০০	১৯৭০	৭৩০	৪৫১০	৮৯৮০	৭৫৭০	৪৬৪০	২৯৩০	১৩৬২০
১৯৫৯/৬০										
১৯৬০/৬১	৪৩৪০	৯৭০০	৬৭০০	৩০০০	১১০৪০	১২৮৪০	২৩৭১০	১৩০১০	১০৭০০	২৫৮৫০
১৯৬৪/৬৫										
১৯৬৫/৬৬	৬৪৮০	১৬৫৬০	১১০৬০	৫৫০০	১৭৫৪০	২২২৩০	৩৫৬০০	১৯৬০০	১৬০০০	৪১৮৩০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯/৭০										
সর্বমোট	১৫০৭০	২৯৯৬০	২০৪৩০	৯৫৩০	৩৫৫০০	৫১২৫০	৬১৯৮০	৩০৬৩০	৩১৬৩০	৮১৬০০
সর্বমোট ব্যয়, পূর্ব পাকিস্তান-সের হিস্যা %	২৩	৩০	৪০	২৩	৩৩					

সারণী-৩৯

পাকিস্তানে আঞ্চলিক ব্যয়, ১৯৫০/৫৭-১৯৬০-৭০ (১০ লাখ টাকার হিসেবে)

পাকিস্তানী নীতিনির্ধারকরা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অর্থ বরাদ্দের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতেন যে, প্রদেশটির পরিশোষন ক্ষমতা কম। তারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারকে পরিকল্পনার অধীনে বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যবহৃত থেকে যাওয়ার বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করতেন। বাঙালী অর্থনীতিবিদ ও প্রশাসকরা যুক্তি দেখাতেন যে, পরিশোষন ক্ষমতা তহবিল প্রদান ও কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারের কাছে কর্তৃত্ব হস্তান্তর -এ দুয়ের উপর নির্ভর করে। পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি অবকাঠামোর আপেক্ষিক দুর্বলতা এমনিতেই পরিশোষনে বাধা সৃষ্টি করে। ১৯৫১-৫২ সালে কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যুতের মাথাপিছু ব্যবহার পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৮.৬ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ০.৫। ১৯৫০-৬০ এর দশকে বিদ্যুৎ শক্তি খাতে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের ফলে ১৯৫৯-৬০ সাল নাগাদ সেখানে বিদ্যুৎ ব্যবহার ২৮.৮ কিলোওয়াটে উন্নীত হয়। সে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুতের মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ অতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ১.৬ কিলোওয়াটে পৌছে। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে মাইলের হিসেবে রাস্তা বৃদ্ধি পায় ৫৬০৩ মাইল, সে তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে রাস্তা বৃদ্ধি পায় ৪৬০ মাইল।

পূর্ব পাকিস্তানের তহবিল ব্যবহারে বিলম্বের কারণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ অনুমোদন প্রক্রিয়া। চারটি পৃথক সংস্থা দ্বারা এখানে যে কোন বড় প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে নিতে হতো। সংস্থাগুলো হচ্ছে প্রাদেশিক উন্নয়ন ওয়াকিং পার্টি, প্রাদেশিক প্ল্যানিং কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ওয়াকিং পার্টি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের পরিচালনা কমিটি। এরকম পরিস্থিতিতে কেন্দ্র যত দ্রুততার সাথে প্রকল্পগুলো অনুমোদন করতো ও পরে তহবিল ছাড়তো সেটা সম্পদের ব্যবহারকে ততোটা প্রভাবিত করতো। তহবিল ছাড়ার পরেও বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিতে বাধা, ইস্পাত ও সিমেন্ট ইত্যাদি উপকরণ (পূর্ব পাকিস্তানে এগুলোর ঘাটতি ছিল) সংগ্রহে বিঘ্ন, বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বল্পতা, যানবাহন ও যোগাযোগের অপর্যাপ্ততা প্রকল্পগুলোকে বিলম্বিত করে। পরিকল্পনায় বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন

১৪। রেহমান সোবহান বাংলাদেশের অভ্যুদয়-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য (ঢাকা-১৯৯৪), পৃষ্ঠাঃ-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

হারের ক্ষেত্রে যে অঙ্ক নির্ধারিত হয়েছে তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। [১৫]

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর ১৯৪৮/৪৯-১৯৬৮/৬৯
(১০ লক্ষ টাকার হিসেবে)

বিষয়	১৯৪৮/৪৯-১৯৬০/৬১	১৯৬১/৬২-১৯৬৮/৬৯	১৯৪৮/৪৯-১৯৬৮/৬৯
১. পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত ব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্য	৪৮৪০	১৪৪৯০	১৯৩৩০
২. জনসংখ্যার অনুপাতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাপ্য হিস্যা	৪৪৩০	২৬৭১০	৩৫১৪০
৩. পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য স্থানান্তর (২-১)	+৩৫৯০	+১২২২০	+১৫৮১০
৪.পূর্ব পাকিস্তানের ব্যালেন্স অব পেমেন্ট	+৫৩৭০	-৯৩৯০	-৪০২০
৫. পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ স্থানান্তর (৩+৪)	+৪৯৬০	+২৮৩০	+১১৭৯০

সারণী-৪০ [১৬]

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক পটভূমিঃ-১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল তার দুই অংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রায় বারশত মাইলের ব্যবধান ছিল। এই দুই অংশের এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিল ইসলাম ধর্ম। পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কিন্তু বহু সংখ্যক অমুসলিম যেমন- হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী নাগরিক পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত। এই অঞ্চলের মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক সমৃদ্ধ ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানের অবাঙালী ক্ষমতাসীন মহল নানা কৌশলে নিজেদের অবস্থা সুদৃঢ় করার চেষ্টা করতে থাকে। তাদেরই প্রভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু হয়। এর বিরুদ্ধে বাঙালীরা তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকে। তখন জিন্নাহ তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে ঢাকায় এসে সদর্পে ঘোষণা করেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। তাঁর এই ঘোষণা এবং পরবর্তী সময় পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণাকে কার্যকরী করার অপচেষ্টার ফলে সারা বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের রক্তে রঞ্জিত হয়

১৫। রেহমান সোবহান বাংলাদেশের অভ্যুদয়-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য (ঢাকা-১৯৯৪), পৃষ্ঠাঃ-৭৮।
১৬। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠাঃ-২৯-৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার রাজপথ। এর মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে নতুনভাবে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়।

বস্তুতপক্ষে ঐ সময়ে পাকিস্তানের রাজনীতি ক্ষমতা দখলের চক্রান্তে পর্যবসিত হয়েছিল। এ সময়কাল ধরে (১৯৪৮-৫২) পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হয়েছে। ফলে পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা সম্পর্কে একটি নতুন চেতনা ১৯৪৮-৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের সময়েই গড়ে উঠতে থাকে।

১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধীদলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নিকট শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। ১৯৫৪ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অপসারণ, ১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে একত্রিত করে এক ইউনিট গঠন, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্যকে উপেক্ষা করে প্যারিটি বা ক্ষমতার ভিত্তিতে পার্লামেন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত এবং ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল এসবই ছিল দেশে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে প্রতিহত করার চক্রান্তের বিভিন্ন দিক।

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জনগণের উপর একটি একনায়কত্বমূলক সংবিধান চাপিয়ে দেন এবং মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। এটা ছিল কার্যত গণতান্ত্রিক খোলসে স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা। এই সংবিধানে জাতীয় গণপরিষদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত করা হয়। বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা চরমভাবে খর্ব করা হয় এবং শাসন বিভাগকে করা হয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ অনুধাবন করতে শুরু করে যে, একমাত্র বয়স্ক ভোটাধিকার এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই তারা দেশের শাসনব্যবস্থায় যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ সময় হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলন বেগবান হয়।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুধাবন করল পূর্ব পাকিস্তান চরমভাবে উপেক্ষিত এবং নিরাপত্তাহীন। এই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফা প্রণয়ন করে। ১৯৬৬ সাল নাগাদ তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্লাটফর্মে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ প্রণীত ছয় দফায় বৃহত্তর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের দাবী উত্থাপিত হয়েছিল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে ১৯৬৮-৬৯ সালের ব্যাপক অসহযোগ ও গণঅভ্যুত্থান বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা নিহত হন। ছাত্রনেতা আসাদ ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে নিহত হন। প্রবল গণআন্দোলনে "আগরতলা ষড়যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

মামলা" প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পাকিস্তানের জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অর্থাৎ বাঙালীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামী নির্বাচনে পরাজিত হয়।

পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ নির্বাচনের ফলাফল অস্বীকার করে সময় ক্ষেপণ করতে থাকে। ২রা মার্চ, ১৯৭১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। এদিন শেখ মুজিবুর রহমান অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। ৩রা মার্চ, ১৯৭১ তারিখে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করেন। ৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালী জাতিকে স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান। অসহযোগ আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। সর্বস্তরের জনগণ সর্বাত্মকরণে এ আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। ২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে গভীর রাতে পাকবাহিনী সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে আসে এবং ঢাকা শহরের নিরস্ত্র জনতার উপর বর্বর হামলা শুরু করে। প্রতিরোধ থেকে শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১৭]

মুক্তিযুদ্ধে রাজবাড়ী জেলাঃ- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাজবাড়ী জেলার জনসাধারণও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে রাজবাড়ী জেলার মানুষ উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

রাজবাড়ী জেলার (তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা) সাধারণ মানুষ (পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা হস্তান্তর না করার পেক্ষাপটে) বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণের পর এখানে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় (মতান্তরে ২৬ শে মার্চ)। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় এ কমিটি। এ সংগ্রাম কমিটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) পলিটিক্যাল কাউন্সিল-এ কাউন্সিলের প্রধান ছিলেন কাজী হেদায়েত হোসেন (তৎকালীন এম, পি, এ) (খ) ডিফেন্স কাউন্সিল-প্রধান ছিলেন ডাঃ এস, এ, মালেক (বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা) মতান্তরে ডাঃ এ, কে, এম, আসজাদ (গ) পাবলিক রিলেসন্স কাউন্সিল-প্রধান নির্বাচিত হন ডাঃ জলিলুর রহমান।

১৭। এ, এফ, সালাহ উদ্দীন আহমদ বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ (ঢাকা-১৯৯১), পৃষ্ঠাঃ-৮৬-৮৭,৯০-৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রাম কমিটির অন্য যে সকল সদস্য ছিলেন তাঁরা হলেন, মোসলেম উদ্দীন মৃধা (সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য), আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী (সাবেক এম, পি), অমল কৃষ্ণ চক্রবর্তী (তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা), এম, এ, মোমেন (বাচচু), কমল কৃষ্ণ গুহ (বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা)। সংগ্রাম কমিটির পাশাপাশি গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। তৎকালীন ছাত্রলীগ ও ছাত্রইউনিয়ন এই পরিষদে যৌথভাবে কাজ করে। এই সংগঠনের নেতারা ১০ মার্চ, ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা মুজিব বিল্ডিং -এ উত্তোলন করে। (মুজিব বিল্ডিং রাজবাড়ী শহরের প্রাণকেন্দ্রে রেলগেট সংলগ্ন) পরবর্তীকালে এই বিল্ডিং-এর মালিক মুজিবুর রহমানকে বিহারীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। ৮ মার্চ, ১৯৭১ থেকে মূলতঃ রাজবাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের বিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়। এই সময় এখানে আনসার ট্রেনিং ক্যাম্পে আনসারদের নিয়মিত ট্রেনিং চলছিল। রাজবাড়ীতে আনসার এ্যাডজুটেন্ট ছিলেন জনাব আকরাম হোসেন। মোঃ খোরশেদ আলী মন্ডল আনসার কমান্ডার হিসেবে কর্তব্য পালন করছিলেন।

রাজবাড়ী জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ১৬ মার্চ, ১৯৭১ -এ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিল। বৈঠক নিস্ফল হলে ২৩শে মার্চ, ১৯৭১ পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। রাজবাড়ীতে বিভিন্ন সংগঠনের অফিসে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এক্ষেত্রে তৎকালীন ছাত্র নেতারাই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ফকির আবদুল জব্বার, শহীদুন্নবী আলম, ইলিয়াস মিঞা, দুলাল মোল্লা ছাত্রনেতা ছিলেন। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালে ঢাকায় পাক-বাহিনী গণহত্যা শুরু করে। ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সকালে রাজবাড়ীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিষয়ে চিন্তা করতে থাকে। এ সময় রাজবাড়ীতে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর সদস্য আব্দুল বারী মন্ডল (পাক সেনাবাহিনীর বেলুচ রেজিমেন্টের তৎকালীন জেসিও) সক্ষম লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন। তাঁকে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়।

ওয়্যারলেছ যুদ্ধঃ- ৩০ শে মার্চ, ১৯৭১ মহকুমা প্রশাসক শাহ মোহাম্মদ ফরিদ মেহেরপুর থেকে রাজবাড়ীতে ফেরেন। এ দিন রাজবাড়ীর নেতৃবৃন্দ এবং মুক্তিযোদ্ধারা কুষ্টিয়ায় পাকবাহিনীর অবস্থানের কথা জানতে পারে। ঐ দিনই তাঁরা পাকবাহিনীর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কুষ্টিয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের এ দলে আনসার বাহিনীর সদস্যবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকবাহিনীর সঙ্গে তাঁরা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে অনেক পাকবাহিনী হতাহত হয়। রাজবাড়ী জেলার তিনজন আনসার শহীদ হন এবং তিন জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। যে তিনজন আনসার শহীদ হন তাঁরা হলেন জেলার পাংশা থানার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের আব্দুল কুদ্দুস, সদর থানার দাদশী ইউনিয়নের হোসনাবাদ গ্রামের আসমত আলী এবং রামকোল ইউনিয়নের একজন। আহত তিন মুক্তিযোদ্ধা হলেন, সদর থানার মাটিপাড়া গ্রামের খন্দকার আতাউর রহমান, আব্দুর রব ও ওয়াজিউদ্দীন। এই যুদ্ধ ওয়্যারলেছ যুদ্ধ নামে খ্যাত। বেলগাছির বকু চৌধুরী এই যুদ্ধে সর্ব প্রথম পাকবাহিনীর উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর, সরাসরি পাকবাহিনীর সঙ্গে তারা বাংলাদেশের মধ্যে এটিই প্রথম যুদ্ধ বলে অনেকে মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

<u>রাজবাড়ী শহরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণঃ</u>- ১লা এপ্রিল, ১৯৭১ সালে রাজবাড়ীর ছাত্রনেতা নাজিবর রহমান মাইকের ঘোষণার মাধ্যমে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণেচ্ছুদের আমন্ত্রণ জানান। প্রশিক্ষণের স্থান নির্ধারণ করা হয় রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (তৎকালীন গোয়ালন্দ হাই স্কুল) মাঠ প্রাঙ্গণ। সেনাবাহিনীর সদস্য আব্দুল বারী মন্ডল প্রশিক্ষণ দেন। উল্লিখিত ডিফেন্স কাউন্সিল বিভিন্নভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে তা প্রশিক্ষণরত যোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। গোয়ালন্দের মহকুমা প্রশাসক শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদের সঙ্গে (বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য-কার্যক্রম) যোগাযোগ করলে তিনি রাজবাড়ী থানার অস্ত্রাগারের সকল অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেয়ার নির্দেশ দেন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন রাজবাড়ী থানার তৎকালীন আর্মারার মোঃ সিরাজ উদ্দীন খাঁন (গ্রামঃ শ্যামনগর, পোঃ সাতবাড়িয়া, থানাঃ সাথিয়া, জেলাঃ পাবনা)। তিনি অস্ত্র যাকে যাকে দিয়েছিলেন, তাদের নাম এবং অস্ত্রের ধরন সম্বলিত তালিকাটি রাজবাড়ীতে পাকবাহিনী আসার পূর্বেই পুড়িয়ে ফেলেন। অন্যথায় পাকবাহিনী অস্ত্র গ্রহণকারী ও প্রদানকারী সবাইকে হত্যা করতো বলে শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ মনে করেন। সকালে থানায় গিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসা হতো এবং বিকেলে ট্রেনিং শেষে ফেরত দিয়ে আসা হতো। এভাবে ট্রেনিং চলতো প্রথম দিকে।

ট্রেনিং -এর প্রথম দিকে যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ তেমন আশাব্যাঞ্জক ছিল না, তবে নেতৃত্ব প্রয়াসী ছিল প্রায় সবাই। মূলতঃ বার/তের বছরের যুবকেরাই ট্রেনিং -এ অংশগ্রহণ করতে আসে। প্রথম দিনে বিশ/পঁচিশ জন ট্রেনিং -এ অংশগ্রহণ করে। তিন/চার দিন পর পঞ্চাশ জনের মত উপস্থিত হয়। প্রশিক্ষক, তালিকা করে ট্রেনিং শুরু করেন। ট্রেনিং শুরুর সাত/আট দিন পর সেনাবাহিনীর চার/পাঁচ জন সদস্য পালিয়ে এসে ট্রেনিং -এ অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে স্মরণযোগ্য খেলাফত, শুকরি, মুনির।

ট্রেনিং চলাকালে কাজী হেদায়েত হোসেন (এম, পি, এ) আশু ভরদ্বাজ (বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই প্রশিক্ষণ স্থলে আসতেন। আশু ভরদ্বাজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে ও রাজবাড়ীতে যুবকদের প্রশিক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ডাঃ এ, কে, এম আসজাদ ও ডাঃ মালেক ট্রেনিং -এ উপস্থিত থেকে 'First Aid' সম্পর্কে ট্রেনিং দিতেন। ট্রেনিং চলাকালীন সময় রাজবাড়ীর ছাত্র নেতারাও মূল প্রশিক্ষককে উৎসাহ দিতেন এবং সহযোগিতা করতেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দুলাল মোল্লা, ফকীর আব্দুল জব্বার, ইলিয়াস মিএরা, শহীদুন্নবী আলম, তালেব, ডাঃ ইয়াহিয়ার ছেলে কাইউম, ইকবাল প্রমুখ।

যুব নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন, কমল গুহ (বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা), এ, টি, এম, রফিক (খোকা), লুৎফর রহমান (পরবর্তীকালে পুলিশ সুপার) প্রমুখ। ট্রেনিং দিনের বেলায় হতো রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এবং রাতে রাজবাড়ী-ফরিদপুর সড়কের পাশে অবস্থিত মোল্লা বাড়ীর পিছনে পানির ট্যাঙ্কের পাশে।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ীতে বসবাসকারী অসংখ্য বিহারী আন্দোলনের প্রথম দিকে সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দের কাছে এই মর্মে মুচলেকা প্রদান করে যে, তারা কোনভাবেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করবে না এবং বাঙালীদের পক্ষে কাজ করবে। কিন্তু যখন পাক হানাদার বাহিনী রাজবাড়ীতে আসে তখন এ সকল বিহারীরা ব্যাপকভাবে লুটতরাজ ও গণহত্যা শুরু করে।

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে খবর পাওয়া যায় রাজবাড়ী শহরের অনতিদূরে বিহারী অধ্যুষিত নিউ কলোনি বাঙালীরা ঘিরে ফেলেছে বিহারী নিধনের জন্য। এ খবর পেয়ে তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক জনাব আব্দুল বারী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে নিউ কলোনিতে যান। গিয়ে দেখেন বাঙালীরা নানা রকম দেশী অস্ত্র নিয়ে নিউ কলোনি ঘিরে রেখেছে। জনাব বারী তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন এবং বিহারীদের মধ্য থেকে পুরুষ ও যুবকদের আলাদা করে কলোনির পাশে আনা হয়। কলোনির ভিতরে তখন শুধু বিহারী নারীগণ অবস্থান করছিল। আব্দুল বারী বিহারী পুরুষদের বোঝাতে চেষ্টা করেন তারা যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে অবস্থান না নেয়। ধারণা করা হচ্ছিল বাঙালীরা কলোনি আক্রমণ করলে জীবননাসের সাথে লুটতরাজ হবে। এ সময় কাজী হেদায়েত হোসেন অকুস্থলে উপস্থিত হন। আব্দুল বারীর ভূমিকায় তিনি খুশি না হয়ে মন:ক্ষুন্ন হন। কিন্তু কেন তিনি মন:ক্ষুন্ন হন তা জানা যায়নি। ইতোমধ্যে মহকুমা প্রশাসক শাহ মোহাম্মদ ফরিদ পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পরিস্থিতি জানতে চাইলে আব্দুল বারী বিস্তারিত জানান এবং কলোনির মধ্যে তল্লাশী চালানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এস, ডি, ও মুক্তিযোদ্ধা ও পুলিশ দিয়ে কলোনি তল্লাশী করান এবং কলোনির মধ্যে নানারকম গোলা-বারুদ পান। পরে ঐ গোলা-বারুদ নিয়ে সকলে ফিরে যায়।

এ সময় রাজবাড়ী জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ অনেকে ঢাকা থেকে এলাকায় চলে আসছিল। এদেরকে গোয়ালন্দ ঘাট থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ছাত্র-যুব নেতা নজীর আহমদ, ফকীর আব্দুল জব্বার প্রমুখ। অবাঙালী ট্রেন চালক দিয়ে জোর করে ট্রেন চালানো হয়। এ সময় রাজবাড়ী শহর থেকে অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যাচ্ছিল কারণ ঢাকা থেকে আগত লোকজনের মুখে ঘটনা জানতে পেরে তারা খুব ভীত হয় এবং নিরাপত্তার অন্বেষন করতে থাকে।

এ অবস্থায় রাজবাড়ীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। কাজী হেদায়েত হোসেন ও ডাঃ এস, এ মালেকের মধ্যে পুরনো দ্বন্দ্ব ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এ অবস্থার মধ্যেও আব্দুল বারী মন্ডলের তত্ত্বাবধানে বিচ্ছিন্নভাবে ট্রেনিং চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কোন্দলে ট্রেনিং বাধাগ্রস্থ হচ্ছিল। এ সময় কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়মিত আসেনি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেনি। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে কাজী হেদায়েত হোসেন অথবা ডাঃ এস, এ, মালেক আসেন এবং নিজ নিজ নির্দেশমত মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মপন্থা অবলম্বন করতে বলেন। কোন দিন দুলাল মোল্লা আসেন এবং তাঁর নির্দেশে চলতে বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষাটের দশকে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন বিভক্ত হলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দুই ভাগে ভাগ হয়ে। এক ভাগ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থক অন্যভাগ চীন সমর্থক। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীতা করে। ফলে চীন পন্থী বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি এবং তাদের ছাত্রফ্রন্ট স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ছিল না। দুলাল মোল্লা চীন সমর্থক ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি রাজবাড়ীতে স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় থাকলেও পরবর্তীকালে আত্মগোপন অবস্থায় চলে যান। আত্মগোপনে যাবার পূর্বে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক আব্দুল বারী মন্ডলের কাছে তিনি রক্ষিত কাগজপত্র ও গোলা-বারুদ দাবি করেন কিন্তু আব্দুল বারী মন্ডল তা দিতে অস্বীকার করেন। তখন তিনি একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আত্মগোপন অবস্থায় চলে যান। আর ফিরে আসেননি। আত্মগোপনে যাবার পূর্বে কিছু দিন তিনি রাজবাড়ীতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত ছাত্রদলের একটি অংশের মহড়ায় নেতৃত্ব দেন।

দশ/এগার এপ্রিলে গোয়ালন্দে যশোর থেকে আসা ই, পি, আর (বর্তমান বি, ডি, আর)-এর ছোট এক প্লাটুন বাঙালী সৈন্য অবস্থান করছিল। তাঁরা দেশ রক্ষায় জন্য সার্বক্ষণিক তৎপর ছিল। এ সময় একদল মুক্তিযোদ্ধা রাজবাড়ী থেকে গোয়ালন্দে যান পরিস্থিতি সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য। গিয়ে তাঁরা শোনেন ঢাকায় পাকবাহিনী রাজবাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এবং অবস্থানের কথা জেনে গেছে। গোয়ালন্দে অবস্থানরত দুই জন বিহারী এ খবর ঢাকায় পাকবাহিনীকে অবহিত করেছে এবং এছাড়া তারা অন্যান্য খবরাখবর ঢাকায় আদান-প্রদান করে। বার এপ্রিল গোয়ালন্দে অবস্থানরত বাঙালী ই, পি, আর এবং মুক্তিকামী জনতা বিহারীদের উপর হামলা চালায় এবং ঐ দুই জনসহ তিন জনকে (থানার হাবিলদার সহ) হত্যা করে। (একটি সূত্রে জানা যায়, এদিন ই, পি, আর নিরস্ত্র এগারজন বিহারীকে হত্যা করে)। এরপর গোয়ালন্দের মহকুমা প্রশাসক শাহ মোহাম্মদ ফরিদ বিহারীদের জেলখানায় নিরাপদ সেলে আটক রাখেন। এ সময় ঢাকা থেকে আগত লোকজন জানান, অল্প দিনের মধ্যে রাজবাড়ী পাকবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এ সময় রাজবাড়ী প্রায় জনশূণ্য হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা ডাঃ আসজাদের বাড়ী গিয়ে দেখেন, তিনি একটি পাকিস্তানী পতাকা নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্থ অবস্থায় শুয়ে আছেন। তিনি এমন ভঙ্গিতে আছেন যে, পাকিস্তানের সৈন্য এলেই তিনি বুঝিয়ে দিতে পারেন তিনি পাকিস্তানের সমর্থক।

এই অবস্থায় রাজবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের মনে নতুন করে সাহস সঞ্চার করার জন্য শ্রীগুরু হর্টিকালচার ফার্মে (বর্তমান সার্কিট হাউজের পাশে) বাঙ্কার তৈরী করে অবস্থান করে এবং মাইকে জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, পাকবাহিনী রাজবাড়ী আসার একমাত্র রাস্তা, গোয়ালন্দ-রাজবাড়ী রাস্তা। গোয়ালন্দ ঘাটে মুক্তিবাহিনী এবং বাঙালী ই,পি,আর জোয়ানরা শক্ত অবস্থান নিয়েছে। ঐ অবস্থান ভেদ করে রাজবাড়ী ঢোকার মখে শ্রীগুরে মুক্তিযোদ্ধাদের পরাস্ত করে তবেই পাকবাহিনী রাজবাড়ী শহরে ঢুকতে পারবে। এ কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বিশ্বাস করে রাজবাড়ীতে থেকে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দুই দিন পর প্রশিক্ষক আব্দুল বারীসহ মুক্তিযোদ্ধারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন নেতৃবৃন্দ কেউ নেই। জানা যায় সব নেতৃবৃন্দই নিজ নিজ উদ্যোগে শহর ত্যাগ করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াই। এ অনিশ্চিত অবস্থায় প্রশিক্ষক আব্দুল বারী মুক্তিযোদ্ধাদের সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলেন। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই তাও তিনি তাদের জানান। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা রাজবাড়ী শহর ত্যাগ করার পরই শহরের দোকানপাট লুট হতে আরম্ভ করে। এ কাজে বেশ কিছু বাঙালীও অংশ নেয়।[১৮]

রাজবাড়ী শহরের পতনঃ-২১ শে এপ্রিল, ১৯৭১ ভোররাতে মর্টার শেলের শব্দ পাওয়া যায়। জানা যায় পাক-বাহিনী আসছে রাজবাড়ীর দিকে। মেজর চিমার নেতৃত্বে পাক-বাহিনী গোয়ালন্দ ঘাটের পাশ্ববর্তী মমিন খাঁর হাট (গোয়ালন্দ ঘাট থেকে পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে) নামক স্থানে নামে। গোয়ালন্দে তৎকালীন বাঙালী ই, পি, আর, আনসার এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনতা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গাছের খন্ডাংশ এবং অন্যান্য যন্ত্র দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। পাকবাহিনীর সঙ্গে রাত তিনটায় যুদ্ধ শুরু হয়। ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়। ভোর বেলায় পাক বিমান হামলায় মুক্তিবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে আনসার কমান্ডার ফকির মহিউদ্দীন এবং আনসার শহীদুল ইসলাম (গোয়ালন্দ) শহীদ হন। অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। সকাল আটটায় পাকবাহিনী গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছে। তারা গোয়ালন্দে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বাড়ীঘর, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির জ্বালিয়ে দেয়। বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালীকে বেপরোয়া ও নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর পর পথের সবকিছু জ্বালিয়ে দিতে দিতে খানখানাপুর হয়ে বেলা এগারটার দিকে রাজবাড়ী পৌঁছে। রাজবাড়ীতে বাড়ীঘর, ব্যবসায়- প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেয় এবং সন্দেহজনক বহু লোককে হত্যা করে। মুক্তিযোদ্ধারা এই পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন পথে ভারতে চলে যায়। রাজবাড়ীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও ভারতে চলে যায়। ভারতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকে।

রাজবাড়ী শহরের প্রথম শহীদঃ- ২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ সকাল এগারটায় পাক বাহিনী রাজবাড়ী শহরে প্রবেশ করে। এর পূর্বেই শহরের মানুষ গোয়ালন্দের পতন ঘটার খবর জেনে যায়। তারা পরিবার -পরিজনসহ গ্রামের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। প্রায় প্রতিটি বাড়ীতে আলকাতরা দিয়ে ইংরেজী হরফে লেখা হয় 'MUSLIM' শব্দটি এবং কোন কোন বাড়ীতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা নামিয়ে পুনরায় পাকিস্তানী পতাকা উড়ানো হয়।

পাকিস্তানী বাহিনী শহরে আসার সময় রাজবাড়ী শহর প্রায় ফাঁকা। রেলগেটের অদূরে তারা আসলে, প্রথম হাত উঁচিয়ে তাদের গতিরোধ করেন 'নারায়ন' ওরফে 'নারান' নামের একজন পাগল। গতিরোধ করার সাথে সাথে তিনি শ্লোগান দেন 'জয়-বাংলা'। মুহূর্তের মধ্যে একঝাঁক মেশিন গানের গুলি তাঁর বুক ঝাঁঝড়া করে দেয়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

---

১৮ । রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সহজ কথা' ৫ ই এপ্রিল, ১৯৯৬ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ন সব সময় গায়ে বিভিন্ন রং মেখে, ছোট হাফ প্যান্ট পরে শীত-গ্রীষ্ম কাটিয়ে দিতো। শহরের মধ্যেই অধিকাংশ সময় কাটাতো। সব সময় সে টেলিফোন করার ভঙ্গীতে মুখে বলতো-'হ্যালো, লাকসাম-লাকসাম, আখাউড়া-আখাউড়া। এটিই ছিল তাঁর একমাত্র বাক্য। ধারণা করা হয়, এই নারান রেলে চাকুরি করতো। সেই ছিল তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সে চাকুরিচ্যুত হয়। এতে ভীষণ আঘাত পেয়ে পরবর্তীকালে সে পাগল হয়ে যায়।

রামদিয়ার হত্যাকান্ডঃ-১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার রামদিয়া গ্রামটি পাকিস্তান বাহিনী, অবাঙালী বিহারী ও রাজাকার-আলবদরদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গ্রামটি ছিল প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত এবং বেশ কিছু ধনাঢ্য হিন্দু পরিবারের বাস ছিল এখানে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রাজবাড়ী শহর এলাকা ও জেলার অন্যান্য স্থান থেকে অনেক হিন্দু জনসাধারণ এই নিভৃত পল্লী গ্রামে অবস্থান নিরাপদ মনে করে চলে আসে এবং গ্রামবাসীর সঙ্গে গণহত্যার শিকার হয়।

১৯৭১ সাল, (বাংলা ১৩৭৮ সালের ২৫শে বৈশাখ) রবিবার। রাজবাড়ী থেকে বিহারীরা স্কুটারে রামদিয়া গ্রামে আসে। রামদিয়া এলাকার রাজাকার চাঁদ খাঁ ও তার দলের সহযোগিতায় তারা প্রথম অবিনাশ চন্দ্র সাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে। অবিনাশ চন্দ্র সাহা চেয়ারে বসা ছিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করেই তারা অবিনাশ চন্দ্র সাহাকে গুলি করে হত্যা করে। তাঁর চিৎকারে তাঁর ভাইপো খোকন চন্দ্র সাহা এগিয়ে এলে তাকে আটক করে। এরপর অবিনাশ সাহার দুই পুত্র মলয় ও মণীন্দ্রকে হত্যা করে। বিনয় ভূষণ দত্তকে হত্যা করে। আটককৃত খোকন সাহার সমস্ত শরীর চাকু দিয়ে আঘাত করে। খোকন সাহা কোন মতে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে।

অবিনাশ সাহার স্ত্রী ননীবালা সাহা ও পুত্রবধু রেখারানী বাড়ীর পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন এবং এ নৃশংস হত্যাকান্ড দূর থেকে প্রত্যক্ষ করেন। সন্ধ্যায় রেখা রানী ও অন্যান্য জীবিতরা হলুদবাড়িয়া ইন্তাজ উদ্দিনের বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকে জিয়নগাতি গ্রামে সুধীর বিশ্বাসের বাড়ীতে দুই দিন থাকার পর ভারতে চলে যায়। হত্যাকারীরা হত্যাকান্ড ঘটানোর পর সবাইকে এক গর্তে পুতে রাখে। এরপর গ্রামের অন্যান্য বাড়ীতে তারা আক্রমণ চালায়। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়-নিত্য লাল সাহা, বিজয় লাল সাহা, রাধাবণিক দত্ত, মঙ্গল সাহা, বিশ্বনাথ শীল এবং তাঁর স্ত্রী, দেবব্রত সাহা, পরিমল সাহার মা ও স্ত্রীকে। এদের একই সঙ্গে মাটি চাপা দেয়া হয়। এদের গণকবর রয়েছে গ্রামের চন্ডী সাহার বাড়ীতে।

মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সরবরাহকারী সুকুমার সাহা, হরিদাসী সাহা ও তাঁর বাবা হৃদয় নাথ সাহা, উর্মী সাহা, প্রমথ নাথ সাহা, আরতী সাহা-পিতাঃ-যতীন্দ্র নাথ সাহা, প্রমিলা সাহা- পিতাঃ-পূর্ণ চন্দ্র সাহা-এদেরকে হত্যা করে একই গর্তে মাটি চাপা দেয়া হয়। নির্মল শংকর রায় ও তাঁর ভাইকে নৃশংস অত্যাচার করে হত্যা করা হয় ও মাটি চাপা

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয়। ষষ্টি চরন সাহার মা, অমল কুমার সাহা এবং নিরোদ কুমার সাহাকে গুলি করে হত্যা করে তাঁদের বাড়িতেই মাটি চাপা দেয় হয়। এছাড়া নিবারণ সাহাকে তাঁর বাড়ীর উঠানে গুলি করে হত্যা করে।

রামদিয়া গ্রামের গণহত্যায় যাঁরা নিহত হন তাদের মধ্যে অন্যতম রামদিয়া এলাকার জোতদার সন্তোষ সাহা ও তাঁর স্ত্রী। নিজ বাড়ীতে ঢুকে গুলি করে এদের হত্যা করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ গ্রামের বড় বাড়ী নামে পরিচিত বাড়ীটিতে পাবনা, সূর্যনগর সহ বিভিন্ন স্থান থেকে লোক এসে আশ্রয় নেয়। উক্ত বাড়ীর একটি ঘরে সবাইকে আবদ্ধ করে গুলি চালানো হয়। এতে মারা যায় সন্তোষ রায়, শান্তি বালা, কেষ্ট লাল সাহা। এদের সবার বাড়ী পাবনা। জ্যোতিষ চন্দ্র সরকার, গৌর চন্দ্র এখানে মারা যায়। রামদিয়া হাই স্কুলের পিছনের বাড়ীতে এদের গণ কবর। এ একই দিনে বেড়া-ডাঙ্গার সোনা মিঞার ছেলে আজিজুল এর গলাকাটা লাশ নদীতে ভাসতে দেখা যায়। এ দিন হত্যাকান্ডের এক পর্যায়ে কেদার নাথ পালের বৃদ্ধা মা রাজাকারদের কাছে পানি খেতে চাইলে জনৈক রাজাকার তাকে ডাবের খোলায় পানি দিতে যায়, এ সময় রাজাকার ইন্তাজ কোদাল দিয়ে আঘাত করে বৃদ্ধাকে হত্যা করে।

রামদিয়ায় হত্যার সঙ্গে যারা জড়িতঃ-রামদিয়া এলাকার রাজাকার ও সন্ত্রাসী বাহিনীর নেতা ছিল চাঁদ খাঁ। তার দলের সক্রিয় সদস্য ছিল রামদিয়া রেলষ্টেশনের তৎকালীন ষ্টেশন মাষ্টার রোকন উদ্দীন, রমজান খাঁ-পিতাঃ-চাঁদ খাঁ, সবদাল হোসেন, নীর মাহমুদ, বেড়াডাঙ্গার গোলাব রহমান, জমির রিফিউজী, কোরবান রিফিউজী, দক্ষিণ-বাড়ী গ্রামের আব্দুর রব। এদের সহযোগিতায় রাজবাড়ীর বিহারীরা এ নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটায়।

রামদিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফনিভূষণ সাহার বন্ধু ছিল ষ্টেশন মাষ্টার রোকন উদ্দীন। তার কাছে প্রায় ২০০ ভরি সোনা ও প্রচুর পরিমাণ টাকা নিরাপত্তার জন্য তিনি গচ্ছিত রাখেন। ফনিভূষণ সাহা গচ্ছিত মালামাল ফেরত চান। এ জন্য রোকন উদ্দীন পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। এর কয়েক দিনের মধ্যেই পাকিস্তান বাহিনী এ এলাকায় প্রবেশ করে।

চাঁদ খাঁ ও তার দলের হত্যা, লুটপাট ও ধর্ষণঃ- ৩০শে বৈশাখ, শুক্রবার। দুপুর সাড়ে বারটায় গাড়িযোগে রাজবাড়ী থেকে বিহারীরা রামদিয়া এলাকায় আসে। এ সময় চাঁদ খাঁ ও তার দল রাজধরপুরের (বহরপুরের কাছে) পরম চাঁদপুর এলাকার লোকজন নিয়ে রামদিয়া এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় লুটপাট এবং ধর্ষণ শুরু করে। তারা অনেককে হত্যা করে। এ দিন পাকিস্তান বাহিনীর বিশেষ ট্রেন কালুখালী ষ্টেশনে দাঁড়ানো ছিল। পরদিন শনিবার রাতে বিশেষ ট্রেনটি কালুখালী থেকে ভাটিয়াপাড়া লাইনে আসতে চায়। কালুখালী ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার নজরুল ইসলাম তাদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, কালুখালী থেকে ভাটিয়াপাড়া লাইনে ডিজেল ইঞ্জিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এ লাইনে কয়লার ইঞ্জিন নিয়ে যেতে হবে। এদিন নজরুল ইসলাম রামদিয়ার লোকজনকে সতর্ক করে দেয়। পরদিন রোববার রাজবাড়ী থেকে পাকিস্তান বাহিনীর বিশেষ ট্রেন

Dhaka University Institutional Repository

কালুখালী হয়ে রামদিয়া ষ্টেশনে আসে। এদের সাথে পথ প্রদর্শক হিসেবে আসে রাজবাড়ীর কালুবিহারী। সংবাদ পেয়ে চাঁদ খাঁ তার দল সহ ষ্টেশনে যায় এবং পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে।

প্রথমে রামদিয়ার ভাটুপাড়ায় পাকবাহিনী ও রাজাকার বাহিনী প্রবেশ করে। তারা নিত্য লাল সাহা ও বিজয় সাহাকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। নিরাপত্তার জন্য সূর্যনগর, সাতবাড়িয়া (পাবনা), রাজবাড়ী, গোয়ালন্দ, পাঁচুরিয়া, কুষ্টিয়া, ঢাকা, কামারখালী থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক লোক এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্রয় দেয়ার অপরাধে এদের হত্যা করা হয়। এছাড়া হালদার পাড়া, বাজারপাড়া, শালবরাট, নওয়াপাড়া, ঠাকুরনওয়াপাড়া প্রভৃতি গ্রামের অনেক লোককে হত্যা করে। চুনী লাল সাহা, বিনয় কৃষ্ণ দত্ত, জয়দেব পাল, মহাদেব সাহা, সুরেন্দ্র নাথ দত্ত, নিরঞ্জন সাহা, ভূট্টো সাহা, অশ্বিনী হালদার, আনসার বাহিনীর সদস্য আলীসহ অনেককে হত্যা করা হয়। ঠাকুরনওয়াপাড়া গ্রামের ভজরাম চক্রবর্তী, শালবরাট গ্রামের নিতাই চন্দ্র সরকারকে হত্যা করা হয়।

১৯৭১ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে রাজবাড়ী জেলার বেলগাছির কাছে গোপালপুর, দামুকদিয়া, দুর্গাপুর, পদমদী প্রভৃতি গ্রাম এবং রাজবাড়ী শহর থেকে যুবতী মেয়েদের ধরে এনে ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান বিভাগের পরে রেখে যাওয়া ডাঃ নারায়ন পালের বাড়ীর পুরনো দালানে (বর্তমানে রামদিয়া হাই স্কুলের দখলে) অত্যাচার করা হয়। এই দালানে বিহারীরা বাস করতো। রামদিয়া এলাকায় ১৬৫ জনকে হত্যা করা হয়। আহত হয় অসংখ্য, পরে অনেকে মারা যায়।

কল্যাণপুর হত্যাকান্ডঃ- রাজবাড়ী জেলার সদর থানার শহীদ ওহাবপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম। গ্রামটি রাজবাড়ী-ফরিদপুর মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। এই গ্রামে ৭ জুন, ১৯৭১ সালে নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। বিহারী, রাজাকার, আল-বদর মিলে পঁচিশ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে সেদিন হত্যা করে। কল্যাণপুরের পার্শ্ববর্তী টিম্যাকপুরের পাশের গ্রাম রামপুর। এখানে প্রায় একশত পরিবারের বিহারী কলোনি ছিল। এদের অত্যাচারে এলাকার লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ২১ এপ্রিলের আগে এক রাতে বিহারী কলোনি ঘিরে ফেলে। কলোনিতে বসবাসকারী উচ্ছৃঙ্খল সন্ত্রাসীদের হত্যা করার জন্য বেঁধে ফেলে। নীমতলা (তৎকালীন মামুনপুর, বর্তমানে শহীদ ওহাবপুর) ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান আশু রঞ্জন সেন, শান্তি কমিটির নেতা ফেলু সেখ এবং তৎকালীন আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন কমিটির ওয়ার্ড সভাপতি (বর্তমান থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক) ওসমান খানের হস্তক্ষেপে ওরা বেঁচে যায়। পরে ওখানকারই এক বিহারী গোয়ালন্দমোরে ওমর আলীর দোকানের সামনে ওসমান খানকে হত্যার চেষ্টা করে এবং এই বিহারীরাই তৎকালীন মামুনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আশু রঞ্জন সেনের বাড়ীতে গণহত্যা চালায় এবং বহু লোককে হত্যা করে।

Dhaka University Institutional Repository

৭ জুন, ১৯৭১ তারিখে টিম্যাকপুর গ্রাম থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া যায়। কল্যাণপুর (বর্তমান বাজার) থেকে মানুষ দৌড়ে গিয়ে বলে বিহারীরা যাকে যেখানে পাচেছ সেখানেই হত্যা করছে। এ দিন বিকেলে সৈয়দ খামারের নেতৃত্বে ট্রাক ভর্তি বিহারী স্থানীয় রামপুর কলোনি থেকে বন্দুক, ছোড়া, বেয়নেট, রাম দা নিয়ে আক্রমণ করে। তারা পঁচিশ জনকে হত্যা করে। দুই জন জখম হয়। পরবর্তীকালে এই হত্যাকান্ডের খবর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়। এই গণহত্যায় যারা প্রাণ হারান তারা হলেনঃ-

	নাম	পিতার নাম
১।	আব্দুল হাকিম মোল্লা (৭০)	ওমর আলী মোল্লা
২।	মোঃ আলী পাটারী (৫০)	ফয়েজ আলী পাটারী
৩।	গনি মৃধা (৫০)	রূপাই মৃধা
৪।	অনি মৃধা (৪৪)	রূপাই মৃধা
৫।	নইমদ্দিন শেখ (৬০)	মনাই শেখ
৬।	মলিক মিঞা (৪০)	সিরাজ মিঞা
৭।	আবুল বাসার (২৫)	আজিজ পাঠান
৮।	ইছাক মুন্সি (৪০)	রমজান খাঁ
৯।	মোসলেম খাঁ (৫০)	রমজান খাঁ
১০।	আহসান খলিফা (৬০)	ছবেদ খলিফা
১১।	সইজদ্দিন সরদার (৫০)	আরমান সরদার
১২।	নামদার শেখ (৫৫)	সফাত শেখ
১৩।	শুকুর আলী (২৫)	রূকমান শেখ
১৪।	আবু মুন্সি (৪৫)	মোতালেব মুন্সি
১৫।	মান্নান মুন্সি (৪৫)	শওকত আলী মুন্সি
১৬।	আবুল কাশেম মুন্সি (১৫)	মান্নান মুন্সি
১৭।	চাঁদ আলী পাঠান (২০)	রেহান উদ্দীন পাঠান
১৮।	ইউনুস খাঁ (৫০)	অজ্ঞাত
১৯।	হাবিব ভূঁইয়া	অজ্ঞাত
২০।	ক্বারী আব্দুল রহিম (৪০)	অজ্ঞাত
২১।	হারান দত্ত (বৃদ্ধ)	অজ্ঞাত

এছাড়া সেদিনের আক্রমণে আরো দুই জন আহত হন। তাঁরা হলেনঃ- ইছাক গাজী (৩০) পিতা-মজিদ গাজী ও মোস্তাজ গাজী (২৫) পিতা- মজিদ গাজী। এদের বেয়নেট চার্জে আহত করা হয়।[১৯]

রামপুরের সাবেক জমিদার আদ্যনাথ সেনের বাড়ীতে সংঘটিত হত্যাকান্ডঃ- রাজবাড়ী জেলার সদর থানার শহীদ ওহাবপুর ইউনিয়ন। স্বাধীনতা পূর্বকালে এর নাম ছিল মামুনপুর ইউনিয়ন। ইউনিয়নটি রাজবাড়ী-ফরিদপুর মহাসড়কে গোয়ালন্দ মোড় নামক স্থানের অনতিদূরে। এটি হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের একটি

১৯। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম রামপুর। এখানে বাস করতেন এককালের জমিদার আদ্যনাথ সেন। তিনি জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। দেড়ন একর জমির উপর তাঁর বিশাল বাড়ী। একান্নবর্তী পরিবারে ৮৮ (অষ্টআশি) জন মানুষ ছিল। আদ্যনাথ সেনের বাড়ীতে ৩৮ (আটত্রিশ) টি টিনের ঘর চিল। তাঁর দুই পুত্র ডাঃ মনোরঞ্জন সেন ও আশুরঞ্জন সেন (ইনি ১৯৭১ সালে মামুনপুর ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন)।

আদ্যনাথ সেন বৃটিশ শাসনামল থেকে দীর্ঘ ৩৮ বছর একনাগারে মামুনপুর পঞ্চায়েত প্রধান ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রেসিডেন্ট পদ বিলুপ্তির পর আইয়ুব খাঁন মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেন এবং বিভিন্ন মোর্চার নির্বাচন দেন। বয়োবৃদ্ধ আদ্যনাথ সেনের পুত্র আশুরঞ্জন সেন মুসলিম লীগের ওবায়দুল্লার সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে মামুনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। আদ্যনাথ সেন ও তাঁর পুত্রগণ এবং পরিবারের সকল সদস্য বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ই মে বুধবার মুসলিম লীগের ওবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে শান্তি কমিটি মিটিং করছিল কুটির হাটে (বর্তমান মূলঘর ইউনিয়নে অবস্থিত)। এদিন ছিল আদ্যনাথ সেনের পুত্রবধু, ডাঃ মনোরঞ্জন সেনের স্ত্রীর শ্রাদ্ধের দিন।

দুপুর বারটার সময় বাইরে থেকে আসা আত্মীয়-স্বজন সহ পরিবারের সবাই বাড়ীর মধ্যে অবস্থান করছিল। পুরোহিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান সবেমাত্র শুরু করেছে। আদ্যনাথ সেন বৈঠকখানায় চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় রামপুর বিহারী কলোনি থেকে রাজবাড়ীর বিহারী সৈয়দ খামার জীপ গাড়ীতে ছয় জন সহযোগী নিয়ে আদ্যনাথ সেনের বাড়ীর সামনে এসে নামে। তারা সশস্ত্র অবস্থায় বাড়ীর মধ্যে দ্রুত ঢুকে পড়ে। সৈয়দ খামারের সাথে রামপুর বিহারী কলোনির সহযোগী ছিল সরদার ছোবহান, বাবুজান, ইস্রাইল, শুকুর আলী, দুখুমিঞা। সৈয়দ খামার দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে সদর্পে ঘোষণা করে, "যেতনা মালাউন আদমি আউর কাফের আদমি হ্যায়, পহেলে ইসকে কো খতম করো, আউর ভেসুদো উসকো"। এই নির্দেশ পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে জল্লাদ বাহিনী রামদা ও ছ্যানের আঘাতে নব্বই বছরের বৃদ্ধ আদ্যনাথ সেনকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে শিরচ্ছেদ করে লাশ খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে। এসময় তাঁর স্ত্রী সরোজু বালা সেন নিজের শির এগিয়ে দেয় এই বলে যে, স্বামীকে যেহেতু হত্যা করা হয়েছে, তাই তাঁর জীবনের আর মূল্য নেই তাকে খুন করা হোক। হত্যাকারীরা সরোজু বালাকেও ছোড়ার আঘাতে হত্যা করে লাশ খন্ড-বিখন্ড করে। এরপর তারা বাড়ীর অন্যান্যদের ধরে নিয়ে উঠানে লাইন ধরে বসায়। একেরকে এক এক করে ডেকে নিয়ে ডাঃ মনোরঞ্জন সেনের পশ্চিম ঘরের পিছনে বাঁশ বাগানের মধ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করে। হত্যাকারীরা আদ্যনাথ সেনের পুত্র ডাঃ মনোরঞ্জন সেন, ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয় গোপাল সেন এবং তাঁর ছেলে (রাজবাড়ী কলেজের তৎকালীন ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধা) বিনয় রঞ্জন সেন, আদ্যনাথ সেনের দৌহিত্র (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র, ঢাকা থেকে শ্রাদ্ধে এসেছিল), আদ্যনাথ সেনের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাসরত মাখন লাল দে, তাঁর জ্যাঠা মহাশয় অবিনাশ চন্দ্র দে, মাখন লালের বয়োবৃদ্ধ মাতা, ধীরেন্দ্র নাথ গুহ সহ মোট ১৩ (তের) জনকে বেয়নেট চার্জ এবং রাম দা দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মৃত লাশগুলো টুকরো টুকরো

Dhaka University Institutional Repository

করে লাশ খন্ড-বিখন্ড করে। এরপর তারা বাড়ীর অন্যান্যদের ধরে নিয়ে উঠানে লাইন ধরে বসায়। এদেরকে এক এক করে ডেকে নিয়ে ডাঃ মনোরঞ্জন সেনের পশ্চিম ঘরের পিছনে বাঁশ বাগানের মধ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করে। হত্যাকারীরা আদ্যনাথ সেনের পুত্র ডাঃ মনোরঞ্জন সেন, ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয় গোপাল সেন এবং তাঁর ছেলে (রাজবাড়ী কলেজের তৎকালীন ছাত্র ও মুক্তিযোদ্ধা) বিনয় রঞ্জন সেন, আদ্যনাথ সেনের দৌহিত্র (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র, ঢাকা থেকে শ্রাদ্ধে এসেছিল), আদ্যনাথ সেনের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাসরত মাখন লাল দে, তাঁর জ্যাঠা মহাশয় অবিনাশ চন্দ্র দে, মাখন লালের বয়োবৃদ্ধ মাতা, ধীরেন্দ্র নাথ গুহ সহ মোট ১৩ (তের) জনকে বেয়নেট চার্জ এবং রাম দা দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মৃত লাশগুলো টুকরো টুকরো করে জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে দেয়। এরপর লুটতরাজ শুরু করে। অবাঙালী বিহারী এবং রিফিউজীরা এতে অংশ নেয়।

আদ্যনাথ সেনের বাড়ীর অন্যান্য লোকজন যাঁরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়, তাঁরা শূন্য হাতে পার্শ্ববর্তী সাদীপুরের সৈয়দ আলী মিয়া, গোপাপ আলী মেম্বার, শমসের মুহরী, জয়নাল মিয়া, আজু মল্লিক এবং মূলঘর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (পরবর্তীকালের) মাওলানা মোহাম্মদ আলীর বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। ঐ দিনেই সমস্ত সম্পত্তি লুট হয়ে যায়। যা বাকি ছিল তা সহ ছয়টি ঘরের শুধু চালের টিন বাদে সমস্ত টিন ও কাঠ খুটি শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মওলানা মোহাম্মদ আলী লুট করে। পুকুরে জাল ফেলে সমস্ত কাঁসা পিতল লুট করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় পর ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারীরা বাড়ীতে ফিরে আসে। শূন্য ভূমিতে তাঁরা হত্যাকান্ডের শিকার ১৩ (তের) টি লাশের মস্তক ও হাড় খুঁজে পায়। সেগুলো পানিতে ভাসিয়ে তাঁরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। আদ্যনাথ সেনের পুত্র তৎকালীন মামুনপুর ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান আশুরঞ্জন সেন সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার ১ (এক) মাস পর তিনি ও তাঁর একান্ত সহযোগী অনন্ত কুমার দাস বাড়ীতে ফেরেন। কিন্তু এ সময় দুস্কৃতকারীরা এক রাতে আশুরঞ্জন সেন কে গুলি করে হত্যা করে।

<u>বাণীবহ আক্রমণঃ</u>- রাজবাড়ী জেলার সদর থানার অন্তর্গত বাণীবহ ইউনিয়ন। জেলা সদর থেকে ৫ (পাঁচ) মাইল দক্ষিণে রাজবাড়ী-বালিয়াকান্দি সড়কের পাশে এর অবস্থান। এ ইউনিয়নটি বিহারী, রাজাকার-আলবদরদের দ্বারা তুলনামূলকভাবে বেশি আক্রান্ত হয়। বাংলা ১৩৭৮ সালের ৬ই বৈশাখ তারিখে আনুমানিক সকাল ১১ টায় এ ইউনিয়নের লক্ষ্মীনারায়নপুর গ্রামে মস্তান বিহারী, হালিম বিহারী, সৈয়দ রিফিউজী, সলেমান রিফিউজী ও তাদের সহযোগীরা প্রবেশ করে। প্রথমে তারা লক্ষ্মীনারায়নপুর গ্রামের নিমাই চন্দ্র সরকার এবং মণীন্দ্র নাথ রায়কে নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যা করে মস্তক ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখে। তারপর শুরু করে লুটতরাজ। গ্রামবাসীরা এ সংবাদ পাওয়া মাত্র তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া শুরু করে। মূলত এ দিন থেকেই এ অঞ্চলের ব্যাপক মানুষ ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। নিহত নিমাই চন্দ্র এবং

১০। ' রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

মণীন্দ্র নাথের পরিবারের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। নিমাই চন্দ্রের পরিবারে স্ত্রী শান্তিলতা দেবী, এক পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল। কন্যা দু'জন বর্তমানে বিবাহিত। মণীন্দ্র নাথ ছিলেন অকৃতদার। এদিন বাণীবহ গ্রামের নিখিল রঞ্জন ভৌমিক সাহসিকতার জন্য প্রাণে রক্ষা পান। ৬ই বৈশাখ তারিখে সিকেলে তাঁর বাড়ী লুট হওয়ার পর তিনি ও তার পরিবারের সবাই পাশ্ববর্তী বড় আটদাপুনিয়া গ্রামে চলে যান। নিখিল রঞ্জন ভৌমিক একটু পরে রওনা হন। পথিমধ্যে দুইজন দুর্বৃত্ত সড়কি (এক প্রকার দেশী অস্ত্র) ও দা তাঁর গলায় ও বুকে ধরে কাছে যা আছে তা দিতে বলে। অন্যথায় হত্যা করার হুমকি দেয়। এ অবস্থায় নিখিল রঞ্জন একজনের হাত থেকে দ্রুত সড়কি কেড়ে নিয়ে অন্যজনের হাতের দা দিয়ে দিতে বলেন। তখন সে ব্যক্তি দা রেখে দিতে বাধ্য হয় এবং পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে তারা আসে কিন্তু ততক্ষণে নিখিল রঞ্জন আপাত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়।

এ ঘটনার পর কয়েকদিনের মধ্যেই বাণীবহ ইউনিয়নের প্রায় সব হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম লুটতরাজের শিকার হয়। অনেকে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আশ্বাস পূর্বে দিলেও তা রাখতে পারেননি। এসব গ্রামের অনেক লোক ভারতে চলে যেতে থাকে। প্রতিবন্ধী ও অক্ষম অনেককে বাড়ীতে ফেলে রেখে প্রাণ ভয়ে তাঁরা চলে যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন পূর্বে লক্ষীনারায়নপুর গ্রামের বনমালী মন্ডল, লক্ষীকান্ত সরকার ও রতন কুমার মন্ডল সিলেট জেলায় গিয়েছিল কাজের উদ্দেশ্যে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাড়ী ফেরার পথে ফরিদপুর জেলার নারায়টেক হাটের কাছে পাকিস্তান বাহিনীর গুলিতে তাঁরা নিহত হন। এদের মধ্যে রতন কুমার সদ্য বিবাহিত ছিল।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একদিন, বিহারী, রাজাকার, আল-বদর বাহিনী বাণীবহ ইউনিয়নের বাণীবহ বাজার ও পাশ্ববর্তী গ্রামগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ী লুট ও জ্বালিয়ে দিতে ব্যস্ত ছিল। এ সময় রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কমান্ডার মোঃ জালার উদ্দীনের নেতৃত্বে তাঁর বাহিনী হানাদারদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। তাঁরা কুখ্যাত সৈয়দ রিফিউজী, মস্তান বিহারী, হালিম বিহারী, সলেমান রিফিউজীকে ধরে ফেলে এবং তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। এই অপারেশনের পরে এলাকায় কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। এ দিন বাণীবহ গ্রামের সেকেন্দার খলিফার বড় ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে বাণীবহ ইউনিয়ন শত্রুমুক্ত করতে কমান্ডার মোঃ জালাল উদ্দীনের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে রাজবাড়ী জেলার বাণীবহ ইউনিয়নের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

শেখ গোলাম মোস্তফা (বাচচু)	(বাণীবহ)
মোঃ মকবুল হোসেন মোল্লা	(বাণীবহ)
সিদ্দিকুর রহমান মিঞা	(বাণীবহ)
মোঃ মকবুল হোসেন খান	(আটদাপুনিয়া)
খলিলুর রহমান মোল্লা	(আটদাপুনিয়া)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলাম (লক্ষ্মীনারায়নপুর)
মোখলেছুর রহমান খান (লক্ষ্মীনারায়নপুর)
আব্দুস সাত্তার (সৈয়দ পাঁচুরিয়া)
এছাড়া আরো অনেকে বাণীবহ ইউনিয়নকে শত্রুমুক্ত করতে তৎপর ছিলেন।[২১]

জৌকুড়ায় গণহত্যাঃ- রাজবাড়ী জেলার সদর থানাধীন জৌকুড়া গ্রাম। পূর্বে গ্রামটি পাংশা থানার অধীনে ছিল। এ গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ব্যাপক গণহত্যা চালানো হয়। এতে বহু লোক নিহত হয়। বিহারী, রাজাকার, আল-বদর এখানে গণহত্যা চালায়।

এ গ্রামে অনেক হিন্দু জনসাধারণের বসবাস ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এখানে প্রায়ই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ত-বিহারীরা আসছে! আতংকের মধ্য দিয়ে গ্রামবাসী দিন যাপন করছিল। জানা যায় জৌকুড়া গ্রামে অভিযান চালানোর আগের দিন গোয়ালন্দ মহকুমা প্রশাসকের আদালত কক্ষে রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে মুক্তিবাহিনী অথবা মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা আছে সে সব জায়গায় অভিযান চালানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। মহকুমা প্রশাসকের অফিসে তালিকাভুক্ত প্রথম সাত জনের ভিতর মরহুম মগরূব আহম্মদ মনাক্কা মিয়া (জৌকুড়া গ্রামের বাসিন্দা) ও মকছুদ আহম্মদ রাজা (বর্তমান জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জৌকুড়া গ্রামের বাসিন্দা) এ দুই জনের নাম ছিল। ঐ নির্দিষ্ট দিনে একদল বিহারী, রাজাকার,আল-বদর উল্লিখিত দুই জনকে ধরতে জৌকুড়া গ্রামে যায়। এদের না পেয়ে হন্তারক দল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা গণহত্যা শুরু করে। বর্বর এবং বেপরোয়াভাবে যাকে যেখানে যে অবস্থায় পায়, দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করে। এরপর তারা লুটতরাজ শুরু করে। গ্রামে, বিশেষত হিন্দু এলাকা ব্যাপকভাবে লুটপাট হয়। স্থানীয় লোকজন যারা লুট করতে অনীহা প্রকাশ করে তাদের বেদম প্রহার করা হয় বলে জানা যায়। ফলে অনেক স্থানীয় লোক লুটতরাজে অংশ নেয়। বিহারী, রাজাকার, আল-বদরদের এই গণহত্যা ও লুটতরাজ চালানোর সময় তাদের সাথে রাজবাড়ীর খালেক মোল্লা ছিল। পরবর্তীকালে খালেক মোল্লা জানায় পরিস্থিতির চাপে সে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

এই গণহত্যার শিকার যাঁরা হন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রকাশ চন্দ্র কুন্ডু, তাঁর ছোট ভাই স্বপন কুমার কুন্ডু, রমনী মোহন কুন্ডু, শরৎ চন্দ্র দাস, নিরোদ চন্দ্র কুন্ডু। নিরোদ চন্দ্র কুন্ডু এর দুই দিন পর বিহারীদের গুলিতে নিহত হন।[২২]

মাছপাড়া গ্রামের নৃশংস গণহত্যাঃ-রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার মাছপাড়ায় বাংলা ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ সালে পাকবাহিনী, বিহারী, রাজাকার, আল-বদর মিলে গণহত্যা চালায়। এই হত্যাকান্ডে বহু লোক নিহত হন। ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ভোর রাত চারটায় ঘুমন্ত জনতার উপর পাকবাহিনী, বিহারী ও স্থানীয় রাজাকাররা বর্বরোচিত

২১। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত দৈনিক সহজকথা, ৫ এপ্রিল, ১৯৯৬ সংখ্যা।
২২। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণ চালায়। এতে পঁয়ত্রিশ (৩৫) জন মানুষ নিহত হন। আহত হন অসংখ্য যাদের অনেকেই পরে মারা যান।

আগের রাতে মাছপাড়ার মথুরাপুর গ্রামে স্থানীয় রাজাকার মোহন, রফিক মিঞা, চুন্যা খন্দকার, মতি খন্দকার বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে বলে, আপনারা সবাই বাড়ীতেই থাকেন, ভয় নেই শান্তি কমিটি করা হয়েছে। রাজবাড়ী থেকে পাকবাহিনী ও বিহারীরা বিশেষ ট্রেনে করে মাছপাড়া ষ্টেশনে নেমে স্থানীয় রাজাকার রফিক মিঞা এবং চুন্যা খন্দকারের বাড়ীতে যায়। তারা এখানে উৎসবের আমেজে খাবার খায় ও রাত্রি যাপন করে। তারা পূর্বেই মথুরাপুর, বরুলিয়া, কালিনগর, রামকোল গ্রাম ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা করে। ৬ ই জ্যৈষ্ঠ ভোর চারটায় মথুরাপুর, বরুলিয়া, কালিনগর গ্রাম ঘিরে ফেলে। একই সাথে তারা রামকোল মনে করে বাহাদুরপুর গ্রাম ঘেরে। ফলে রামকোল গ্রামের লোকজন প্রাণে বেঁচে যায়। পাকবাহিনী, বিহারী, রাজাকাররা গ্রামগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা মাছপাড়া গ্রামের জনৈক ডাক্তার -এর বাড়ী থেকে আগুন ধরানো শুরু করে এবং উল্লিখিত গ্রামগুলোর প্রত্যেক বাড়ীতে আগুন ধরায়। মথুরাপুর গ্রামের সব বাড়ী পুড়ে যায়। তারা ৫০/৬০ (পঞ্চাশ/ষাট) টি বাড়ী পোড়ায়। লোকজন পালানোর চেষ্টা করে। অনেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলিতে মারা যায়। অনেকে পুড়ে আহত হন।

পাকবাহিনী, বিহারী, ও স্থানীয় রাজাকাররা ২৬ (ছাব্বিশ) জনকে বাড়ী থেকে ধরে ট্রেনে করে পাংশা- মাছপাড়া ষ্টেশনের মাঝে পাংশা পশ্চিম সিগন্যালের কাছে এনে পুলের নিচে একে একে জবাই করে হত্যা করে অল্প পানিতে ফেলে দেয়। পরে স্থানীয় লোকজন গর্তকরে লাশগুলি পুঁতে রাখে। মেয়েদের ঝোপ-জঙ্গল থেকে ধরে এনে নির্যাতন করে। এরপর প্রায় সব হিন্দু জনসাধারণ প্রাণের ভয়ে ভারতে চলে যায়। মুজিবর রহমান নামে এক শিক্ষিত যুবক (ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী) হত্যাকারীদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তখন বিহারীরা মুসলিমদের উপর অত্যাচার শুরু করে।

এই নৃশংস হত্যাকান্ডে যাঁরা নিহত হন তাঁরা হলেনঃ-

মাছপাড়া	মথুরাপুর
১। হরেন্দ্র নাথ দাস	১। ষষ্ঠি চরন দাস
২। পশুপতি দাস	২। গোপাল চন্দ্র দাস
৩। যুগল চন্দ্র দাস	৩। কুমারেশ দাস
৪। গনেশ চন্দ্র দাস	৪। অজিত কুমার দাস
৫। ধীরেন্দ্র নাথ দাস	৫। পলান চন্দ্র দাস
৬। শেফালী বেগম	৬। ভৈরব চন্দ্র দাস
৭। ইয়াছিন পোদ্দার	৭। বিজয় কুমার দাস
৮। হামিদা খাতুন	৮। তারাপদ দাস
৯। লয়মান বিবি	৯। অনুকূল চন্দ্র দাস

Dhaka University Institutional Repository

১০। জয়দা বিবি
১১। আবুল কাশেম
১২। মজিবর রহমান

১০। রবীন্দ্র নাথ দাস

এছাড়া বাহাদুরপুর, দুর্গাপুর, শিমুলিয়া ও কালুখালী-তে যাঁরা নিহত হনঃ-

(১) খন্দকার আবুল হোসেন (২)সুধীর কুমার দাস (৩)নরেন্দ্র শিকদার (৪)মস্তাজ আলী বিশ্বাস (৫)হরেন্দ্র নাথ সরকার (৬)রামকোল গ্রামের নগেন্দ্র নাথ দাস।[২৩]

হাবাসপুর গ্রামে অভিযানঃ-১৯৭১ সালে বংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বর্তমান রাজবাড়ী জেলা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ জেলার বহু মানুষ স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার-আলবদর বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা ও নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ নিরীহ মানুষকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করে। জেলার পাংশা থানার হাবাসপুর গ্রাম অনুরূপ হত্যাকান্ডের শিকার হয়।

এ গ্রামে পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা একাধিকবার হত্যাযজ্ঞ চালায়। এখানে হানাদার বাহিনী সাধারণত ভোর চারটায় এসে কয়েক ঘন্টার মধ্যে হত্যা এবং লুট করে চলে যেত। এ গ্রামে যে সমস্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতমঃ

(১)পাঁচু শেখ, পিতা-চৈতি শেখ [তাঁকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করা হয়]

(২) মাদারী সরদার, পিতা-রজনী সরদার

(৩) জাকের মন্ডল [কুপিয়ে হত্যা করা হয়]

(৪) মজিবর মন্ডল, পিতা-ফয়েজ উদ্দীন [মাছপাড়াতে তাঁকে জবেহ করে হত্যা করা হয়]

(৫) হাবাসপুর বিষ্ণু পোদ্দারের এক গোয়ালা [তাঁর নাম জানা যায়নি]

(৬) লাতু সরদার [চরপাড়া]

(৭) বদর উদ্দীন মন্ডল [পাংশাতে নিহত হন]

(৮) ইয়াছিন বিশ্বাস, পিতা-গেরদো বিশ্বাস [অপহৃত ও নিখোঁজ]

(৯) চিন্তা হরণ কুন্ডুর নেপালী নিরাপত্তা প্রহরীকে গুলি করে হত্যা করা হয় (তাঁকে বাড়ী প্রহরার দায়িত্বে রেখে পরিবারের সকলে অন্যত্র চলে যান। বিশ্বস্ততার নিদর্শন স্বরূপ সে বাড়ীর দরজা থেকে সরে না যাওয়ায় তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে গুলি করা হয়)।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রাজবাড়ীর যুদ্ধে আরশাদ আলী নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাঁর পিতার নাম কাশেম সরদার, গ্রাম-গঙ্গানন্দদিয়া।

শহীদ এ্যাডভোকেট কালীশঙ্কর মৈত্রঃ-রাজবাড়ী জেলায় স্বাধীনতা যুদ্ধে অগণিত শহীদদের একজন এ্যাডভোকেট কালীশঙ্কর মৈত্র। তিনি রাজবাড়ী আইনজীবী সমিতির

২৩। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

একজন দক্ষ ও প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। নেতৃস্থানীয় এ আইনজীবী রাজাকারদের হাতে শহীদ হন।

কালীশঙ্কর মৈত্র রাজবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সঠিক জন্ম সন- তারিখ পাওয়া না গেলেও ১৯০০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁর সহকর্মীরা জানান। তাঁর পিতার নাম ভোলা নাথ মৈত্র। কালীশঙ্কর মৈত্রের শিক্ষা জীবন সম্পর্কে জানা যায়, রাজবাড়ী শহরস্থ গোয়ালন্দ হাই স্কুলে (বর্তমান রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়) তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতায় উচচ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখান থেকেই আইন বিষয়ে ডিগ্রী নিয়ে রাজবাড়ীতে ফিরে আসেন এবং খুব অল্প দিনের মধ্যে তৎকালীন রাজবাড়ী মহকুমা শহরে এবং বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় সিভিল আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। শহীদ কালীশঙ্কর মৈত্র পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁর শৈশবে পিতা মারা যান। তাঁর গায়ের রং অত্যন্ত কালো ছিল এবং ছোটবেলা হতেই তিনি বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল প্রচন্ড জোর এবং গাম্ভীর্য। পরবর্তীকালে আইন পেশায় এবং সামাজিক জীবনে বজ্র কঠিন স্বর তাঁর ব্যক্তিত্বকে অনেকাংশে আকর্ষণীয় করে তোলে। তিনি কলকাতায় উচচতর শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁর জ্ঞাতি ভাই খ্যাতনামা চিকিৎসক যোগেন মৈত্রের কাছে থেকে। কালীশঙ্কর মৈত্রের ইচছা ছিল তিনি চিকিৎসক হবেন কিন্তু অপর জ্ঞাতি ভাই এ্যাডভোকেট হীরালাল মৈত্রের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই তিনি আইন পেশায় আসেন। হীরালাল মৈত্র রাজবাড়ীতেই আইন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাজবাড়ীতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কালীশঙ্কর মৈত্র সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত না হলেও রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে তিনি প্রকাশ্যে আলোচনা, বক্তব্য ও বিবৃতি দিতেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তারিখে রাজবাড়ী শহরে যে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং প্রকাশ্যে ধ্বনি দেন, "আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো-স্বাধীন হলো"। তিনি ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে তাঁর রাজবাড়ী শহরস্থ নিজ বাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। স্বাধীনতাকামী তরুন-যুবকদের সক্রিয় সমর্থন এবং যুদ্ধে প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে বিভিন্নভাবে আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করতেন। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজবাড়ীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনকারী ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জোর অবাঙালী তৎপরতা শুরু হলে এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মত তিনিও আত্মগোপন করে রাজবাড়ী শহর থেকে পনের/ষোল মাইল দূরে বালিয়াকান্দি থানার ইলিশজোল গ্রামে জট্টু সান্যালের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এ গ্রামে থাকা অবস্থায় গ্রামের বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে রাজবাড়ী শহর তথা দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল চল্লিশ বৎসর যাবৎ রাজবাড়ী জেলার (তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা) প্রায় একচছত্র প্রাধান্য বিস্তারকারী আইন ব্যবসায়ী হিসেবে সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর গভীর যোগাযোগের কারণে তাঁর ক্ষতির কথা কেউ চিন্তা করবে না। কিন্তু এলাকার কতিপয় স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তির মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে রাজবাড়ী শহর এলাকা থেকে কতিপয় অবাঙালী ব্যক্তি অস্ত্রসহ গিয়ে এপ্রিলের শেষার্ধে তাঁকে গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসে। তাঁকে কোর্ট প্যান্ট পরিহিত অবস্থায় রাজবাড়ী শহরে এনে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। এ সময়

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সাথে কাউকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তিনি শুধু মাঝে মাঝে হাত নাড়ার চেষ্টা করেন। প্রচুর পুরস্কারের লোভে অবাঙালীরা ঐ দিনই তাঁকে ট্রাকে করে ফরিদপুর পাকবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে দুই ঘন্টা তাঁকে প্রচন্ড মানসিক নির্যাতন করা হয় এবং পরে গোপন নির্দেশে পুনরায় উক্ত অবাঙালীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। জানা যায় এ সময় তাঁকে ট্রাকে করে ফরিদপুর শহর থেকে কিছু দূরে হাজীগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তাঁকে ট্রাক থেকে নামালে তিনি তৃষ্ণার্ত বলে ইশারা করেন। এ সময় একজন সিগারেট ধরিয়ে তাঁর হাতে দেয়। তিনি হাতটা মুখে তোলার আগেই তাঁর পিছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটা গুলি করা হয়। এবং তিনি পড়ে যান। প্রকাশ্যে তাঁর মৃতদেহ ফেলে রেখে অবাঙালীরা ট্রাক নিয়ে রাজবাড়ীতে চলে আসে। ঘটনাস্থলে কিছু ব্যক্তি তাঁকে চিনতে পেরে কবর দেয়। স্বাধীনতার পর ভারত থেকে তাঁর ছেলেরা এসে খোঁজখবর নিতে ঐ স্থানে যান। জানা যায় কবর খুঁড়ে কিছু হাড় সংগ্রহ করে তা তাঁরা গঙ্গা নদীতে বিসর্জন দিবেন বলে নিয়ে যান।

এ্যাডভোকেট কালীশঙ্কর মৈত্রের তিন ছেলের সবাই শিক্ষা জীবনের শেষে ভারতে চলে যান। তিন মেয়ের মধ্যে দুই মেয়ের অনেক আগে ভারতে বিয়ে হয়। তাঁর ছোট মেয়ে রিক্তার জন্মের সময় স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। বিধবা-বৃদ্ধা মা এবং মাতৃহীনা কন্যাকে নিয়েই মূলত রাজবাড়ীতে তাঁর পারিবারিক জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে। মৃত্যুর আগে ছোট মেয়ের বিয়ে দেন। সেও ভারতে চলে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর কিছুকাল আগে তাঁর মা মারা যান। রাজবাড়ী শহরে আইন ব্যবসায় তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। খরচও করেছেন প্রচুর। বিভিন্ন দুঃস্থ পরীক্ষার্থী এবং ছাত্রদের নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তান শাসনামলে রাজবাড়ী শহরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে যে কয়েকজন ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত প্রচন্ড প্রতাপে স্বাধীনচেতা মন নিয়ে চলাফেরা করতেন কালীশঙ্কর মৈত্র তাঁদের অন্যতম। কোর্টের বাইরে কোচানো ধুতি আর সাদা শার্ট ছিল তাঁর পোষাক। হাতে রাখতেন ছড়ি। ধর্মীয় এবং যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে হাতে এ ছড়ি সহ তিনি উপস্থিত হতেন। সমসাময়িক ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা যায়, মাঝে মধ্যে তিনি বজ্রকণ্ঠে কাউকে কোন কথা বললে, তাঁর দিকে তখন চোখ মেলে উত্তর দেয়ার মতো ব্যক্তি কম ছিল।

বাইরে থেকে বজ্রকঠিন এই ব্যক্তি ভীষণভাবে ফুল ভালবাসতেন। সব ঋতুতে বিশেষ করে শীতকালে তাঁর সমস্ত বাড়ী অজস্র ফুলের সমারোহে উজ্জল থাকতো। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির উইল দাবি করে জনৈক নিতাই রায় প্রবেট মোকদ্দমা দায়ের করেন। নিতাই রায় বাল্যকাল থেকে কালীশঙ্কর মৈত্রের বাড়ীতে তাঁর আশ্রয়ে থাকেন এবং লেখাপড়া শেখেন। প্রবেট মোকদ্দমায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর শহীদ কালীশঙ্কর মৈত্রের যাবতীয় সম্পত্তিকে ক্রোক সম্পত্তি দাবি করা হয় এবং সেই মর্মে মামলা হয়। অবশেষে উক্ত নিতাই রায় প্রবেট সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।[১৪]

১৪। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন(সম্পাদিত)মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী(ঢাকা-১৯৯৮),পৃষ্ঠা-৩২-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধে খানখানাপুরঃ-রাজবাড়ী জেলার সদর থানার খানখানাপুর ইউনিয়ন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঐতিহ্যবাহী এ এলাকায় ব্যাপক গণহত্যা চালানো হয়। বড় ব্যবসা কেন্দ্র এবং গোয়ালন্দ-রাজবাড়ী মহাসড়কের পাশে, গোয়ালন্দ মোড় নামক স্থানের অদূরে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকার কারণে খানখানাপুর পূর্ব থেকেই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

১৯৭১ সালের ২১শে এপ্রিল গোয়ালন্দের পতন হলে পাকবাহিনী ভারী অস্ত্র ও যানবাহন নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে আসতে থাকে। খানখানাপুরের কাছে এসে একটি খোলা জীপ, দুইটি ট্যাঙ্কসহ ভারী অস্ত্র নিয়ে খানখানাপুর প্রবেশ করে। গুলির শব্দে এলাকার প্রায় সব লোক পালিয়ে যায়। খোলা গাড়ী রাস্তার পাশে রেখে পাকবাহিনীর একটি দল বাজার এলাকায় প্রবেশ করে। বিকেলে প্রথমে তারা ডাঃ আব্দুল গনির বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। বাড়ীতে লোক ছিল না। ১০/১২ টি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এর পরেই বাজারের দর্জি পরেশ সাহার বাড়ী পোড়ানো হয়। চারটি পরিবারের ঘরসহ অন্যান্য সম্পদ পুড়ে যায়। এরপর পাকবাহিনী ফিরে এসে পার্শ্ববর্তী সুরাজ মোহিনী ইনষ্টিটিউশনে আগুন ধরিয়ে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেয়। স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক তারাপদ কুন্ডুর বাড়ী পোড়ায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকা লোকজন দূরে পালিয়ে যায়। এ সময় খানখানাপুরে প্রায় ১৫০টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অরক্ষিত ছিল। এ দিনই রাতে এলাকার বিহারী ও রাজাকার- বাঙালী লুটতরাজ শুরু করে। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল দোকানপাট থেকে সমস্ত সম্পদ লুট করা হয়। পাকবাহিনী রাতে ফরিদপুর সার্কিট হাউজে গিয়ে ওঠে। যাবার সময় পাকবাহিনী যুগল কুন্ডু ও রাখাল কুন্ডু নামে দুই সহোদর ভাইকে ধরে নিয়ে যায়। পাটের বড় ব্যবসায়ী এ ভাতৃদ্বয়কে রক্ষা করার জন্য তাদের ঘরের ভাড়াটিয়া পাট কোম্পানীর ম্যানেজার এক পাঞ্জাবী মতান্তরে বিহারীও ব্যর্থ হয়। এ দু'জন আর ফিরে আসেনি। শোনা যায় তিন/চার দিন পরে এদেরকে গোয়ালন্দ ক্যানাল ঘাটে গুলি করে হত্যা করা হয়। রাখাল কুন্ডুর ছেলে রমেন কুন্ড ও যুগল কুন্ডুর ছেলে জয়ন্ত কুন্ড এখনও খানখানাপুরেই আছে। খানখানপুরে প্রায় চল্লিশটি বিহারী পরিবার বাস করতো। এদের মধ্যে কুখ্যাত বছির কসাই, টিক্কাখান, সাহেবজান (ধুনকার), শুকুর উল্লাহ, হানিফ, রমজান, হোসেন বিহারীসহ আরো অনেকে বাঙালী হত্যা, নির্যাতনে অংশ নেয়। তারা অনেকের বাড়ী, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান দখল করে। এ সময় প্রায় প্রতিদিন তারা এলাকার অবস্থাপন্ন লোকের বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি লুটতরাজ করে তৎকালীন কালীতলা বিহারী পাড়ায় (বর্তমান শুচছ গ্রাম) এনে রাখে। তারা খানখানাপুরস্থ কুন্ডুপাড়া, সাহাপাড়া, দত্তপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বণিকপাড়াসহ পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের পাঁচুরিয়া, খোলাবাড়িয়া, ভাঙারিয়া এলাকার প্রায় সকল হিন্দু জনগণের ঘরবাড়ী লুটতরাজ, ভাংচুর ও অন্যান্য সম্পত্তি বিনষ্ট করে। যাঁরা এলাকায় ছিল তাদের দৈহিক নির্যাতন করে নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়।

বিহারীরা পাঁচুরিয়া খোলাবাড়িয়া গ্রামের সাবেক জমিদার ডি. কে. সাহার বাড়ী (বর্তমানে তাঁর পৌত্র অরুণ কুমার সাহা, প্রধান শিক্ষক, খানখানাপুর তমিজ উদ্দীন খান বালিকা উচচ বিদ্যালয়) আক্রমণ করে। তারা ডি. কে সাহার ছেলে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নিলু বাবু, বড় বাবু সহ এলাকার আরো তিন জন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে জমিদার বাড়ীর

Dhaka University Institutional Repository

পুকুরের পাকা ঘাটে এনে হত্যা করে। তারা প্রাসাদোপম বাড়ীটি দখল করে। বাড়ীর অন্য সদস্যদের বের হতে দেয়নি। বিহারী হানিফ, বছির সহ অন্যান্য বিহারীরা ঐ বাড়ীকে আড্ডাখানা হিসেবে ব্যবহার করে। বাড়ীর সদস্যদের সামনেই তারা মদ খেয়ে মাতলামি করতো এবং এলাকার যুবতী নারীদের ধরে এনে পাশবিক নির্যাতন চালাত। খানখানাপুর এলাকার অসংখ্য বীরাঙ্গনার সম্ভ্রম এখানে লুণ্ঠিত হয়।

বাংলা ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ সালে রাজবাড়ী থেকে প্রায় ৩০ জন বিহারী দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে স্থানীয় বিহারীদের সহযোগিতায় এলাকায় প্রবেশ করে। একটি গ্রুপ দক্ষিণ - পাড়ায় গিয়ে বাড়ী থেকে ধরে এনে কল্যাণ কুন্ডুর বাড়ীর পিছনে লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্যবসায়ী গোকুল ভক্ত, বারিন্দ কুন্ডু, মাখনলাল কুন্ডু, প্রমথ নাথ শিকদার, নন্দলাল কুন্ডুকে গুলি করে এবং কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারা মৃতদেহ গুলি টুকরো টুকরো করে। এদিন অনাথ কুন্ডুকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী স্নেহলতা (টুলি) কে বেয়নেট চার্জ করে এখানে হত্যা করে। ঐ দিনই বিহারীদের অপর গ্রুপ কাল্লু বিহারীর নেতৃত্বে খানখানাপুর রেল ষ্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে সাহা পাড়া আক্রমণ করে। এখানে দর্জি পরেশ চন্দ্র সাহা, স্কুল ছাত্র সুবাস চন্দ্র সাহা পিতা-সন্তোষ সাহাকে গুলি করে হত্যা করে। বিজয় সাহাকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে। খানখানাপুরে কাড়াল (হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রেণী) পাড়ায় দুলাল চন্দ্র সরকারকে ভারতে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে খবর আদান-প্রদানের অভিযোগ তুলে রেল ষ্টেশনের পূর্ব পার্শ্বে রেলের ভাটায় নিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। কাড়াল পাড়ার উত্তর পাশের ঝোপের মধ্যে গরু লস্করকে এদিন কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

খানখানাপুরের অনিল আচার্য তাঁর পুত্র অবনি আচার্য (ভানু)- কে নিয়ে গোয়ালন্দ মোড় খৃষ্টান মিশনের পিছনে শ্বশুরবাড়ী বেড়াতে গেলে রামপুরের বিহারীরা তাদেরকে কুপিয়ে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ৭ই জুন তারিখে রামপুর ও রাজবাড়ীর বিহারীরা করিমের নেতৃত্বে উজান খানখানাপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হরিপদ সাহা, লোকনাথ সাহা (ধনী ব্যবসায়ী ও গৃহস্থ), জগদীশ শীল (নরসুন্দর), অনিল কুমার সাহা (মিষ্টি বিক্রেতা), নগর চন্দ্র শীলকে নৃশংসভাবে জবেহ করে হত্যা করে। একজন ছাড়া সবাই ঘটনাস্থলে মারা যান। একজন বেঁচে গিয়ে পরে মারা যান। মে মাসের শেষ দিক থেকে রাজাকার-বিহারী প্রতিরোধ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। এ সময় খানখানাপুরস্থ রসুলপুরের এবং কালীতলার বিহারীরা নিরাপত্তার অভাবে কুন্ডুপাড়া এলাকা দখল করে সেখানে অবস্থান নেয়।

খানখানাপুরে প্রতিরোধ যুদ্ধঃ- তৎকালীন পুলিশের সুবেদার মেজর খালেক (বর্তমান বাড়ী জেলার সদর থানার সাইবাড়িয়া গ্রামে), পুলিশ বিভাগে কর্মরত খানখানাপুর এলাকার ব্যক্তিবর্গ এলাকায় এসে খানখানাপুর, কোলার হাট (রাজবাড়ী সদর থানাধীন), কুঠির হাট (বর্তমান মূলঘর ইউনিয়নে) সহ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকার তরুনদের নিয়ে, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ইলিয়াস আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট গঠন করেন এবং এলাকায় প্রশিক্ষণ শুরু করেন। সাইদুর রহমান,

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল খালেক, জলিল বেগ এ সময় ইলিয়াস গ্রুপে কুঠির হাট ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। খানখানাপুরের জলিল খান (রূপালী ব্যাংকের ম্যানেজার), মুজিব আলম (বকুল), ওহাব খান সহ অন্যান্যরা নিয়মিত কুঠির হাট ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এলাকায় প্রতিরোধ গড়া এবং বিহারীমুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিহারীদের দুর্বলতার সুযোগে খানখানাপুরের মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার বছির, আদু কসাইকে কৌশলে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করে বিহারীদের পরাস্ত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

খানখানাপুর রেলগেট ও গোয়ালন্দ মোড়ের মাঝখানে অবস্থিত নাড়াপচা ব্রিজ প্রহরার দায়িত্বে ছিল বিহারী সাহেব জানের নেতৃত্বে বছির, সাত্তার, আমানুল্লাহ, আদু, শাহজাহান, ও ছামাদ। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এদের পরাস্ত করে খানখানাপুরকে বিহারীমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। নভেম্বর মাসে ঈদের আগের দিন সিরাজ বাহিনীর সঙ্গে খানখানাপুরের রেজাউল করিম, আবু বকর, মাসুদুল আজাদ ও অন্যান্যরা ভারতে ট্রেনিং শেষে অস্ত্রসহ এলাকায় এসে অবস্থান নেয়। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা লালের গ্রুপ, কুঠির হাটের ইলিয়াস গ্রুপ এবং খানখানাপুর চরাঞ্চলের মুন্সি আব্দুল লতিফের গ্রুপের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে নাড়াপচা ব্রিজ অপারেশনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উল্লিখিত রাজাকার বছির ও আমানুল্লাকে দিয়ে কৌশলে গুলি সংগ্রহ করে কুঠির হাটে রাখা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ দু'জন সহ বাকি চার জন রাজাকারকে (যারা নাড়াপচা ব্রিজ প্রহরায় নিয়োজিত ছিল) কৌশলে নিজেদের পক্ষে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদেরকে ৮ ই ডিসেম্বর রাতে বিহারী সাহেবজান হত্যার দায়িত্ব দিয়ে ব্রিজের পাশের আঁখ ক্ষেতে আত্মগোপন করে থাকে। এ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ইলিয়াস গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারাও ছিল। বিহারী সাহেবজানের নেতৃত্বে অন্যান্য দিনের মত এদিনও রাজাকাররা নাড়াপচা ব্রিজ পাহারা দিচ্ছিল। পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তিযোদ্ধাদের সংকেত পেয়ে রাত একটার দিকে ছয়জন বাঙালী রাজাকার গুলি করে ব্রিজের পাশের বাঙ্কারের মধ্যে সাহেবজানকে হত্যা করে। তার লাশ বাঁশে ঝুলিয়ে কাধে নিয়ে এক মাইল দূরে শহীদ ওহাবপুর ইউনিয়নের সাত্তার খানের বাড়ীর পিছনে পুঁতে রাখা হয়। সাহেবজানের অস্ত্রসহ মোট সাতটি অস্ত্র নিয়ে রাজাকার বছির, আমানুল্লাহ, আদু, শাহজাহান, সাত্তার, রতন কুঠির হাট মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হয়।

সাহেবজান হত্যার খবর পেয়ে স্থানীয় বিহারী ও অন্যান্য রাজাকাররা প্রতিশোধপরায়ন হয়ে ওঠে। নেতৃস্থানীয় বিহারীরা বাঙালী রাজাকারদের বাদ দিয়ে খানখানাপুর বাজারে শান্তি কমিটির অফিসে (বর্তমানে ব্যবসায়ী সমিতির অফিস) গোপন সভায় মিলিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯ই ডিসেম্বর সকালের রাজবাড়ী-ফরিদপুরগামী ট্রেনে সমস্ত বিহারীদের মালামাল তুলে দেয়া হয়। ত্রিশ জন সশস্ত্র বিহারী এবং উনত্রিশ জন বাঙালী রাজাকার খানখানাপুরের পশ্চিম প্রান্তে দর্পনারায়নপুর গ্রামে

Dhaka University Institutional Repository

আজগর দফাদারের বাড়ীতে যায়। তাঁর ছেলে হাচেন, হাতেম ও বাচচুকে ভাত খাওয়ার সময় বেলা দশটার দিকে ধরে নিয়ে বাড়ীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। পুলিশ বাহিনীর সদস্য হাচেন ও হাতেম ঘটনাস্থলে নিহত হয়। বাচচু দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে।

এখান থেকে গিয়ে বিহারী ও রাজাকাররা পার্শ্ববর্তী আবু সাঈদের বাড়ী (সাতটি পরিবারভুক্ত বাড়ী) এবং আবু ওসমান চৌধুরীর বাড়ী (চারটি পরিবারভুক্ত বাড়ী)-তে অগ্নি সংযোগ করে। এদের প্রতিহত করার জন্য ইতোমধ্যে কুঠির হাট মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে ইলিয়াস গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে শহীদ ওহাবপুর ইউনিয়নের সাত্তার খানের বাড়ীর পাশ দিয়ে খানখানাপুরে প্রবেশের পরিকল্পনা নিয়ে আসতে থাকে। এ সময় ফরিদপুর থেকে পাকবাহিনী নিয়ে একটি জীপগাড়ী রাজবাড়ীর দিকে যেতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা দলটি সি এন্ড বি রাস্তার দুই পাশে অবস্থান নিয়ে পাকবাহিনীর জীপের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশ সাত্তার খানের বাড়ীর পাশে আঁখ ক্ষেতে অবস্থান নিয়ে লাইট মেশিন গান ফিট করে। অন্য অংশ ফেলুর দোকানের পিছনে অবস্থান নেয়। পাকবাহিনীর জীপ কাছাকাছি এলে আঁখ ক্ষেতের ভিতর থেকে মুক্তিযোদ্ধারা একটি গুলি করে। পাকবাহিনী গুলি কোথা থেকে এল বুঝতে না পেরে রাস্তার উপর থেকেই এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। এসময় ফেলুর দোকানের পিছনের অংশ পাকবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। এ অবস্থায় পাকবাহিনী ফরিদপুরের দিকে পিছু হটে। এদিকে গুলির শব্দ শুনে বিহারীরা বাড়ী পোড়ানো বন্ধ করে দৌড়ে অপেক্ষমাণ ট্রেনের ইঞ্জিন ঘুরিয়ে রাজবাড়ীর দিকে যাত্রা শুরু করে। ট্রেন নিয়ে পালানোর সময় মুন্সী আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের অপর গ্রুপ রেলষ্টেশনের পূর্ব দিকে নদীর ওপার থেকে আক্রমণ শুরু করে। চলন্ত ট্রেন থেকে গুলি করতে করতে বিহারীরা রাজবাড়ীর দিকে চলে যায়। খানখানাপুর এলাকা বিহারীমুক্ত বলে জনগণ উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে।

রাজবাড়ী থেকে পাকবাহিনী যাতে খানখানাপুর প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য উল্লসিত মুক্তিযোদ্ধা ও হাজার হাজার জনতা রেলওয়ের যন্ত্রপাতি লুট করে খানখানাপুর-পাঁচুরিয়ার মাঝে খোলাবাড়িয়া রেলওয়ে ব্রিজ থেকে রেললাইন তুলে রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপর জনতা খানখানাপুর বাজারে ফিরে আসে। এদিন বিকেলে শান্তি কমিটির প্রধান চেয়ারম্যান মকবুল হোসেন মোল্লা ও বিহারী আব্দুল হাইকে জনতা ধরে ফেলে। এ দু'জনকে বাজারের উপর মকবুলের আপন ভাতিজা 'মোজা' গুলি করে হত্যা করে। এ সময় 'জয়বাংলা' ধ্বনি ও উল্লসিত জনতার বিজয় উল্লাসে গোয়ালন্দ-ফরিদপুরগামী পাকবাহিনীর তিনটি গাড়ী দ্রুত ফরিদপুরের দিকে চলে যায়। রেলষ্টেশন থেকে মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াসের নেতৃত্বে বহু লোক ফরিদপুরের দিকে রেলসংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য সি এন্ড বি সড়ক এবং রেললাইনের সংযোগ স্থলের কাছে রেল লাইন তুলে ফেলতে থাকে। এদিন অর্থাৎ ৯ই ডিসেম্বর বিকেলে রেললাইন তোলার সময় ফরিদপুর থেকে

Dhaka University Institutional Repository

হাইয়ের বাড়ীতে (পাঁচটি পরিবারভুক্ত) আগুন ধরায়। এরপর সন্ধ্যার পূর্বেই তারা ফিরে যেতে থাকে। যাবার সময় ভূল্যা দেওয়ানজীর বাড়ীর সামনে আহম্মদ মোল্লা ও আহম্মদ মল্লিককে গুলি করে হত্যা করে। উল্লসিত জনতার মধ্যে আবার শোকের ছায়া নেমে আসে। এ অবস্থার মধ্যে খানখানাপুর এলাকা সম্পূর্ণ শত্রু মুক্ত হয়।[২৫]

মুক্তিযুদ্ধে গোয়ালন্দ মহকুমা প্রশাসক শাহ মোহাম্মদ ফরিদের ভূমিকাঃ- ১৯৭১ সালের ২১ শে এপ্রিল রাজবাড়ী শহরের পতনের পর তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা প্রশাসক জনাব শাহ মোহাম্মদ ফরিদ (বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, কার্যক্রম) -কে পাকবাহিনী গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে আসে। এরপর এখান থেকে তাঁকে জয়দেবপুরে (বর্তমানে গাজীপুর) ভাওয়াল রাজার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে ৩রা জুন, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁকে বন্দী রাখা হয়। এ সময়কালে নানা প্রকার শারীরিক অত্যাচার করা হয়। ৪ঠা জুন, ১৯৭১ তারিখে পুনরায় তাঁকে একদিনের জন্য ঢাকা সেনানিবাসে নেয়া হয়। এদিন রাতে তাঁর উপর অনেক অত্যাচার করা হয়। পরদিন ৫ই জুন তাঁকে সেকেন্ড ক্যাপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত বন্দী রাখা হয়। এ সময়কালে তাঁকে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার এবং প্রশ্ন করা হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত চার্জশীট দেয়া হয়। ২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ তারিখে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান হয়। কারাগারের বাঙালী কর্মচারীরা তাঁকে সকল প্রকার সহযোগিতা করে এবং যথাসম্ভব সাচ্ছন্দে রাখার চেষ্টা করে। তাঁর সাথে অনেক সরকারী কর্মকর্তা - কর্মচারী বন্দী ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ফরিদপুরের তদানীন্তন জেলা প্রশাসক জনাব আ, ন, ম ইউসুফ, মাদারীপুরের মহকুমা প্রশাসক সৈয়দ রেজাউল হায়াত (বর্তমানে সচিব)। তাঁরা সবাই বিচারাধীন আসামী ছিলেন। ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ শুক্রবার সকালে তাঁরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্ত হন।

গোয়ালন্দ মহকুমা প্রশাসক থাকাকালে ১৯৭১ সালের ৩০-৩১শে মার্চ তারিখে জনাব শাহ মোহাম্মদ ফরিদের নির্দেশে কুষ্টিয়ায় পাক বাহিনীর সঙ্গে রাজবাড়ীর (তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা) আনসার ও মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে গোয়ালন্দ মহকুমার তিন জন আনসার শহীদ হন। এদের দু'জনের নাম আব্দুল খুদ্দুস ও আসমত। এ যুদ্ধে তিনজন আনসার আহত হন। এদের নাম খন্দকার আতিউর রহমান, আব্দুর রব ও জিয়াউদ্দীন। ২১ শে এপ্রিল, ১৯৭১ সালে গোয়ালন্দ ঘাটে পাকবাহিনীর সঙ্গে তৎকালীন ই. পি. আর, আনসার ও মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে দু'জন আনসার শহীদ হন। এদের নাম ফকির মহিউদ্দীন ও শহীদুল ইসলাম।[২৬]

২৫। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সংখ্যা।

২৬। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সহজ কথা' ৫ ই এপ্রিল,১৯৯৬ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

৫। গোলাম রহমান, পিতাঃ-অজ্ঞাত, গ্রামঃ-কাচারিপাড়া, থানাঃ-পাংশা, জেলাঃ-রাজবাড়ী। তাঁর নৌ কমান্ডো নম্বরঃ-০৪৩১।

৬। তজিম উদ্দীন আহমেদ, পিতাঃ-তারু মন্ডল, গ্রামঃ-নবকৃষ্ণপুর, থানাঃ-পাংশা, জেলাঃ-রাজবাড়ী। তাঁর নৌ কমান্ডো নম্বরঃ-০৪৩২।

রাজবাড়ী জেলার এই নৌ কমান্ডোগণ মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডো বাহিনী বা প্রধান সেনাপতির বিশেষ বাহিনীর তালিকাভুক্ত ছিল। এই তালিকাটি সি-২ ক্যাম্প পলাশী, ভারতে তৈরী ১৯৭১ সালে।[২৮]

<u>আহ্লাদীপুর ব্রিজ অপারেশনঃ</u>- রাজবাড়ী-ফরিদপুর মহাসড়কে আহ্লাদীপুর ব্রিজ অবস্থিত। রাজবাড়ী শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। রাজবাড়ী শহরে আসতে হলে, সামরিক কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই ব্রিজের উপর দিয়ে আসতে হয়। এই ব্রিজের উপর দিয়ে পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের সহযোগী অবাঙালী, রাজাকাররা জেলার বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতো।

২২শে নভেম্বর, ১৯৭১ সালে বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপুর্ণ এই আহ্লাদীপুর ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মুক্তিযোদ্ধারা। রাজবাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের আটটি গ্রুপ সক্রিয় ছিল। এই আটটি গ্রুপের মধ্যে একটি গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন কামরুল হাসান (লালী)। লালী গ্রুপের একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ (খুশী)। আহ্লাদীপুর ব্রিজ অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয় আব্দুল আজিজ (খুশী)কে। তাঁর নেতৃত্বে একদল মুক্তিযোদ্ধা দায়িত্ব পালনে সম্মত হয়। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পনার কথা রাজাকার-অবাঙালীরা পূর্বেই জেনে যায় এবং আহ্লাদীপুর ব্রিজ এলাকায় সশস্ত্র অবস্থান গ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা পরিকল্পনা মাফিক এই ব্রিজে পৌঁছানোর সাথে সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। তাঁরা রাজাকার-অবাঙালীদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে একটি গুলি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ খুশির মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এই অবস্থায় রাজাকার- অবাঙালীরা তাঁকে বন্দী করে। এরপর একটি ট্রাকের উপর বেঁধে তাঁকে সমস্ত রাজবাড়ী শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। প্রদক্ষিণ শেষে বেয়নেট চার্জ করে বর্বরোচিত ভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়। শহীদ খুশী গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা ঐ অভিযানে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। রাজাকার এবং বিহারীরা শহীদ খুশীর বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। তৎকালীন রাজবাড়ী থানা কর্মকর্তার মাধ্যমে শহীদ খুশীর লাশ দাফন করেন তাঁর পিতা জনাব হায়েজ উদ্দিন মোল্লা।

২৮। কমান্ডো মোঃ খলিলুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমান্ডো অভিযান (ঢাকা-১৯৯৭) পৃষ্ঠাঃ-২৮৩-২৮৪,১৩০-১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

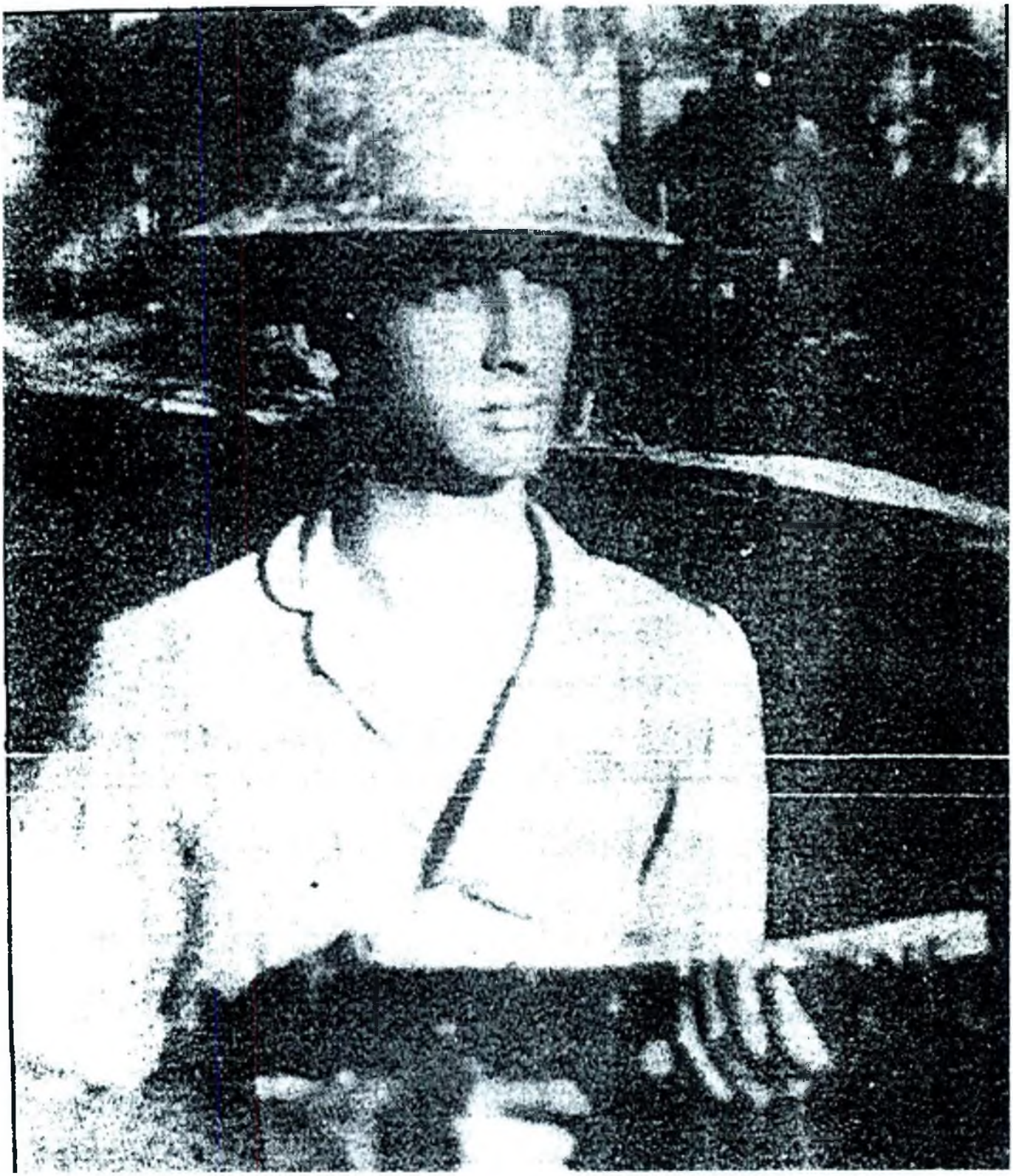

অস্ত্র হাতে শহীদ খুশী - জেলার একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ খুশীর কবরটি বর্তমানে জীর্ণ অবস্থায় আছে। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পশু বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের দেয়া ২০০০ (দুই হাজার) টাকা ভাতা পায় শহীদ খুশীর পরিবার। তৎকালীন সরকার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে বাড়ী দেয়ার ঘোষণা দেয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন সরকার প্রতিটি শহীদ পরিবারকে মাসিক এক হাজার টাকা ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে শহীদ খুশীর পরিবার অনিয়মিতভাবে এ ভাতা পান। শহীদ খুশীর পিতা-মাতার মৃত্যুর পর এ ভাতা বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর শহীদ আব্দুল আজিজ (খুশী) ক্লাব গঠন এবং রাজবাড়ী সরকারী কলেজ রোডকে 'শহীদ খুশী সড়ক' নামকরণ করা হলেও বর্তমানে এর চিহ্নমাত্র নেই।[২৯]

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ রাজবাড়ী শহরে যুদ্ধঃ-রাজবাড়ী শহর শত্রুমুক্ত করার জন্য মূলতঃ ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে আক্রমণ শুরু হয়। রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন থানা ও যশোর থেকে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের নেতৃত্বে অনেক মুক্তিযোদ্ধা রাজবাড়ী শহর মুক্ত করার জন্য এখানে যুদ্ধ করতে আসে। ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে যুদ্ধের তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়।

রাজবাড়ী শহরে বিহারী ও রাজাকাররা শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। এদের দখল থেকে শহর মুক্ত করার জন্য ১৪ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই তীব্র আক্রমণ শুরু হয়। বিহারীরাও পাল্টা হামলা চালাতে থাকে। অবিরাম গুলি বিনিময় চলতে থাকে। থেমে থেমে ব্রাশ ফায়ার। শহরের পূর্ব দিকে লোকো কলোনির বিহারীরা এদিন তীব্র পাল্টা হামলা চালাতে থাকে। তারা রেললাইনের উপর থেমে থাকা সারিবদ্ধ ওয়াগনের আড়াল থেকে গুলি করতে থাকে বর্তমান বেড়াডাঙ্গা এক নম্বর সড়কের কাছাকাছি অবস্থানকারী মুক্তিবাহিনীর তিনটি গেরিলা এ্যাম্বুশ দলকে লক্ষ্য করে। অবিশ্রান্ত ব্রাশ ফায়ার চালায় তারা। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে মুক্তিযোদ্ধাদের মাথার উপর দিয়ে পিছনে নারিকেল বাগানে পড়ছিল। বিহারীরা শহরের পূর্বদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করছিল। মুক্তিযোদ্ধারাও এ সময় বিহারী অবস্থান লক্ষ্য করে প্রচন্ড হামলা চালায়। তাঁরা রাজবাড়ী শহরকে দ্রুত শত্রুমুক্ত করতে চায়। গ্রুপ কমান্ডার ইলিয়াস আলী তিনটি গেরিলা ইউনিটকে সঙ্গে নিয়ে বিহারী অবস্থানগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে যেতে থাকে।

এদিন বেলা আড়াইটার দিকে যুদ্ধ তীব্র রূপ নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়েও বিহারীদের গেরিলা কৌশল ও সম্মুখ আক্রমণের তীব্রতায় সুবিধাজনক অবস্থানে যেতে পারছিল না। কারণ বিহারীরা রেললাইনের উপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগনকে ফায়ারিং কাভার বানিয়ে সুদৃঢ় বাংকার থেকে গুলিবর্ষণ করছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণ ওয়াগন কাভারের প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত

২৯। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, রাজবাড়ী জেলা ইউনিট কমান্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যাচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান থেকে বিহারীদের ঘাঁটির অবস্থান সঠিক ভাবে ট্রেস করা সম্ভব হচ্ছিল না। বেলা তিনটায় বিহারীদের আক্রমণ একটু কমে। এসময় মুক্তিবাহিনীর গোলন্দাজ ইউনিটের একজন সাহসী যোদ্ধা আশরাফ অগ্রবর্তী একটি বাংকার থেকে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে এবং কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্রাগারে প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং চারদিক প্রকম্পিত হয়। তীব্র শব্দের এ বিস্ফোরণের পরই বিহারী শিবিরে দারুণ কোলাহল ও আর্তনাদের শব্দ শোনা যায়। এ সময় একটি ওয়াগনের কাছে বাংকারে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড হামলা চালালে বিহারীরা আহত হয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মুক্তিযোদ্ধাদের এল, এম, জি-এর ব্রাশ ফায়ারে মারা যায়।

এ সময় ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ শিথিল করে এবং অস্ত্রের ট্রিগার 'অন' করে রেখেই হাল্কা নাশতা করে নেয়। এসময় পানির খুব অভাব ছিল কারণ তাদের জন্য মজুদকৃত পানি ও ডাব শেষ হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা রুটি খেয়ে পানি না পাওয়ায় একটা ছেলেকে ডাব গাছে উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল কিছু ডাব পাড়ার জন্য। এ সময় শত্রুপক্ষের একটি গুলি এসে তার বক্ষ ভেদ করে যায়। একটা চিৎকার দিয়ে সে গাছের নিচে পড়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় পরম করুণাময়ের কাছে হাত উঠিয়ে রাজবাড়ী শহর শত্রুমুক্ত করার আর্জি জানাতে জানাতে সে মারা যায়। বিহারী অবস্থানে অগ্নিকান্ড এবং তাদের অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ ঘটায় এবং মুক্তিবাহিনীর সুসংহত স্পোরোডিক (Sporadic) গোলবর্ষণে তারা বিভিন্ন দিকে পালাতে শুরু করে। ইতোমধ্যে সমস্ত লোকোশেড এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এসময় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ইলিয়াস আলী তাঁর রাইফেলটি শত্রু অবস্থানের দিকে তাক রেখেই তাদের অবস্থানের অগ্নিকান্ড প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে নিজ অবস্থান থেকে সামান্য একটু মাথা উঁচু করতেই শত্রু অবস্থান থেকে একটা গুলি এসে তাঁর মাথায় ও ঘাড়ে লাগে। তিনি তীব্র চিৎকার দিয়ে গড়িয়ে পড়েন রাস্তার ঢালে তাঁর বাঙ্কারে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাইফেলটি পার্শ্ববর্তী সহযোদ্ধা বাবর আলী নিয়ে নেয় এবং অপর যোদ্ধা জাফর ও অন্য কয়েকজনের সহযোগিতায় তাঁকে ধরে পিছনের দিকে রামকান্তপুর শেল্টারে নিয়ে আসে। এখান থেকে পরে মুক্তিযোদ্ধাদের পশ্চাদবর্তী নিরাপদ ক্যাম্প মাটিপাড়া নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে তাঁকে অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র বেথুলিয়া নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়। এভাবে ১৪ই ডিসেম্বরের যুদ্ধ শেষ হয়। রাজবাড়ী শহর মুক্ত হয় ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল, শনিবার।[৩০]

রাজবাড়ী জেলার পাংশা ও বালিয়াকান্দি থানায় প্রতিরোধ যুদ্ধঃ- রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জিল্লুল হাকিম (বর্তমান এম. পি), কমান্ডার আব্দুল মতিন মিঞা (সাবেক এম. পি), কমান্ডার মঞ্জুর মোরশেদ সাচচু, নাসিরুল হক সাবু, রাতুল কৃষ্ণ হালদার, আবুল কালাম আজাদ এবং অন্যান্য কমান্ডারদের নেতৃত্বে পাংশা থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হোসেন আলী, আব্দুল মালেক, শেখ আলাউদ্দীন, এনামুল হক মজনু, মোহাম্মদ

৩০। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক অনুসন্ধান", ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

আলী, গোলাম জিলানী, আমজাদ হোসেন, মাহবুব আলী, আবুল হোসেন, আজিজুল ইসলাম, ওমর আলী খান, আব্দুল হাই, আব্দুল গফুর, বিমল বিশ্বাসসহ আরো অনেকে অংশগ্রহণ করেন।

মাছপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার বাহিনীর উপর হামলা করে তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে ১৫টি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। এ যুদ্ধে রাজাকারদের অনেকে হতাহত হয়। পাংশায় চন্দনা ব্রিজ প্রহরারত রাজাকারদের উপর মুক্তিবাহিনী হামলা চালায়। এতে রাজাকারদের পরাস্ত করে একটি রাইফেল হস্তগত করে। পাংশা টেলিফোন সেন্টার আক্রমণ করে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র উদ্ধার করে। মাছপাড়াতে পাকবাহিনীর সদস্যদের বহনকারী ট্রেন আক্রমণ করা হয়। এতে শত্রুসৈন্যের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। অনেকে হতাহত হয়। কুষ্টিয়া থেকে অতিরিক্ত সৈন্য এসে তাদের উদ্ধার করে। এতে পাংশা, গোয়ালন্দ এবং ফুলবাড়ীয়া থেকে পাকবাহিনী চলে যেতে বাধ্য হয়। বালিয়াকান্দিতে নজরুল ইসলাম, আব্দুল মালেক, টগর, সোহরাব হোসেন সহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা বালিয়াকান্দি থানা আক্রমণ করে ৪টি অস্ত্র হস্তগত করে। বালিয়াকান্দি থানাধীন বহরপুর ইউনিয়নে পাকবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্পে রাজবাড়ী জেলার মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে তীব্র আক্রমণ করে। এতে পাকবাহিনীর অনেকে হতাহত হয়। এই যুদ্ধে ১২৫টি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল উদ্ধার করা হয়।[৩১]

রাজবাড়ী মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধঃ- মুক্তিযুদ্ধে রাজবাড়ী আট নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল। এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন তৎকালীন মেজর এম, এ, মঞ্জুর (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল)। আঞ্চলিক ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন মকিবুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রাজবাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান বাহিনীর আগমন প্রতিহত করার চেষ্টা করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তান বাহিনীর আধুনিক সমরাস্ত্র ও সরঞ্জামের কারণে মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হঠে। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ভারতে চলে যায় এবং সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁরা ফিরে এসে জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। রাজবাড়ী শহরের অদূরে চরনারায়নপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা একটি ক্যাম্প স্থাপন করেন।

রাজবাড়ীতে আটটি গ্রুপে বিভক্ত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। প্রত্যেক গ্রুপের একজন গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন। ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল থেকে মুক্তিযোদ্ধারা রাজবাড়ী শহর শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেন। রাজবাড়ী থানা দখল করার উদ্দেশ্যে চারদিক থেকে আক্রমণ চালানো হয়। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধারা থানা দখল করেন। তিন দিন রাজবাড়ী থানা মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। চতুর্থ দিন অবাঙালী এবং রাজাকাররা যৌথ আক্রমণ চালিয়ে থানা পুনরায় দখল করে। এরপর আবার মুক্তিযোদ্ধারা যৌথ আক্রমণ চালিয়ে থানা দখল করেন। এই দখলই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক আক্রমণে অবাঙালী এবং রাজাকাররা পিছু হঠে। যদিও

৩১। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সহজ কথা,' ৫ এপ্রিল, ১৯৯৬ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তথাপি রাজবাড়ী শত্রুমুক্ত করতে আরও তিন দিন অর্থাৎ ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ করতে হয়।

রাজবাড়ীতে অবাঙালীরা ছিল সংখ্যায় অনেক। শহরের লোকো কলোনি এবং নিউ কলোনিতে এদের শক্তিশালী অবস্থান ছিল। ২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ সালে রাজবাড়ী শহরের পতনের পর এরা রাজবাড়ী থানা এবং পাকবাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে। ১৭, ১৮ এবং ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অবাঙালী এবং রাজাকারদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ চলে। লোকো কলোনি এবং নিউ কলোনি থেকে অবাঙালীরা বাংকারে অবস্থান নিয়ে ও কখনও গাছে চড়ে গুলি চালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক আক্রমণে একপর্যায়ে তারা পিছু হঠতে থাকে এবং রাজবাড়ী শহরের পূর্ব দিকে পাঁচুরিয়া অভিমুখে পালিয়ে যায়। পাঁচুরিয়া হয়ে গোয়ালন্দের উপর দিয়ে গিয়ে মমিন খাঁর হাট নামক স্থানে এসে তারা ধরা পড়ে এবং কিছু ফরিদপুর শহরের দিকে পালিয়ে যায়। রাজবাড়ী থানা এবং লোকো কলোনি ও নিউ কলোনির পতন হলে রাজবাড়ী শহর মুক্ত হয়। তবে রাজবাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে।[৩২]

রাজবাড়ীতে অবাঙালীদের শক্তিশালী অবস্থানঃ-বর্তমান রাজবাড়ী জেলা সদরে অবাঙালীদের শক্তিশালী অবস্থান ছিল। এখানে অবাঙালী অধ্যুষিত দু'টি কলোনি ছিল। এ দু'টি কলোনির নাম লোকো কলোনি ও নিউকলোনি। এখানে বসবাসকারী সবাই ছিল অবাঙালী।

১৯৪৭ সালে ভারত - পাকিস্তান বিভাগের সময় বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশে বসবাসকারী অবাঙালী মুসলিমরা তৎকালীন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববাংলার বিভিন্ন শহরে চলে আসে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে যে সব শহরে রেল বিভাগের তৎপরতা বেশি বা রেলওয়ে শহর হিসেবে পরিচিত, সেখানে এরা বেশি সংখ্যায় আসে। বিহারী নামে এরা সমধিক পরিচিত।

এরা মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজবাড়ীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালী নিধন ও ধ্বংসযজ্ঞের অন্যতম সহায়তাকারী। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে রাজবাড়ী জেলার পার্শ্ববর্তী যশোর, কুষ্টিয়া, পোড়াদহ থেকে বিপুল সংখ্যক অবাঙালী রাজবাড়ীতে চলে আসে। এখানে এরা আসে কারণ প্রথমতঃ রাজবাড়ীতে বিপুল সংখ্যক অবাঙালী বাস করতো এবং এখানে তাদের শক্তিশালী অবস্থান ছিল। দ্বিতীয়তঃ উল্লিখিত অঞ্চলে বসবাসকারী অবাঙালীদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে বেশ কিছু অবাঙালী মারা গেলে তারা ভীত হয়ে রাজাবাড়ীতে চলে আসে। রাজবাড়ীতে অবাঙালীদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, তারা ঘোষণা করে, "পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ স্বাধীন হলেও রাজবাড়ী পাকিস্তান থাকবে।"

৩২। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, রাজবাড়ী জেলা ইউনিট কমান্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ীতে রাজাকার ও অবাঙালীদের তৎপরতা এবং পরিণতিঃ-

রাজবাড়ীতে রাজাকার এবং অবাঙালীরা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। অসংখ্য বাঙালীকে তারা হত্যা করে। অনেক নারী ধর্ষিত হয়। বাঙালীদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করে। এসব কাজে যে সমস্ত অবাঙালী ও রাজাকার নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে তারা হলোঃ-

সৈয়দ খামারঃ- অবাঙালী ও রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ। সে রাজবাড়ীতে বাঙালীদের উপর এত বেশি অত্যাচার চালায় যে তার নাম ছিল বিভীষিকার মতো। বিপুল সংখ্যক বাঙালীর হত্যাকারী ও অসংখ্য নারী ধর্ষণকারী। সৈয়দ খামার ১৬-ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে রাতে সপরিবারে পালিয়ে যাবার সময় বর্তমান রাজবাড়ী সরকারী কলেজের পিছনে ধরা পড়ে। একে বন্দী করেন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খেলাফত হোসেন। এরপর তাকে রাজবাড়ী শহরের অদূরে চরনারায়নপুর গ্রামে অবস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও রাজবাড়ী মুক্ত করতে মুক্তিযোদ্ধাদের ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হয় তথাপি সৈয়দ খামার ১৬ই ডিসেম্বর রাতে সপরিবারে পালিয়ে যাচ্ছিল।

রউফ মাষ্টার ঃ- রাজাকার এবং অবাঙালী বাহিনীর উপ প্রধান। রাজবাড়ী শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত রাজা সূর্যকুমার ইন্সটিটিউশন (উচচ বিদ্যালয়)-এর তৎকালীন অবাঙালী শিক্ষক রউফ মাষ্টার বাঙালী হত্যা, নারী ধর্ষণ ও লুটতরাজে নেতৃত্ব দেয়। রাজবাড়ীতে অসংখ্য বাঙালীকে সে হত্যা করে। কাউকে হত্যার পূর্বে যর্বোয়োচিত নির্যাতন করে। রউফ মাষ্টার ১৯৭১ সালের ১৭ ই ডিসেম্বর তারিখে রাজবাড়ী শহরের গোলজার হাজীর তেলের মিলের অভ্যন্তরে স্তুপ করা কাঠের নিচে সকাল সাড়ে নয় টায় বন্দী হয়। তাকে বন্দী করেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খেলাফত হোসেন ও মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খলিলুর রহমান। তাঁরা সুকৌশলে গোলজার হাজীর তেলের মিলের ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে মিলে ঢুকে রউফ মাষ্টারকে আটক করতে সমর্থ হন।

আকুয়াঃ- অবাঙালী আকুয়া অসংখ্য বাঙালী হত্যাকারী, নারী ধর্ষণকারী ও লুটতরাজে অংশগ্রহণকারী। রাজবাড়ী শহর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ, বাড়ীঘর জ্বালানোয় সে নেতৃত্ব দেয়। রাজবাড়ী শহরের হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী তাসের ব্যাপারীর দোতালায় লুকিয়ে থাকা অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খেলাফত হোসেন ও ডাঃ এ. টি. এম আব্দুর রাজ্জাক (উজীর) তাকে বন্দী করেন। আকুয়া-কে রাজবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধা উপ-কমান্ডার বাকাউল আবুল হাশেম শহরের চিত্রা সিনেমা হলের সামনে ব্রিজের উপর গুলি করে হত্যা করে।

জব্বারঃ- কুখ্যাত রাজাকার, বাঙালী হত্যাকারী ও নারী ধর্ষণে ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল জব্বার। অসংখ্য বাঙালীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে। মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খেলাফত হোসেন ও এ. টি. এম আব্দুর রাজ্জাক (উজীর)-এর নেতৃত্বে একদল

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধা ১৮ই ডিসেম্বর বেলা বারটায় শহরস্থ তাসের ব্যাপারীর দোতালায় লুকিয়ে থাকা অবস্থায় জব্বারকে বন্দী করেন।

আলাউদ্দীনঃ- কুখ্যাত রাজাকার এবং শান্তি কমিটির সভাপতি। বাঙালী হত্যাকারী ও নারী ধর্ষণকারী। হত্যাকান্ড, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনাকারী ও নেতৃত্ব দানকারী। রাজাকার আলাউদ্দীন কে রাজবাড়ী শহরস্থ তাসের ব্যাপারীর দোতালায় লুকিয়ে থাকা অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা মোঃ খেলাফত হোসেন ও এ,টি, এম আব্দুর রাজ্জাক (উজীর) বন্দী করেন।

এছাড়া রাজবাড়ীতে আরও অনেক বাঙালী রাজাকার ছিল। যাদের অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয় ও অনেকে পালিয়ে যায়।[৩৩]

মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজবাড়ী শহর এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের আটটি গ্রুপ ছিল। এই গ্রুপগুলোর গ্রুপ কমান্ডারগণ নিম্নরূপঃ-

শহীদুন্নবী আলম	কমান্ডার
আবুল হাশেম বাকাউল	"
ইলিয়াছ মিয়া	"
ফকির আব্দুল জব্বার	"
আকবর আলী মর্জি	"
কামরুল হাসান (লালী)	"
রফিকুল ইসলাম	"
সিরাজ আহমেদ	কমান্ডার (বি,এল,এফ)

মুক্তিযুদ্ধের পরে অস্ত্র সংগ্রহের সময়-মহসীন উদ্দিন (বতু) রাজবাড়ীতে মিলিশিয়া ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়া রাজবাড়ী শহরের বাইরের যে সকল কমান্ডার দায়িত্ব পালন করেন তাদের তালিকা নিম্নরূপঃ-

জিল্লুল হাকিম (বর্তমান এম. পি)	কমান্ডার	(পাংশা)
আব্দুল মতিন (প্রাক্তন এম. পি)	"	"
নাসিরুল হক (সানু)	"	"
আকবর হোসেন	"	(শ্রীপুর, মাগুরা)
আব্দুর রব	"	(বালিয়াকান্দি)
খেলাফত হোসেন	"	(বালিয়াকান্দি)
জালাল উদ্দিন আহমেদ(ই,পি,আর)	"	(বালিয়াকান্দি)
আকবর হোসেন	"	(বহরপুর, বালিয়াকান্দি)
আবুল হোসেন সরদার	"	(কালুখালী)[৩৪]

পাংশায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসেবে আরও যারা কর্মরত ছিলেনঃ-
মঞ্জুর মোরশেদ (সাচচু) --কমান্ডার (মুজিব বাহিনী)

---

৩৩ । মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, রাজবাড়ী জেলা ইউনিট কমান্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

রাতুল কৃষ্ণ হালদার -- কমান্ডার
আবুল কালাম আজাদ -- কমান্ডার

রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দিতে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য গৌরচন্দ্র বালা মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ করতে কাজ করেন। রাজবাড়ীতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ইলিয়াছ মিঞা, বাকাউল আবুল হাশেম রাষ্ট্রীয় ভাতা পান।

নিম্নে রাজবাড়ী জেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকজনঃ-

১। আব্দুল আজিজ (খুশী)
২। রফিক
৩। শফিক
৪। সাদেক
৫। নিয়ামত

এছাড়া যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কয়েকজন-

১। মোঃ ইলিয়াছ মিঞা
২। আবুল হাশেম বাকাউল
৩। মোঃ আব্দুল গফুর মন্ডল
৪। হাতেম আলী।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দেশের অন্যান্য অংশের মত রাজবাড়ীর জনসাধারণও সর্বোচচ ত্যাগ স্বীকার করেন। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় এ জেলায়। মুক্তিযুদ্ধে এ জেলায় যাঁরা নিহত হন তাদের কয়েকজনঃ-

১। আব্দুল জলাল
২। আবুল হোসেন
৩। মজিবর প্রামানিক
৪। আব্দুল হাকিম মিঞা
৫। মাওলানা শাহাবউদ্দিন
৬। ইয়াদুর রহমান
৭.৮। টোনা ও বাবুল (সহোদর ভাই)
৯.১০। আবুল ও গোলক (সহোদর ভাই)
১১.১২। হরি ও ধীরেন (সহোদর ভাই)
১৩। আব্দুস সামাদ
১৪। গফুর মাষ্টার

৩৪ । মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রাজবাড়ী জেলা ইউনিট কমান্ড কর্তৃপক্ষের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

এদের পাকবাহিনী, বিহারী ও রাজাকারবাহিনী গুলি করে হত্যা করে। টোনা ও বাবুল দুই সহোদর ভাইকে একসঙ্গে গুলি করে হত্যা করা হয়। হরি ও ধীরেন দুই ভাই চাউল ব্যবসায়ী ছিল। রাজবাড়ীর পতন হলে এরা অন্যান্য লোকজনের মতো শহর ছেড়ে রাজবাড়ী শহরের উত্তরে নদীর অপর পাড়ে চরাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। এসময় জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব ছিল প্রকট। এরা দুই ভাই ভাত রান্না করার লাকড়ি সংগ্রহের জন্য চরাঞ্চল থেকে রাজবাড়ী শহরের পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মীকোল গ্রামে যায়। এখানে গিয়ে তাঁরা অবাঙালী বিহারী ও রাজাকারদের মুখোমুখি হয়। বিহারী ও রাজাকাররা দু'ভাইকে গাছ থেকে ডাব পাড়তে বাধ্য করে। তারপর দুই ভাইকে দুইদিকে যেতে বলে। তাঁরা যেতে থাকলে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

রাজবাড়ীতে মুক্তিযুদ্ধের সময় সুযোগ সন্ধানী, বর্ণচোরা ও রাজাকারী চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক কিছু লোক হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পদ লুণ্ঠন করে ও অত্যাচার চালায়। তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল হিন্দুদের সম্পত্তি।

[ডাঃ এ. কে এম আসজাদ-রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানায় তাঁর গ্রামের বাড়ী। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এম. বি. বি. এস পাস করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট লীগ এবং জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি করেছেন। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন।]

ডাঃ এ. কে. এম আসজাদের বর্ণনায় রাজবাড়ীর মুক্তিযুদ্ধঃ-১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ সকালে আমি শুনতে পেলাম ঢাকা আক্রান্ত হয়েছে। থানায় রোগী দেখতে গিয়ে জানলাম। আমি চিন্তা করতে থাকলাম। এর মধ্যে ডাঃ এস. এ মালেক (বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা) আসলেন এবং আমার চেম্বারে বসলেন। উনি বললেন, বড় ভাই এখন কি করা যায়? আমি বললাম চলো আওয়ামী লীগ অফিসে যাই। উনি বললেন, আমি যাবনা। ডাঃ মালেকের সঙ্গে স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক নেতার দ্বন্দ্ব ছিল। পরে তিনি রাজি হলেন এবং আমরা আওয়ামী লীগ অফিসে গেলাম।

আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে দেখি একটি চারকোনা টেবিলের পূর্ব পাশে ডাঃ জলিলুর রহমান, কাজী হেদায়েত হোসেন, অমল কৃষ্ণ চক্রবর্তী বসে আছেন। আমাকে দেখে কাজী সাহেব বললেন, ডাঃ সাহেব এসে গেছে আর কোন চিন্তা নাই। আমি পরামর্শ দিলাম তিনটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি তিনটি হলো (১) প্রশাসন (২)প্রতিরক্ষা (৩)জনসংযোগ। আমি বললাম, অবিলম্বে কমিটি গঠন করতে হবে। কাজী হেদায়েত হোসেনকে বললাম, আপনি যেহেতু এম.পি.এ. তাই প্রশাসন কমিটির প্রধান হবেন আপনি। আর মৃধা সাহেব অর্থাৎ মোসলেম উদ্দীন মৃধা হবেন আপনার সহকারী। ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা কমিটির আমি প্রধান হব এবং ডাঃ এস. এ মালেক হবেন আমার সহকারী। জনসংযোগ কমিটিতে ডাঃ জলিল প্রধান হবেন এবং অমল কৃষ্ণ হবেন সহকারী। এরপর আমরা তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক শাহ মোহাম্মদ ফরিদ এবং

Dhaka University Institutional Repository

এস. পি.- এন. এম. খান (মিহির)-এর কাছে গেলাম। আমরা 22 Bore বন্দুক সংগ্রহ করলাম।

স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় রাজবাড়ীর মাটিতে। রাজবাড়ীর ছেলেরা প্রথম যুদ্ধ করে। আমরা কোন নির্দেশ পাই নাই। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের এক দফার আন্দোলন ছিল দেশ স্বাধীন করতে হবে। মোসলেম উদ্দীন মৃধার মাধ্যমে ২৮ শে মার্চ, ১৯৭১ পাংশায় স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানো হয়। ঐ সময় এস. পি আমাদের বলেছিলেন, আপনাদের যা সাহায্য প্রয়োজন হয় আমি দেব। আমার C. U. O. T. C (Calcutta University Officers Training Course) করা ছিল। এই ট্রেনিং মিলিটারি ট্রেনিং-এর অনুরূপ। এর ভিত্তিতে ট্রেনিং শুরু করলাম। এছাড়া বারেক মন্ডলও প্রশিক্ষক ছিলেন। গোয়ালন্দ হাই স্কুলের (বর্তমান রাজবাড়ী সরকারী উচচ বিদ্যালয়) মাঠে ট্রেনিং শুরু করা হলো। শ্রীপুরে (বর্তমান সার্কিট হাউস যেখানে অবস্থিত) এ্যাম্বুশ ট্রেনিং শুরু হয় সাতাশ তারিখেই। আটাশ তারিখে পাংশা যাই। জিল্লুল (বর্তমান সংসদ সদস্য জিল্লুল হাকিম), সাচচু প্রমুখের সঙ্গে আলাপ করলাম। তারপর মাছপাড়া গেলাম। অমূল্য বর্দ্ধনের সাথে আলাপ করলাম। এরপর বালিয়াকান্দি হয়ে ভোরে রাজবাড়ী ফিরলাম।

আমার বাসায় রাজবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধাদের হেড কোয়ার্টার ছিল। বাসায় এসে শুনলাম তাজুল ইসলাম এসেছে। ইনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (আমার ছোট ভগ্নীপতি)-কে হত্যা করা হয়েছে শুনে আমি ভেঙে পড়লাম। এর মধ্যে আমার পরিবারকে পাংশা পাঠিয়ে দিলাম। আনসারদের আমরা ট্রেনিং দিচ্ছিলাম। গোয়ালন্দের ফকীর আব্দুল জব্বার আমাদের ভাল সহায়তা করছিলেন। আক্কাছ আলী মিঞা আমাদের সাথে এলেন। ৩০ শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে আমরা খবর পেলাম কুষ্টিয়ায় কয়েকজন পাকিস্তানী সৈন্য এসেছে। ঐ দিনই আমরা আমাদের আনসার ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে রাজবাড়ী রেলষ্টেশনে গেলাম। আমরা ষ্টেশনে অবস্থান করছি এমন সময় বকু চৌধুরী (বেলগাছি) ষ্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়ে, কেডস পায়ে ও প্যান্ট-শার্ট পরিহিত অবস্থায় ষ্টেশনে এলেন। এসেই আমাকে বললেন, 'মামা আমি যাব'। আমি নিষেধ করে বললাম 'তুমি পারবে না'। কিন্তু তিনি বললেন, 'আমি যাবই'। ষ্টেশনে অনেক লোকের মধ্যে তিনি আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন এবং যাবার জন্য জিদ ধরলেন। এরপর আমি রাজি হলাম। রাজবাড়ীর এস. ডি. ও আমাদের পক্ষে ছিলেন। আমরা কুষ্টিয়া গেলাম এবং সেখানে পাক সৈন্যদের সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি যুদ্ধ হলো। বকু চৌধুরী সর্ব প্রথম গুলি ছোড়েন। কিন্তু মর্মান্তিক বিষয় হলো পরবর্তীকালে অন্তর্দলীয় কোন্দলে তাঁকে Sick Bed- এ হত্যা করা হয়। এই যুদ্ধ 'ওয়্যারলেস যুদ্ধ' নামে খ্যাত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে সরাসরি পাকবাহিনীর সঙ্গে এটিই প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের একজন, রামকোল ইউনিয়নের একজন এবং জেলার সদর থানার দাদশি ইউনিয়নের হোসনাবাদ গ্রামের একজন। এই যুদ্ধে দুই জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় রাজবাড়ীর মাটিতে। স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ-কুষ্টিয়ার ওয়্যারলেস যুদ্ধে রাজবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেন। এদের সাথে আনসার এবং ই. পি. আর. ছিলেন। পাক সৈন্যদের সঙ্গে এই প্রথম যুদ্ধে রাজবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধারা জয়লাভ করে। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বীরের ন্যায় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ২রা এপ্রিল, ১৯৭১ সকালে রাজবাড়ীতে ফিরে আসেন। ঐ দিন বিকেলে আমরা তাদের সংবর্ধনা দান করি।

এরপর ২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তানী সৈন্য গোয়ালন্দ আসে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ করছিলেন। তাঁরা রাইফেল, বন্দুক ও হাল্কা অস্ত্র ব্যবহার করছিলেন। যুদ্ধে ফকির মহিউদ্দীন নামে আনসার বাহিনীর এক সদস্য শহীদ হন। আমি নির্দেশ দিচ্ছিলাম। পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন খানখানাপুর পর্যন্ত চলে আসে তখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে। আমি রাজবাড়ীতে এসে দেখি রাজবাড়ী শহর ফাঁকা হয়ে গেছে। অল্প কিছু লোক ছাড়া সবাই পালিয়েছে। যারা ছিল আমি তাদের বললাম, আপনারা নিজেরা যা পারেন করুন।

পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন রাজবাড়ী শহরের নিকটবর্তী হয় তখন আমি, দোলন ঠাকুর, আব্দুল আজিজ (খুশী), অনয় দাস সহ আক্কাছ মিঞার একটি গাড়ীতে করে বাণীবহের দিকে যাত্রা করলাম। শেষ পর্যন্ত আব্দুল আজিজ (খুশী) এবং অনয় দাস আমার সঙ্গে রইল। বাণীবহের পরে গাজীরগাড়া ব্রিজের (বাণীবহ থেকে বালিয়াকান্দি যাবার পথে ব্রিজ) উপর গিয়ে দেখি রাজবাড়ীতে ধোঁয়া উঠছে। এখান থেকে হেঁটে বহরপুর গেলাম। বহরপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গফুর মোল্লার সঙ্গে দেখা হলো। একজন দুধ বিক্রেতা বলল, রাজবাড়ীতে ডাক্তার সাহেবের (আমার) বাড়ী এবং ডিসপেনসারি পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি পাংশায় আমার বাড়ী গেলাম। পাকিস্তানী সৈন্য এসে পাংশায় নামল। আমি বাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে দুই দিন থাকলাম। তারপর পদ্মা নদীর অপর পাড়ে গেলাম। নয় মাস দেশের ভিতরে বিভিন্ন স্থানে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হলো।[৩৫]

রাজবাড়ী জেলার কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধঃ-

ফজলুর রহমানঃ-রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার ভেল্লাকান্দি গ্রামের ফজলুর রহমান ১৯৭১ সালে বালিয়াকান্দি কলেজে বি. এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। এ কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবার পর থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনি ছিলেন ছাত্রলীগের বালিয়াকান্দি কলেজ শাখার সভাপতি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর ফজলুর রহমানের নেতৃত্বেই বালিয়াকান্দিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় ২০০ (দুইশত) মুক্তিযোদ্ধা সংগঠিত হয়। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে প্রশিক্ষণের জন্য ফজলুর রহমান ভারতে চলে যান। কিন্তু মে মাসের শুরুতে প্রশিক্ষণ না নিয়েই তিনি দেশে চলে আসেন। পরবর্তীকালে ফজলুর রহমান জুনে প্রশিক্ষণের জন্য আবার ভারতে যান। একুশ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে গ্রুপ কমান্ডার শেখ নজরুল ইসলামের

৩৫। ডাঃ এ, কে, এম আসজাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে তিনি দেশে চলে আসেন। আট নম্বর সেক্টরের অধীনে সাব সেক্টর কমান্ডার আব্দুল ওহাবের নেতৃত্বে তিনি রাজবাড়ী এবং মাগুরা এলাকার বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে রাত তিনটায় গড়াই নদীর পাড়ে ফজলুর রহমান দুই শত মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে শত্রু বাহিনীকে হামলার প্রস্তুতি নেন। পাকবাহিনী গড়াই নদীর পুরো চরে যত্রতত্র মাইন পুঁতে রেখেছিল। নির্বিঘ্নে চর পেরিয়ে কামারখালী পৌছা কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁরা হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হন। ভোর হবার আগেই কামারখালীতে অবস্থানরত শত্রুসেনাদের মোকাবেলা করার লক্ষ্যে তাঁরা এগুতে থাকে। কিন্তু চরের উপর পুঁতে রাখা মাইন অতিক্রম করে তাঁদের যেতে হচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা হামাগুড়ি দিয়ে সে রাতে কামারখালির প্রায় কাছে চলে যায়। ভোর হতে তখনও ঘন্টা খানেক বাকি ছিল। এমন সময় ফজলুর রহমান দেখেন তাঁর পেটের নীচে পাথরের মত কিছু একটা। সেটা পাথর না অন্য কিছু তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বুঝতে পারেননি। ওদিকে তাঁর সঙ্গীরা সবাই অনেকটা এগিয়ে যায়। আর কিছুটা এগুলেই মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীকে আওতার মধ্যে পেয়ে যাবে। ফজলুর রহমান পাথরের মত বস্তুটিকে হাত দিয়ে সরিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সেটিকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতেই প্রচন্ড শব্দ করে বিস্ফোরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পাকবাহিনীর পুঁতে রাখা মাইন। মাইন বিস্ফোরণের পর ফজলুর রহমান জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। প্রথমে তাকে মাগুরা হাসপাতালে নেয়া হয়। এরপর তাকে ভারতের ব্যারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য পুনায় পাঠানো হয়। মাইন বিস্ফোরণে ফজলুর রহমানের ডান চোখ এবং বাম হাত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সুস্থ হবার পর তিনি জানতে পারেন সেদিনের যুদ্ধে তাঁর সহযোদ্ধারা কামারখালীকে শত্রুমুক্ত করেছিল।[৩৬]

শহীদুন্নবী আলমঃ- ২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ পাক হানাদার বাহিনী রাজবাড়ী শহরে ঢুকেই নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। অমল চক্রবর্তী (রাজবাড়ী আওয়ামী লীগ নেতা), কাজী হেদায়েত হোসেন (তৎকালীন এম. পি. এ)-এর বাড়ী, আওয়ামী লীগ অফিস পুড়িয়ে দেয় এবং বাজারের দোকানগুলোতে অগ্নিসংযোগ করে ও লুটতরাজ চালায়। এ অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা শহীদুন্নবী আলম তাঁর পিতা আলহাজ্ব সৈয়দ আশরাফ আলী আলকাদেরীকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানী পতাকা বাড়ীতে টাঙিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যান। বেলগাছির মদাপুর এলাকায় আশ্রয় নেন। তাঁর পিতা বিকালে বাড়ীতে চলে আসে। তিনি পরদিন সকালে রাজবাড়ী এসে দেখতে পান রাজবাড়ী শহর এলাকার সমস্ত বাড়ী-ঘর, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দিয়েছে পাকবাহিনী। এদিনই তিনি বাড়ী ছেড়ে সদর থানাধীন সুলতানপুর এলাকার ধর্মশী গ্রামে চলে যান। এখানে স্থানীয় লোকদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে তাঁর আনসার ট্রেনিং থাকায় সুবিধা হয়। এমদাদ, ওবায়দুল্লাহ, জলিল, সালাম, শান্ত-সহ অনেকে ট্রেনিং নেয়। এখানে চার/পাঁচ দিন ট্রেনিং হয়। এ সময় গ্রামের অনেকেই বিশেষ করে মুসলিম লীগের অনুসারীরা তাঁর কাজে বাধা দেয়। তাঁরা শহীদুন্নবী আলমকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেয়। যে বাড়ীতে তিনি ছিলেন সে বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় তারা। এরপর তিনি ভারতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত

৩৬। দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

নেন। ধর্মশী গ্রামে তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাদের সংগঠিত করেছিলেন, ভারতে যাবার প্রাক্কালে তাদের বলেন- তোমরা থাক, আমি ভারতে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করেই ফিরে এসে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে দেশ স্বাধীন করবো। তিনি ভারতে যাবার উদ্দেশ্যে এ দিনই যাত্রা শুরু করেন এবং বানিয়ারী গ্রামে পৌঁছান। এখানে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি চিত্তরঞ্জন গুহ (বর্তমান রাজবাড়ী জেলা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচিত সভাপতি)-এর সঙ্গে দেখা হয়। চিত্তরঞ্জন গুহ ভারতে যাবেন। এখান থেকে এক সঙ্গে যাত্রা করে তাঁরা ঘোড়াখালী গ্রামে পৌঁছান। এখানে চিত্তরঞ্জন গুহ -এর এক আত্মীয় বাড়ীতে তাঁরা ওঠেন। এখানে চিত্তরঞ্জন গুহ তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। শহীদুন্নবী আলম ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর থানাধীন পাল্লা গ্রামের রস্তম মোল্লার বাড়ীতে তিনি যান। চিত্তরঞ্জন গুহ এখানে সপরিবারে আসবেন বলে চার/পাঁচ দিন অপেক্ষা করেন। এরপর একাই রওনা হয়ে মাগুরা জেলায় তেছেম ফকিরের বাড়ীতে যান। পুনরায় এখান থেকে যাত্রা করে ভারতের বনগাঁ, টালিখোলা ক্যাম্পে পৌঁছান। এ ক্যাম্পে তিনি তিন/চার দিন থাকেন। এখানে চাল, ডাল মিশ্রিত তরল খাবার খেতে দিত। এ ক্যাম্পে ফকীর আব্দুর রাজ্জাক (বর্তমানে দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় কর্মরত)-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এখানে শেখ শহীদুল ইসলাম (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী) এসে বলেন নৌবাহিনীতে লোক নেওয়া হবে, যাঁরা সাঁতারে কৃতকার্য হবে তাঁরা যোগদান করতে পারবে। শহীদুন্নবী আলম এতে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৫০ জন একসঙ্গে সাঁতার দেন এবং তিনি প্রথম হন। তিনি সহ কৃতকার্য বিশ জনকে শেখ শহীদুল ইসলাম কলকাতার ভবানীপুরে এক বাড়ীতে নিয়ে যান। এখান থেকে শহীদুন্নবী আলম শ্রীনিকেতন হোটেলে অবস্থানকারী মরহুম কাজী হেদায়েত হোসেন এবং অমল কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেন। কাজী হেদায়েত হোসেন তাঁকে দু'টি টাকা এবং একটি চিঠি দেন। এরপর তিনি জলপাইগুড়ির পাঙ্গা গিয়ে থাকেন। দুই/তিন দিন পর সিরাজুল আলম খান (তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা) জলপাইগুড়ি বিমান বন্দরে এসে রাশিয়ার কার্গো বিমানে করে তাদের দেরাদুন বিমান বন্দরে নিয়ে যান। বিমানবন্দর থেকে তাদের ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা নিজেদের গাড়ীতে তান্দুয়া নামক সেনানিবাসে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁরা কয়েক হাজার বাঙালী তরুন ট্রেনিং নেন। এটি ছিল একুশ দিনের গেরিলা ট্রেনিং। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর চৌহান ট্রেনিং দেন। ট্রেনিং-এ দৌড়, আর্মস ট্রেনিংসহ সব কিছুতেই শহীদুন্নবী আলম পারদর্শী হন। এর ফলে অনেকেই তাঁকে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেন। এ অবস্থায় তাঁকে ভাবল দৌড়, ভাবল ক্রলিং করতে বলা হয়। এতেও তিনি ক্লান্ত না হলে তাঁকে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর গুপ্তচর হিসেবে তাদের সন্দেহ পাকাপোক্ত হয়। পাংশার মরহুম আবুল কালাম আজাদ একদিন বলেই দেন যে, এলোক পাকিস্তান মিলিটারীর লোক। ভারতীয় মেজরও তাঁকে সন্দেহ করলেন। এক পর্যায়ে তাঁর প্রতি শুরু হয় নির্যাতন। তখন তিনি তাদের বলেন, ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ৫,০০০ ও ১,০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন এবং তাঁর আনসার ট্রেনিং নেয়া ছিল। কিন্তু এতেও কাজ না হলে, তিনি শ্রীনিকেতন হোটেল থেকে কাজী হেদায়েত হোসেনের দেয়া চিঠি তাদের দেখান। এ চিঠি দেখার পর শহীদুন্নবী

Dhaka University Institutional Repository

আলমের প্রতি তাদের ভুল ধারণা দূর হয়। এখান থেকে তাঁকে ব্যারাকপুর সেনানিবাসে পাঠান হয়। এখানে তোফায়েল আহমদ (বর্তমান মন্ত্রী) ছিলেন।

এখান থেকে রামপুর হাট সুইচোরা ক্যাম্পে তাঁকে পাঠানো হয় গেরিলা ট্রেনিং নেয়ার জন্য। এখান থেকে কল্যাণী ক্যাম্পে পাঠানো হয়। কল্যাণী ক্যাম্পে মেজর মঞ্জুর তাদের সাক্ষাৎকার নেন। এখান থেকে মেজর মঞ্জুর একটি চিঠি দিয়ে তাদের বয়রা (খুলনা) সীমান্তে পাঠান। এখানে মেজর হুদা তাদের শপথ গ্রহণ এবং হাতে অস্ত্র তুলে দেন। শহীদুন্নবী আলমকে ফরিদপুর জেলার দায়িত্ব দিলে তিনি রাজবাড়ী আসতে চান। তখন তাঁকে রাজবাড়ী এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁকে ফরিদপুর জেলা উইং কমান্ডার করে গ্রুপ কমান্ডার জলিল মাষ্টার সহ মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুরের কয়েকজন গ্রুপ কমান্ডার এবং রাজবাড়ীর নিখিল চক্রবর্তী (বর্তমান পৌর কমিশনার) পবন মন্ডল, অধীর, রমেন, অধীরশীল সহ প্রায় ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বাংলাদেশের মধ্যে পাঠানো হয়। পথ দেখানোর জন্য একজন গাইডও তাদের সঙ্গে ছিল। রাতে তাঁরা যশোর জেলার এক বিলের মধ্যে পৌছে। শহীদুন্নবী আলম এক সঙ্গে এত লোক চলাচল যাতে না করে সে জন্য গ্রুপ ভাগ করে দেন এবং যাঁর যাঁর গ্রুপ নিয়ে স্ব স্ব এলাকায় চলে যেতে বলেন। তিনি নিজে রাজবাড়ীর লোক নিয়ে রাজবাড়ী আসার জন্য রওনা হয়ে মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানা এলাকায় আসেন। এখান থেকে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার ডুমাইন গ্রামে আসেন। এখানে নজরুল কমান্ডার ক্যাম্প করেছিল। এখানে এসে তিনি রাজবাড়ীর বেড়াডাঙ্গা গ্রামের গোলাম মোস্তফা, করম আলী, আব্দুর রউফ (রাজা) (নাট্যশিল্পী) প্রমুখের দেখা পান। এরা সহ সকলে মিলে মূলঘর ইউনিয়নের সাইবাড়িয়া গ্রামে চলে আসেন। এখানে এসে পাংশার জিল্লুল হাকিম (বর্তমান এম,পি), বোয়ালমারীর শাহ মোঃ আবুজাফর, মঞ্জুর মোরশেদ (সাচচু), আব্দুল মতিন, হোসেন কমান্ডার, পদ্মানদীতে অবস্থানরত কামরুল হাসান (লালী), রোকন চৌধুরী, লুৎফর রহমান (বর্তমান এস, পি), ইসলাম প্রমুখের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন রাজবাড়ী আক্রমণ করার জন্য। রাজবাড়ী শহরস্থ সজ্জনকান্দা গ্রামে কাজী ইকবাল ফারুখের বাসায় তিনি রাতে আসেন। তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কথা বলেন। ফজলু মোক্তারের বাড়ীতে খবর দেন। ১১ই ডিসেম্বর রাত সাড়ে এগারটার দিকে ডাঃ এ, টি, এম আব্দুর রাজ্জাক (উজীর)-কে ঘুম থেকে ডেকে তুলে রাজবাড়ীতে শত্রু অবস্থানের সার্বিক খবর সংগ্রহ করেন। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে করতে রাত ভোর হয়ে গেলে তিনি কাজী হেদায়েত হোসেনের বাড়ী আশ্রয় নেন। এখানে মোখলেছার রহমান থাকার জায়গা করে দেয়। বিকেলে বিহারীরা খবর পেয়ে কাজী হেদায়েত হোসেনের বাড়ীতে এসে বলে, মুক্তিযোদ্ধারা এ বাড়ীতে আছে বের করে দাও। মোখলেছার এসময় বলে, মুক্তিযোদ্ধারা এ বাড়ীতে থাকেনা। এরপর তিনি নিরাপদেই রাজবাড়ীতে শত্রু অবস্থানের খবর নিয়ে মূলঘর ক্যাম্পে ফিরে যান। এরপর প্রতি রাতেই রাজবাড়ী শহরে এসে সংবাদ নিয়ে যান। ২২ শে নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ (খুন্নী) আহলাদীপুর মোড়ে বিহারী এবং রাজাকারদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন। মূলঘর ক্যাম্পে এ সময় শহীদুন্নবী আলম সহ বাকাউল, ইলিয়াস, জলিল, আকবর আলী (মর্জি), নিখিল চক্রবর্তী, লতিফ মুন্সী, আব্দুর রউফ রাজা, এরশাদুন্নবী (সেণ্ডু), টুটু, আব্দুর রহিম মোল্লা (সন্তু), উজীর ডাক্তার, শুকরী ও আরো অনেকে ছিলেন। তাঁরা হমদমপুর প্রাইমারী স্কুল মাঠে

Dhaka University Institutional Repository

এদিন বিকালে এক সমাবেশ ডাকেন। তিন/চার হাজার লোক জমায়েত হয়। তাদেরকে শত্রু পক্ষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য রাজবাড়ী-ফরিদপুর সড়কে বিশ/ত্রিশ গজ পরপর কেটে দেয়ার আহ্বান জানান শহীদুন্নবী আলম। পরদিন সে অনুযায়ী রাস্তা কাটা হয়। এরপর তিনি রাজবাড়ী শহরস্থ কুমারেশ চক্রবর্তী (নারায়ন বাবু) -এর বাড়ীতে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাতে এখানে আসেন। এসে দেখেন নারায়ন বাবুর বাড়ীর বারান্দায় একজন পুলিশ টহল দিচ্ছে। তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁর কাছে দুই ম্যাগাজিন গুলিসহ এস. এম. জি ছিল। এক সময় টহলরত পুলিশ বসে ঘুমিয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে তিনি এপ্রিং করে তন্দ্রাচ্ছন্ন পুলিশের হাঁটুর মধ্যে খাড়া করে রাখা রাইফেল তুলে নিয়ে দোতলায় চলে যান। দোতলায় ঘুমন্ত পুলিশদের অস্ত্রগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করান। এ অভিযানের পরদিন তিনি রাজবাড়ী থানা ও ট্রেজারী আক্রমণ করে দখল করেন। এর আগের দিন রাজবাড়ী পাওয়ার হাউজে বিহারীরা দুই জন বাঙালী পুলিশকে মেরে ফেলায় থানা ও ট্রেজারী দখলে সহায়ক হয়। এর ফলে রাজবাড়ী রেলগেট পর্যন্ত তাদের দখলে চলে আসে। রেলগেটের অপর পাড় শত্রুদের দখলে। তারা রেললাইনের উপর মালগাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখে। মুক্তিযোদ্ধারা রাজবাড়ী জেলা শহর শত্রুমুক্ত করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ভারী অস্ত্র তাদের কাছে ছিল না। যশোরের আকবর বাহিনীর কাছে ভারী অস্ত্র আছে জেনে সাহায্য করার জন্য শহীদুন্নবী আলম খবর পাঠান। যশোরের জামান কমান্ডারের নেতৃত্বে কয়েকশত মুক্তিযোদ্ধা ভারী অস্ত্র নিয়ে সাহায্য করার জন্য আসে। কয়েকদিনের সম্মিলিত সম্মুখ যুদ্ধের পর ১৯ শে ডিসেম্বর রাজবাড়ী শত্রুমুক্ত হয়। এ যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিক, সফিক, সাদিক, দিয়ানত, আরশাদ আলী, শুকুর শহীদ হন।

ঢাকায় পাকবাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর কাছে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে আত্মসমর্পণ করলেও রাজবাড়ীতে যুদ্ধ চলছিল। রাজবাড়ী রেলওয়ের জে. টি. আই মাদ্রাজী এক ভদ্রলোক শত্রুবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শত্রুবাহিনী সাতশত রাইফেলের বোল্ড খুলে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে বলে তিনি মধ্যস্থতা করেন। মুক্তিযোদ্ধারা এতে রাজি হন। কিন্তু শত্রুবাহিনী পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফরিদপুর থেকে আরো বাহিনী এনে মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করে রাজবাড়ী শহর সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। পরে জানা যায়, রেলওয়ের জে. টি. আই মাদ্রাজী ঐ লোক ও তাঁর পরিবারের সাত/আট জন সদস্যকে বিহারীরা তাঁর বাসা থেকে ধরে নিউকলোনিতে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে একটি কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়।[৩১]

এ. টি. এম. আব্দুর রাজ্জাকঃ-১৯৭১ সালের ১১ই ডিসেম্বর রাতে রাজবাড়ী শহরস্থ কুমারেশ চক্রবর্তীর বাড়ীতে অবস্থিত পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশদের কৌশলে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে এ, টি, এম, আব্দুর রাজ্জাক ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্পের পুলিশদের নিয়ে (হাবিলদার সহ) থানায় যান। এদিন সকাল থেকেই এ, টি, এম, আব্দুর রাজ্জাকের রাজবাড়ী শহরস্থ পাড়ায় বিহারীরা হামলা করতে পারে এমন কথা শোনা যাচ্ছিল। প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে একমাত্র সি, ও (রেভিনিউ) ছাড়া মহকুমা প্রশাসক, পুলিশের সি, আই, ও,সি কেউই সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস দেয় নাই। তবে

Dhaka University Institutional Repository

রিজার্ভ পুলিশের হাবিলদার মাহার তাঁর সকল সেপাই এবং অস্ত্র দিয়ে তাদের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

১১ই ডিসেম্বর রাতে থানায় গিয়ে এ. টি. এম. আব্দুর রাজ্জাক ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা সি. আই এবং ও. সি-র সঙ্গে কথা বললে তারা সন্তোষজনক সহযোগিতার আশ্বাস না দিলেও ওয়াজেদ মাষ্টার নামে পুলিশের একজন নায়েক চিৎকার করে বলেছিলেন, "কোন ঘুষখোর আপনাদের সহযোগিতা করবে না-দেশ মুক্ত করতে আমার বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আমি আপনাদের পাশে থাকব"। ওয়াজেদ মাষ্টার ১৩ ই ডিসেম্বর রাজবাড়ী শহরস্থ পাওয়ার হাউসের সামনে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা উসকানিতে বিহারীদের গুলিতে মারা যান।

১২ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সকালে এ. টি. এম. আব্দুর রাজ্জাক রাজবাড়ী শহরের পার্শ্ববর্তী কাজীবাধা এলাকার সবদাল মিস্ত্রীর বাড়ীতে কমান্ডার ইলিয়াস ও তাঁর গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে, মাটিপাড়া এলাকার কাশেম সরদারের বাড়ীতে আব্দুর রউফ রাজা এবং হমদমপুর কাছারী বাড়ীতে গোলাম মোস্তাফার সঙ্গে দেখা করেন এবং রাজবাড়ীতে ফিরে মরহুম ডাঃ আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার পরিবেশনের জন্য বর্তমান ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের সামনে ডাঃ বাহাউদ্দীনের পরিত্যক্ত বাড়ীতে একটি ফিডিং সেন্টার খোলেন। এদিন বিকাল থেকেই চারাদিক থেকে মুক্তিবাহিনী রাজবাড়ীর দিকে আসতে থাকে। বিহারীরা মুক্তিবাহিনীর অবস্থান বুঝতে পেরে রাজবাড়ী শহরস্থ নিউকলোনি, বাজার এবং লোকো কলোনিতে অবস্থান নেয়।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সকাল এগারটায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ইলিয়াস সংবাদ দেয় ফরিদপুর থেকে পাকহানাদার বাহিনী রাজবাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখবর জানার সঙ্গে সঙ্গে শহরের বাইরে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের সকল ইউনিটকে খবর পাঠিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস ও এ. টি. এম. আব্দুর রাজ্জাক থানায় যান এবং ও. সি-কে তাঁর অস্ত্র ও পুলিশ দিয়ে তাদের সাহায্যের অনুরোধ জানান। ও. সি থানা রক্ষার অজুহাতে তাদের সাহায্য দানে অপারগতা প্রকাশ করলে মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস থানার মালখানার তালা ভেঙে এল. এম. জি সহ অস্ত্র নিয়ে রাজবাড়ী -ফরিদপুর সড়কের কল্যাণপুরের উদ্দেশ্যে পাকবাহিনীর মোকাবিলার জন্য যাত্রা করেন। এ সময় সজ্জনকান্দা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রোকন উদ্দীন চৌধুরী ও তাঁর দলের সঙ্গে এ. টি. এম. আব্দুর রাজ্জাকের দেখা হলে তিনি তাদেরকে সাহায্যের জন্য বলেন। সন্ধ্যায় রোকন উদ্দীন চৌধুরী তাঁর পুরো দল সহ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। এদিন রাতে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নহীনুন্নবী আলম মুক্তিযোদ্ধাদের সকল ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরদিন সকাল থেকেই বিহারী ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য নির্দেশ দেন।

১৪ই ডিসেম্বর নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে কমান্ডার ইলিয়াস তাঁর দল নিয়ে রেললাইনের দক্ষিণে, ইয়াছিন উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্বে ঝেড়াডাঙ্গার ভিতর দিয়ে

৩৭। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান', ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের খুলনায় বয়রা সীমান্তে পাঠানো হয়। এখানে তিনি মুক্তিযোদ্ধা শহীদুন্নবী আলম, মহসীন উদ্দীন (বতু), তৎকালীন মেজর হুদা, মেজর মঞ্জুর ও মেজর জলিলের দেখা পান। এখান থেকে শহীদুন্নবী আলমের নেতৃত্বে তাঁরা এগার জন মুক্তিযোদ্ধা একত্রিত হয়ে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেন। এসময় তাঁর সাথে ছিলেন জলিল মাষ্টার, পবন, অধীর শীল, অধীর বিশ্বাস, আব্দুর রাজ্জাক, রমেন সাহা প্রমুখ।

তাঁরা রাজবাড়ী এসে থানা দখল করতে গেলে বিহারীদের সাথে যুদ্ধ হয়। এতে তাঁরা পিছু হটে যান। এরপর শক্তি সঞ্চয়ের কথা ভেবে তাঁরা পার্শ্ববর্তী অবস্থানে থাকা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং রাজবাড়ী মুক্ত করতে চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে রাজবাড়ীতে বিহারী এবং পুলিশ আত্মসমর্পণ করে।

নিখিল চক্রবর্তী কমান্ডার শহীদুন্নবী আলমের সঙ্গে গোয়ালন্দ মহকুমার তৎকালীন এস. ডি. ও শাহ মোহাম্মদ ফরিদের সাথে তাঁর বাসায় দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, বিহারীরা রেলগেটের দক্ষিণ পাশে যাবে না। তাদের অপর পাশে থাকতে বলেছি। এসময় বিহারীরা প্রথম রেলগেটের কাছে একটি বাংকার তৈরী করে। ঐ বাংকার ধ্বংস করতে শহীদুন্নবী আলম যশোরের আকবর কমান্ডারের কাছ থেকে "মর্টার" আনে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কুমারখালীর হাবিব, আনোয়ার আলী, হেলাল উদ্দীন, নুর আলম জিকু প্রমুখের সঙ্গে নিখিল চক্রবর্তীর সাক্ষাৎ হয়। যশোর, কুষ্টিয়া, জলঙ্গি বর্ডার, রাজবাড়ী ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে নিখিল চক্রবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

আবু তালেবঃ- কুমারখালীর সাবেক এম. পি মরহুম গোলাম কিবরিয়ার নেতৃত্বে কুষ্টিয়ায় পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে তৎকালীন ই. পি. আর.দের বিভিন্ন সরঞ্জাম জোগানোতে আবু তালেব ভূমিকা পালন করেন। ৩০ শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে কুষ্টিয়ায় রাজবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকবাহিনীর যুদ্ধে রাজবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধা আসমত যখন গুলিবিদ্ধ হন তখন তাঁর পাশে ছিলেন আবু তালেব। কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের পাশে লাশ সনাক্ত হবার পর তিনি আসমতের লাশ কাঁধে নিয়ে লালন শাহ্-এর মাজারের কাছে এনে রাখেন। ঐ যুদ্ধে পাকবাহিনী পিছু হটে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে পাকবাহিনী বিহারী, রাজাকার, আলবদরদের সাথে নিয়ে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ শুরু করে। এ অবস্থায় আবু তালেব স্থানীয় যুবকদের (চল্লিশ জন) সংগঠিত করে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কুমারখালীর তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা বরুন মাষ্টার, রাজ্জাক, হাবিব, পরিমল, গনি, পিন্টু, মজনু, সাত্তার, শিলাইদহের নাজিম, সিদ্দিক, অবতার, মনির, জব্বার, নাজির উদ্দীন ও অন্যান্যদের সাথে আবু তালেব শিকারপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে গিয়ে গোলাম কিবরিয়ার নেতৃত্বাধীন ক্যাম্পে ট্রেনিং নেন। পরবর্তীতে আবু তালেবদের গ্রুপকে বেতায় নামক জায়গায় পাঠানো হয়। এখান থেকে কড়াইগাছি নামক ক্যাম্পে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হয়। এসময় আবু তালেব শিকারপুর ক্যাম্পের সাথে যোগাযোগ রাখেন। কল্যাণীতে তিনি আক্কাছ আলী মিঞা, দারোগ আলী, বাবু মিঞা প্রমুখের দেখা পান। তাঁর বয়স তুলনামূলকভাবে কম থাকার কারণে তাঁকে বিহারের ট্রেনিং-এ নেয়া হয় না।। বিহারে যাঁরা ট্রেনিং -এ যায় তাঁরা ট্রেনিং শেষে ফিরে এলে আবু তালেব পুনরায়

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সাথে যোগ দেন। দেশে ফিরে এসে তিনি কমান্ডার হাবিব, ডেপুটি কমান্ডার আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে রাজাকার-আলবদরদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কুমারখালী গণেশগ্রাম ব্রিজের যুদ্ধে রাজাকাররা অস্ত্র ফেলে চলে যায়। শিলাইদহের খোরশেদপুর বাজারে রাজাকারদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর কমান্ডার রাজাকারদের চারটি রাইফেল ও একজন রাজাকার আটক করতে সক্ষম হন। তাঁরা চড়াইকোল ব্রিজ মাইন পেতে উড়িয়ে দেন। কুমারখালীতে ঈদের মাঠ থেকে একজন নেতৃস্থানীয় রাজাকারকে ধরে এনে তাঁর গ্রুপের নেতৃত্বে হত্যা করা হয়। কুমারখালীর পার্শ্ববর্তী কমান্ডার হাবিব, বানু, মঞ্জু প্রমুখের নেতৃত্বে কুমারখালী মুক্ত হয়। কুমারখালী মুক্ত হবার পর একটি গ্রুপ নিয়ে আবু তালেব রাজবাড়ীতে আসেন এবং দেখেন শহীদুন্নবী আলমের নেতৃত্বে লালী, নিখিল, বাকাউল প্রমুখ এবং পাংশার মহিন আজাদের গ্রুপ, যশোরের কামরুজ্জামানের গ্রুপ রাজবাড়ী মুক্ত করতে ভূমিকা রাখছেন। বর্তমানে আবু তালেব মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, রাজবাড়ী সদর থানা ইউনিট কমান্ডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বাকাউল আবুল হাশেমঃ- রাজবাড়ীতে ২১শে এপ্রিল পাকবাহিনী প্রবেশ করলে বাকাউল আবুল হাসেম তাঁর এক বন্ধু রঘুকে সঙ্গে নিয়ে জলঙ্গি সীমান্ত দিয়ে ভারতে যান। ভারতে প্রবেশ করে তিনি জানতে পারেন করিমপুরে ট্রেনিং হচ্ছে। তিনি জলঙ্গি ক্যাম্প থেকে করিমপুর ক্যাম্পে গিয়ে ভর্তি হন। করিমপুরে ট্রেনিং শেষে জামশেদপুরে ট্রেনিং নেন এবং এরপর বিহারে হায়ার ট্রেনিং নেন। এখানে এক মাস ট্রেনিং শেষে কলকাতা চলে আসেন। কল্যাণী ক্যাম্পে কাজী হেদায়েত হোসেন ও অন্যান্যদের সাথে তাঁর দেখা হয়। এখান থেকে তাঁকে বাংলাদেশের খুলনার বয়রা সীমান্তে পাঠানো হয়। এখানে তাঁকে দল গঠন করে অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে বলে জানানো হয়। তিনি দল গঠনে তৎপর হন। এরপর এগার জনের দল গঠন করে তৎকালীন মেজর হুদার নির্দেশে তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে নিজের নেতৃত্বে অক্টোবর মাসে দলসহ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। রাজবাড়ী জেলায় এসে বালিয়াকান্দির ডোমায় আশ্রয় নেন। এখান থেকে আসার পথে বালীবহতে (রাজবাড়ী থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে) মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ইলিয়াসের সাথে তাঁর দেখা হয় এবং একসঙ্গে তাঁরা থাকেন। এখান থেকে তাঁরা রসোরা (বর্তমান রাজবাড়ী সদর থানাধীন) নামক স্থানে গিয়ে পরিত্যক্ত দত্তবাড়ীতে ক্যাম্প করেন। এখান থেকে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। রাজবাড়ী-ফরিদপুর সড়কে কল্যাণপুর নামক স্থানের কাছে পাকবাহিনীর সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যার সময় পাকবাহিনী পিছু হটে যায়। এ সময় বিহারী সৈয়দ খামার ফরিদপুরের দিকে যেতে থাকলে তাকে তিনি আক্রমণ করেন কিন্তু পরাস্ত করতে সক্ষম হন নাই। এ যুদ্ধে পাকবাহিনীর দুই জন আহত হয়। বিভিন্ন স্থানে তিনি যুদ্ধে অংশ নেন। রাজবাড়ী শহরে বিহারীদের সাথে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। এতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে রাজবাড়ী মুক্ত হয়।[৩৯]

৩৯। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সহজ কথা', ৫ই এপ্রিল, ১৯৯৬ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

এম ইকরামুল হকঃ-রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার নারুয়া ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধা এম. ইকরামুল হক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রাজবাড়ী (তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমা) জেলা আনসার ক্যাম্পে কর্তব্যরত ছিলেন। ২১ শে এপ্রিল, ১৯৭১ সালে তিনি অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গোয়ালন্দ ঘাটে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। এদিন গোয়ালন্দ ঘাটের পতন হলে তিনি ছত্রভঙ্গ হয়ে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে স্থান ত্যাগ করেন। তিনি আবুল কালাম (সেনগ্রাম) আব্দুল জলিল (বাগদুলি), হানেফ আলী (কাটাখালী) সহ বালিয়াকান্দি থানার নারুয়া বাজারে পৌছেন। এখানে মোঃ তছির উদ্দিন মিঞার চায়ের দোকানে নাস্তা করেন। এরপর তাঁর সহযোদ্ধারা নিজ নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তিনি নিশ্চিন্তপুর গ্রামে গিয়ে জনৈক মন্ডল বাড়ীতে আশ্রয় নেন এবং বিভিন্ন এলাকার খবর সংগ্রহ করতে থাকেন। এ সময় স্থানীয় কতিপয় লোক তাঁর অবস্থানের কথা বালিয়াকান্দির রাজাকার আক্কেল আলীকে জানিয়ে দেয়। এদিন রাতে তিনি পালিয়ে শোলাবাড়িয়া অঞ্চলে রোস্তম আলীর বাড়ীতে যান। কিন্তু ইতোমধ্যে রোস্তম আলী স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতের দিকে যাত্রা করেন। এম. ইকরামুল হক ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এখান থেকে যাত্রা করে গড়াই নদীর ঘাটে গিয়ে রোস্তম আলীর দেখা পান। এরপর এক সঙ্গে শেওড়াতলা হয়ে ভারতে যান। তিনি সহ তাঁর দলে আটত্রিশ জন ছিলেন। তাঁরা ভারতের করিমপুরে গৌড় চন্দ্র বালার (তৎকালীন এম. পি. এ-বালিয়াকান্দি) সঙ্গে দেখা করেন। বালা বাবু তাদের সঙ্গে সহৃদয় আচরণ করেননি। এসময় এম. ইকরামুল হক জনাব আবুল বাসারের সহায়তায় করিমপুর ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হন। এরপর মেজর জলিলের সাথে তাঁর দেখা হয়। এসময় তিনিসহ ১৪ জনকে বীরভূম (বিহার)-এ ট্রেনিং -এর জন্য পাঠানো হয়। প্রায় এক মাস ট্রেনিং হয়। এখানে ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর ছিলেন কে. পি. সিং। এরপর তাঁকে কল্যাণীতে রেষ্ট ক্যাম্পে পাঠানো হয়। এখানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজবাড়ীর মহসীন উদ্দিন (বতু)। করিমপুরে শপথ নেবার পর তাঁকে অস্ত্র দেয়া হয়। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তাঁরা তিনশো পঞ্চাশ জন মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। এম. ইকরামুল হকের দলের দলপতি ছিলেন মোঃ রোস্তম আলী (শোলাবাড়ি)। তাঁর দলে ছিলেন খোরশেদ আলী মন্ডল, আব্দুল মমিন (মধুপুর), আনোয়ার হোসেন (শোলাবাড়ি), মোতাহার মোল্লা (শিলু), করিম মোল্লা, আব্দুল হামিদ, সৈয়দ মোল্লা (গাড়াখোলা), মমিন উদ্দিন (টাকাপোড়া), আব্দুল জলিল (বাগদুলি), আনছার উদ্দিন (শালমারা)। ভারতের করিমপুর থেকে যশোরের টুপিপাড়া এলাকায় আকবর আলীর বাড়ীতে আসার পথে যশোরের বড়বিলা নামক স্থানে পাকবাহিনীর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে তাদের দলের মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলী (গোপালগঞ্জ) শহীদ হন। এরপর তাঁরা যশোরের টিকাবিলা নামক স্থানের উপর দিয়ে এসে গড়াই নদী পার হয়ে বালিয়াকান্দি এসে নারুয়া গিয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যান। এরপর এম. ইকরামুল হক নারুয়ার বাকসাডাঙ্গি সাহা পাড়ায় ক্যাম্প করে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা নারুয়ায় ময়েন উদ্দিন মৃধার বাড়ী আক্রমণ করেন। কিন্তু এখানে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল। তাদের ভুল তথ্য দেয়া হয়েছিল। এ ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অঘটন ঘটে। এখানে তিনজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যান। এরপর কতিপয় ব্যক্তির ভুল তথ্যের কারণে তাদের ক্যাম্পেও মুজিব বাহিনীর সদস্যরা আক্রমণ করে। এক পর্যায়ে এম. ইকরামুল হক সাতটি রাইফেলসহ হিজলী গ্রামে কেতাব উদ্দীনের বাড়ীতে যান।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর তিনি কামারখালীতে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন। নাকোল এলাকা থেকে গড়াই নদী পার হয়ে ভুমাইন এলাকার আমবাগানে অবস্থান নেন। এখান থেকে যুদ্ধে অংশ নেন। এ যুদ্ধে হাফিজ, মফিজ এবং খলিল নিহত হন। আনোয়ারুল ইসলাম নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভারতে পাঠানো হয়। কামারখালীর যুদ্ধে নবুয়ত (টুপিপাড়া), নজরুল (ভুমাইন), খোরশেদ (ভুমাইন), সৈয়দ আহম্মেদ চৌধুরী (সোনাপুর) প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে।

এরপর তিনি বালিয়াকান্দির নারুয়ায় মুন্সী ইয়ার উদ্দিনের বাড়ীতে আসেন। এখান থেকে রাজবাড়ী শহর মুক্ত করার জন্য মর্টার নিয়ে বহরপুর গিয়ে অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দলে (মুক্তিযোদ্ধা নবুয়তের দল) যোগ দিয়ে একসঙ্গে রাজবাড়ীতে যান। এখানে রাজবাড়ী থানার দক্ষিণ দিকে মর্টার স্থাপন করা হয়। তুমুল যুদ্ধে রাজবাড়ী শহর মুক্ত হয়। এখানে জালাল আহম্মেদ (জাবরকোল), জালাল উদ্দীন (আড়কান্দি) ইলিয়াস আলী (রাজবাড়ী) প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে অস্ত্র জমা দেওয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি তাঁর অস্ত্রসহ রাজবাড়ীতে আসেন এবং মহসীন উদ্দিন মিঞা (বতু)-র নেতৃত্বে অস্ত্র জমা দেন।[৪০]

আশু ভরদ্বাজঃ- প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ, আন্দামান বন্দী, অকৃতদার আশু ভরদ্বাজ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজবাড়ীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎপর ছিলেন। আশু ভরদ্বাজের জন্মস্থান গোপালগঞ্জ জেলা হলেও তিনি রাজবাড়ীতে স্থায়ী হন। এখান থেকেই তিনি আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করেন। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে তৎপরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর জীবনের ত্রিশ বছর কারান্তরালে কাটিয়েছেন। কারাগারের বাইরেও অধিকাংশ সময় রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপন করে কাটিয়েছেন।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান এবং পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর পার্টি (তৎকালীন পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি)-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে রাজবাড়ী জেলার গ্রামে গ্রামে তরুনদের সংগঠিত করে মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রাম ইউনিট গঠন করেন এবং লাঠির সাহায্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এ কাজে তিনি রাজবাড়ীর তৎকালীন এম. পি. এ কাজী হেদায়েত হোসেন, আক্কাছ আলী মিঞা, ডাঃ এ. কে. এম. আসজ্জাদ, অমল চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ রাখেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চ, ১৯৭১ সালের ভাষণের পর মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার জন্য তিনি, কাজী হেদায়েত হোসেন এবং অমল চক্রবর্তী একটি গোপন বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা করেন। এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা বন্দুক সংগ্রহ করেন এবং পুলিশ ও বেসামরিক

৪০। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সহজ কথা', ৫ই এপ্রিল, ১৯৯৬ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনকে তাদের পক্ষে কাজ করানোর লক্ষ্যে গোপনে তাদের সাথে বৈঠক করেন। রাজবাড়ী রেলওয়ে ময়দানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন এবং নিয়মিত উপস্থিত থেকে তা তত্ত্বাবধান করেন।

২১শে এপ্রিল, ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী গোয়ালন্দ ঘাট দখল করে যখন রাজবাড়ীর দিকে আসতে থাকে, তখন আশু ভরদ্বাজ রাজবাড়ীতে স্থানীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সভা করছিলেন। এ সময় সাদা রঙের গাড়ীতে করে একজন লোক কাজী হেদায়েত হোসেন লিখিত একটি চিঠি তাঁকে সভাস্থলে দেন এবং বলেন, "পাকবাহিনীর দ্বারা গোয়ালন্দ ঘাটের পতন হয়েছে। পাকবাহিনী রাজবাড়ীর দিকে আসছে। আমরা গ্রামের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাচ্ছি, আপনারাও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান"। এরপর সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট নেতা এ্যাডভোকেট কমল কৃষ্ণ গুহ সহ আশু ভরদ্বাজ রাজবাড়ী শহর থেকে সাত মাইল দক্ষিণে বিলনয়াবাদ গ্রামে যান। এখানে তিনি ছাত্র-যুবকদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময় বিহারীরা তাঁর অবস্থান জেনে তাঁকে হত্যার জন্য তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন সেখানে হামলা করে (এ সময় রাজাকার ও বিহারীরা ভাগ্য নামক একজন ব্যক্তিকে রাস্তায় এনে জবাই করে হত্যা করে) কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা এ হামলা প্রতিরোধ করে। বিহারী সর্দার ইসরাইল, আশু ভরদ্বাজকে ধরে রাস্তায় এনে জবাই করে হত্যা করার উপক্রম করলে একদল মুক্তিযোদ্ধা দ্রুত পাল্টা হামলা চালিয়ে বিহারী ও রাজাকারদের পরাস্ত করে। বিহারী ও রাজাকাররা হতাহত হয়ে পিছু হটে যায়। এ সময় তিনি মন্তব্য করেন, অচিরেই পাকবাহিনীর পতন ঘটবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। এরপর তিনি ভারতে চলে যান এবং সেখানে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে কাজ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি রাজবাড়ীতে ফিরে আসেন।

বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করেন। তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করেন। প্রশিক্ষণস্থলে উপস্থিত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করেন। এ ছাড়া তিনি রাজবাড়ী জেলায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।[৪১]

গীতা কর (নারী মুক্তিযোদ্ধা)ঃ- রাজবাড়ী শহরের মেয়ে গীতা কর। ১৯৭১ সালের ২১শে এপ্রিল পাকবাহিনীর দ্বারা রাজবাড়ী শহরের পতন হলে অন্যান্য শহরবাসীর মত গীতা কর তাঁর চাচাতো এবং বাবাকে সঙ্গে নিয়ে শহর থেকে দূরে গ্রামে তাঁর মামার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। এখানে ১৯৭১ সালের ৫ই মে তারিখে পাকবাহিনী ও রাজাকাররা গীতা করের বাবাকে হত্যা করে। বাবার মৃত্যুর পর তিনি দেশকে হানাদারমুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে ভারতে যান এবং মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে পনেরজন নারী মুক্তিযোদ্ধার একটি দলে তিনি অন্তর্ভুক্ত হন। এই দলটিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করা হয়। পথিমধ্যে এই দলের নেত্রী তাঁর সহযোদ্ধাদের রেখে নিখোঁজ হন। এই অবস্থায় গীতা কর সহ তাঁর দলের অন্য সবাই

৪১। রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সহজ কথা', ৫ই এপ্রিল, ১৯৯৬ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

বিপদে পড়েন। প্রায় দশদিন বিভিন্ন স্থানে ঘুরে, নানা বিড়ম্বনা অতিক্রম করে তাঁরা সিলেটের সীমান্ত এলাকায় পৌছান। সেখানে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের গুপ্তচর ভেবে আটক করে। পরে ভারতীয় সৈন্যদের তাঁরা বোঝাতে সক্ষম হন তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা। এ সময় তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। ছাড়া পাবার পর গীতা কর ও তাঁর সঙ্গীরা জনৈক মাখন সোমের দেখা পান। তিনি তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মাখন সোমের সহযোগিতায় গীতা কর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আগরতলায় পৌছাতে সক্ষম হন। এখানে তাদেরকে চারশো আশি শয্যার হাসপাতালে সেবা কাজে সাহায্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়। এই হাসপাতালে থেকে গীতা কর ও তাঁর সঙ্গীরা আহত মুক্তিযোদ্ধদের সেবা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গীতা কর ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে দেশে ফিরে আসেন।"[৪২]

উপসংহারঃ- ইতিহাস সচেতনতা একটি জাতির জন্য গৌরবের। পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাস রচনার জন্য একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠ ও ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের জেলাসমূহের মধ্যে 'রাজবাড়ী জেলা' গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী। দেশের অন্যতম প্রধান নদী 'পদ্মা' এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। জেলার সমৃদ্ধ ইতিহাসের নানা পট পরিবর্তনের নীরব সাক্ষী এ নদী। কখনও বিরাট জনপদ পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়েছে, আবার নদী তীরের পলিসমৃদ্ধ জমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদনে এ নদীর ভূমিকা অপরিসীম।

জেলার গৌরবময় রাজনৈতিক ইতিহাস, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আন্দোলনে জেলাবাসীর অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় জেলাবাসীর অবদান এ জেলাকে অনন্য মর্যাদার অধিকারী করেছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থানও জেলাটিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে।

প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থপূর্ণ মানবিক কর্মকান্ডের প্রামাণিক বিশ্লেষণ করে তা বুকে ধারণ করেছে ইতিহাস। ইতিহাসের দৃষ্টি ভবিষ্যতেও নিবদ্ধ। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যত নির্মিত হতে পারে। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস রচনায় জেলা ভিত্তিক ইতিহাস সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪২। তপন কুমার দে মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ, (ঢাকা-১৯৯৮), পৃষ্ঠাঃ-৫০-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

রাজবাড়ী জেলার কয়েকজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার জীবনালেখ্য ঃ-

মোঃ আবুল হোসেন

জন্ম ঃ-১৯৩১ সাল, শহীদ-সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ পিতা-মরহুম মাওলানা ইব্রাহিম মিয়া, গ্রাম ও ডাকঘর ঃ- লক্ষীকোল, থানা ও জেলা ঃ- রাজবাড়ী।

আবুল হোসেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আনসার ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজবাড়ীর টাউন কমান্ডার ছিলেন। ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনি গোয়ালন্দ ঘাট ও কুষ্টিয়াতে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর পর ক্রমান্বয়ে পাকবাহিনী যখন বিভিন্ন শহর দখল করে নিতে থাকে তখন তিনি নিজ বাড়ী থেকে চার ভাইকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য ভারতে পাঠান। আবুল হোসেন প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় এবং তাঁর চার ভাইকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠানোর কারণে রাজবাড়ী শহর থেকে পাকবাহিনীর দালালরা তাঁর বাড়ী এসে খোঁজ খবর নিত। তিনি আত্মগোপন করে থাকতেন। ১৯৭১ সালের বাংলা আষাঢ় মাসের কোন এক সন্ধ্যায় তাঁকে নিজ বাড়ী থেকে পাকবাহিনী ও অবাঙালীরা এসে ধরে নিয়ে যায়। এর পর থেকে তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় যেহেতু পাকবাহিনী ও অবাঙালীরা তাঁকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গেছে সেহেতু তাদের হাতেই তিনি শহীদ হয়েছেন। শহীদ আবুল হোসেন বিবাহিত ছিলেন। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর পিতা-মাতা বেঁচে নেই। রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট প্রদত্ত সুবিধাদি শহীদের স্ত্রী পেয়ে থাকেন।

আরশাদ আলী সরদার ঃ-জন্ম-১৯৫০ সাল, শহীদ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১, পিতা-মোঃ আবুল কাশেম সরদার, গ্রামঃ-গঙ্গানন্দদিয়া, ডাকঘরঃ-হাবাসপুর, থানাঃ- পাংশা, জেলাঃ-রাজবাড়ী।

১৯৭১ সালে আরশাদ আলী সরদার রাজবাড়ী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হ'লে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতে চলে যান। সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে দেশের অভ্যন্তরে ৮ নম্বর সেক্টরে যোগ দেন। তাঁর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ.মঞ্জুর ও গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন মঞ্জুর মোরশেদ। আরশাদ আলী সরদার দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের সাথে অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর রাজবাড়ীতে বিহারী, পাকবাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে এক সম্মুখ সমরে গুলিবিদ্ধ হয়ে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। শহীদ আরশাদ আলী সরদারকে হাবাসপুর কাচারীর পশ্চিম পাশে কবরস্থ করা হয়। শহীদ আরশাদ আলী সরদার অবিবাহিত ছিলেন। বর্তমানে বৃদ্ধ পিতা কাশেম সরদার জীবিত। মাতা বেঁচে নেই। শহীদের তিন ভাই, তিন বোন। তিন বোনই

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহিতা। শহীদ আরশাদ আলী সরদারের পিতা রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা সহ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট প্রদত্ত সুবিধাদি পেয়ে থাকেন।

খবিরুজ্জামান (বীর বিক্রম)
জন্মঃ- ১৯৪৯ সাল, শহীদ-১২ অক্টোবর, ১৯৭১, পিতাঃ-মরহুম আব্দুল জব্বার মৃধা, গ্রাম ও ডাকঘরঃ- বাহাদুরপুর, থানাঃ-পাংশা, জেলাঃ- রাজবাড়ী।

শহীদ খবিরুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালের মে মাসে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে যান। ভারতে প্রবেশ করে তিনি বাংলাদেশ নৌ বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি ফ্রাগম্যান হিসেবে ভর্তি হন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নৌকাড হিসেবে তাঁর নম্বর-০০৬৭। প্রশিক্ষণ শেষ করে তিনি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নৌকান্ড কোর্স প্রাপ্ত হিসেবে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দরে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর প্রথম অপারেশন চট্টগ্রাম বন্দরে একটি তেলবাহী জাহাজে। তাঁর কাজ ছিল পানির নীচে মাইন বুকে বেঁধে নিয়ে জাহাজের গায়ে বিস্ফোরণ ঘটানো। এ কাজে তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। এভাবে তিনি সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন অপারেশন করেন। এধরনের এক অপারেশনের জন্য তিনি তাঁর সহকারী কমান্ডারদের নিয়ে খুলনার চালনা বন্দরে যান। সেখানে তিনি পাকবাহিনীর কয়েকটি গানবোট ও বিদেশী জাহাজ ডুবিয়ে দেন। খবিরুজ্জামানের অসীম সাহসিকতার জন্য তাঁর দলীয় অধিনায়ক তাঁকে সতর্ক করে বলেছিলেন,"অপারেশন করবে কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করে চলবে"। তাঁর এ সাহসিকতার জন্য ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জুনিয়র ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। পরবর্তীকালে ১২ অক্টোবর, ১৯৭১ তারিখে রাতে তিনি ফরিদপুরের টেকেরহাটের কুমার নদীতে পাক হানাদার বাহিনীর ফেরী লঞ্চ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মাইন বুকে করে পানিতে নেমে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নির্ধারিত স্থানে পৌছার দশ মিনিট পূর্বেই ঐ মাইন বিস্ফোরিত হয়। অবশেষে পাক হানাদার বাহিনীর গুলিতে তিনি শহীদ হন। তাঁর লাশটি চারদিন পর পানির উপর ভেসে ওঠে। সামাদ ও হামিদ নামের সহযোদ্ধা খবিরুজ্জামানের লাশ সনাক্ত করেন। শহীদ খবিরুজ্জামানের এ অসীম সাহসিকতার জন্য তাঁকে "বীর বিক্রম" খেতাবে ভূষিত করা হয়। শহীদ খবিরুজ্জামান অবিবাহিত ছিলেন। তিনি মাতা, চার ভাই ও দুই বোন রেখে যান। শহীদের মাতা সুফিয়া খাতুন রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা সহ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট প্রদত্ত সুবিধাদি পেয়ে থাকেন।

মোঃ রফিকুল ইসলামঃ-জন্মঃ- ১৯৫৩ সাল, শহীদ-১৯ আগষ্ট, ১৯৭১, পিতা-মরহুম মোঃ হাবিবুল ইসলাম, গ্রামঃ- শোলাকুড়া, ডাকঘরঃ- নলিয়া, থানাঃ- বালিয়াকান্দি, জেলাঃ- রাজবাড়ী।

মোঃ রফিকুল ইসলাম স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে চায়ের দোকান করতেন। ১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। ৪মে, ১৯৭১ তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগনায় সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর আট নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর এম, এ,মঞ্জুরের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। পরবর্তীতে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে নয় নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। সে অনুযায়ী তিনি ১৮ আগষ্ট, ১৯৭১ তারিখে আংগুরুল ইসলামের নেতৃত্বে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রায় নয় মাইল ভিতরে প্রবেশ করে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় ১৯ আগষ্ট শত্রুসেনাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে শহীদ হন। মোঃ রফিকুল ইসলাম অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর পিতা মৃত, মাতা জীবিত আছেন। তাঁর চার ভাই বোন। বর্তমানে শহীদ মোঃ রফিকুল ইসলামের মাতা রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা সহ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট প্রদত্ত সুবিধাদি পেয়ে থাকেন।

মোঃ আবুল হোসেন মোল্লাঃ-জন্মঃ- ১৯৪০ সাল, শহীদ -১৯ আগষ্ট, ১৯৭১। পিতা-মোঃ সামছুর রহমান মোল্লা, গ্রামঃ- আলোকদিয়া, ডাকঘরঃ- নলিয়া, থানাঃ- বালিয়াকান্দি, জেলাঃ- রাজবাড়ী।

১৯৭১ সালে মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা বি,এ, প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তাঁর এলাকা পাকবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ভারত গমন করেন। ভারতের বিহার প্রদেশের 'চাকুলিয়া' প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। মোঃ আবুল হোসেন মোল্লাসহ বাইশ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল ১৯৭১ সালের ১৮ আগষ্ট খুলনার বয়রা সীমান্ত এলাকায় সমস্ত রাত হাঁটার পর ভোরে আঁখ ক্ষেতে আত্মগোপন করেন। এই অবস্থায় পাকবাহিনী তাঁদের অবস্থানের কথা জানতে পেরে আকস্মিকভাবে গুলি চালাতে শুরু করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা গ্রুপ কমান্ডারের নির্দেশে পাল্টা আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা সহ দশ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। শহীদ মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর মাতা-পিতা জীবিত আছেন। তাঁরা তিন বোন ও দুই ভাই। শহীদের পিতা রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা সহ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট প্রদত্ত সুবিধাদি পেয়ে থাকেন।[১]

১। আসাদ চৌধুরী, এনামুল কবির (সম্পাদিত) "লালের রক্তে মুক্ত এদেশ" (ঢাকা-১৯৯১) পৃষ্ঠাঃ ৬৪-৬৬, ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

রাজবাড়ী পৌরসভা

রাজবাড়ী

রাজবাড়ী পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিবরণী।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম	পদবী
১	২	৩
০১।	মোঃ কাসিম উদ্দীন শেখ	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
০২।	মোঃ সেলিম শেখ	এম, এল, এস, এস
	প্রশাসন বিভাগঃ	
০৩।	মোঃ শরাফত আলী	সচিব
	সাধারণ শাখাঃ	
০৪।	রাশিদা খাতুন	প্রধান সহকারী (ভারপ্রাপ্ত)
০৫।	রওশন আরা বেগম	টাইপিষ্ট -কাম-ক্লার্ক
০৬।	মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম	ঐ
০৭।	মোঃ আবদুর রশিদ	জীব চালক
০৮।	রাবেয়া খাতুন	এম, এল, এস, এস
০৯।	আঃ আলী	ঐ
১০।	মোঃ হাবিবর রহমান	ডুপ্লিকেট মেকিং অপারেটর
১১।	মোঃ আঃ রহমান	এম, এল, এস, এস
১২।	মোঃ আঃ হামিদ	ঐ
১৩।	মোঃ সহিদুল সুলতান	দারোয়ান
১৪।	মোঃ তোরাপ আলী	মালি
১৫।	বিশ্ব নাথ পান্ডী	নৈশ প্রহরী
১৬।	মোঃ আঃ ছামাদ	ঐ
১৭।	মোঃ ফকের উদ্দিন	এম, এল, এস, এস
১৮।	মোঃ আঃ রব	ঐ
	হিসাব শাখা	
১৯।	মোঃ আঃ কুদ্দুস হাওলাদার	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
২০।	মোঃ হাবিবুর রহমান	হিসাব রক্ষক
২১।	মোঃ আতিয়ার রহমান	হিসাব সহকারী
২২।	মোঃ মোকলেছুর রহমান	ক্যাশিয়ার
২৩।	মোঃ কাইউম আলী	এম, এল, এস, এস
	এ্যাসেসমেন্ট শাখাঃ	

Dhaka University Institutional Repository

	এ্যাসেসমেন্ট শাখাঃ	
২৪।	মোঃ জালাল উদ্দিন	এ্যাসেসর
২৫।	মোঃ নুরুল্লা আবু আসাদ	সহকারী এ্যাসেসর
	আদায়/লাইসেন্স শাখা	
২৬।	মোঃ আনোয়ার হোসেন	কর আদায়কারী
২৭।	মোঃ আঃ মাজেদ	লাইসেন্স পরিদর্শক
২৮।	মোঃ মতিয়ার রহমান	সহঃ কর আদায়কারী
২৯।	মোঃ নাজিমুদ্দিন মোল্লা	ঐ
৩০।	মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ	ঐ
৩১।	মোঃ রফিকুল ইসলাম	ঐ
৩২।	মোঃ সাইয়েদুল ইসলাম	ঐ
৩৩।	মোঃ ওসমর আলী	ঐ
৩৪।	মোঃ আবদুস ছালাম	ঐ
৩৫।	মোঃ রমজান আলী	এম,এল,এস,এস
	বাজার শাখা ঃ	
৩৬।	মোঃ গোলাম মওলা	বাজার পরিদর্শক
৩৭।	মোঃ মোজাফফর হোসেন	আদায়কারী বাজার
	শিক্ষা/সাংস্কৃতিক/পাঠাগার শাখাঃ	
৩৮।	মোঃ জয়নাল আবেদীন	প্রধান শিক্ষক
৩৯।	মোঃ আঃ ছাত্তার	সহকারী শিক্ষক
৪০।	মোছাঃ মরিয়ম বেগম	ঐ
৪১।	অর্চনা রানী সাহা	ঐ
৪২।	জাহানারা বেগম	ঐ
৪৩।	মনজু রানী আচার্য	আয়া
৪৪।	মোঃ আবুল কাসেম	প্রধান শিক্ষক
৪৫।	মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী শিক্ষক
৪৬।	দিনেন্দ্র চন্দ্র দাস	ঐ
৪৭।	মোঃ আনোয়ার হোসেন	ঐ
৪৮।	মোছাঃ হোসনে আরা বেগম	ঐ
৪৯।	মোছাঃ আনোয়ারা বেগম	দপ্তরী
৫০।	মোছাঃ সাহিদা খাতুন	আয়া
	প্রকৌশল বিভাগঃ	
৫১।	মোঃ আবুল বাসার	নির্বাহী প্রকৌশলী
	পূর্ত/বিদ্যুৎ/ যান্ত্রিকঃ	
৫২।	মোঃ শামসুল আলম	সহকারী প্রকৌশলী
৫৩।	মোঃ আতিকুজ্জামান	ঐ (বিদ্যুৎ)
৫৪।	মোঃ আঃ করিম খান	সার্ভেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগঃ	
৯২।	মোঃ আব্দুর রশিদ	মেডিক্যাল অফিসার
	পরিচ্ছন্নতা শাখাঃ	
৯৩।	মোঃ ছাবেদুল হক	কজারভেন্সি ইন্সপেক্টর
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখাঃ	
৯৪।	আফরোজা ইয়াছমিন	টাইপিষ্ট কাম-ক্লার্ক
৯৫।	মোঃ শাজিম উদ্দিন পলাশ	টিকাদার সুপারভাইজার
৯৬।	মোঃমনোয়ার হোসেন	স্বাস্থ্য সহকারী
৯৭।	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন	ঐ
৯৮।	শেখ আবদুর রহমান	ঐ টিকাদার
৯৯।	মনিরা খাতুন	ঐ
১০০।	আনোয়ারা বেগম	ঐ
১০১।	রাবেয়া খাতুন	ঐ
১০২।	মজিবন নেছা	এম,এল,এস,এস
১০৩।	আবুল বাসার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

চেয়ারম্যান
রাজবাড়ী পৌরসভা।

পরিশিষ্ট-৩

রাজবাড়ী বিসিক শিল্পনগরীতে জমি বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প ইউনিট সম্পর্কিত বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	শিল্প ইউনিটের নাম	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১।	মেসার্স সপ্তগ্রাম সিল্ক প্রডাঃ সেন্টার	চালু	-
২।	" পপুলার অয়েল মিল	"	
৩।	" কামাল পাইপ (প্রাঃ) লিঃ	"	
৪।	" মেসার্স মডার্ন ফুড প্রোডাক্টস	"	
৫।	" বেষ্ট এ্যাডভারবেন্টস ম্যানুঃ	"	
৬।	" শাওন ফ্লাওয়ার মিল	"	
৭।	" প্রগতি সিল্ক ইন্ডাষ্ট্রিজ	"	
৮।	" ভাই ভাই ডাল মিল	"	ঋণের টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংক মামলা করেছে।
৯।	" আইনউদ্দিন টেক্সটাইল মিল	"	ঐ

২। রাজবাড়ী পৌরসভা থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

১০।	মেসার্স হারবোকেমি ল্যাবরেটরিজ	"	----
১১।	" ইসলাম কটন মিল	উৎপাদন বন্ধ	যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বন্ধ হয়েছে।
১২।	" ওয়ান ষ্টার রাইস মিল	"	ঋণের দায়ে ব্যাংক মামলা করেছে, ঋণ আদায়ের জন্য
১৩।	" হোসনেয়ারা উইভিং ফ্যাক্টরি	"	ঋণের টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংক মামলা করেছে
১৪।	" রাজবাড়ী কোকোনাট এ্যান্ড কয়ার ইন্ডাষ্ট্রিজ	"	"
১৫।	" মেশিন মেকার্স	"	"
১৬।	" এম, এল, ষ্টীল	"	"
১৭।	" ষ্ট্যান্ডার্ড টেক্সটাইল মিলস্	"	"
১৮।	" সম্পা বেকারী	"	"
১৯।	" রাসেল কটন ইন্ডাষ্ট্রিজ	"	"
২০।	" বি, এল, ফ্লাওয়ার মিল	"	"
২১।	" আয়েশা খান্দেশ্বরী চিনি কল	"	"
২২।	" রন্জু খান্দেশ্বরী চিনি কল	"	"
২৩।	" পদ্মা ডাল মিল	"	"
২৪।	" আলমগীর মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ	"	"
২৫।	" পুষ্প আইসক্রীম ফ্যাক্টরি	"	"
২৬।	" ফেমাস সোপ এন্ড কেমিক্যাল ষ্টাষ্ট্রিজ	নির্মাণাধীন	---
২৭।	" রফিক মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ	"	----
২৮।	" পাপড়ি মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ	----	শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই।
২৯।	" আরোহী প্রিন্টিং প্রেস	---	"
৩০।	" সার্জিক্যাল এইডস	---	"
৩১।	" সোহেল এন্টার প্রাইজ	---	"
৩২।	" খাঁন গার্মেন্টস	---	"
৩৩।	" আরিফ ইন্ডাষ্ট্রিজ	---	"
৩৪।	"পুষ্প গার্মেন্টস	---	"
৩৫।	" নুর ষ্টীল	---	"
৩৬।	" আমিনা সোলার	---	"
৩৭।	" ইউনিক অটোমোবাইল লিঃ	---	"
৩৮।	" আতিক এন্টারপ্রাইজ	---	"

৩। রাজবাড়ী বিসিক কার্যালয় থেকে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট-৪

মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাঃ-

থানা ঃ-রাজবাড়ী জেলা ঃ-রাজবাড়ী বিভাগঃ-ঢাকা

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০১০০০১	আব্দুল কাদের খান	মৃত আব্দুল লতিফ খান	আম্বারমানিক	পাঁচুরিয়া
০১১১০১০০০২	আলী আকবর	মৃত আঃ লতিফ মন্ডল	বিনোদপুর	১নং পৌরসভা
০১১১০১০০০৩	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত মোঃ জয়নাল আবেদীন	বিনোদপুর	রাজবাড়ী
০১১১০১০০০৪	কাজী মোমেন উদ্দিন আহমেদ	মৃত কাজী নাহবুব উদ্দিন আহমেদ	কাজিকান্দা	রাজবাড়ী
০১১১০১০০০৫	শ্রী নিখিল কুমার চক্রবর্তী	মৃত মনমথ নাথ চক্রবর্তী	বিনোদপুর	পৌরসভা
০১১১০১০০০৬	শহীদ উদ্দিন আহম্মদ	মৃত সামচুদ্দিন আহঃ চৌধুরী	সজ্জন কান্দা	পৌরসভা
০১১১০১০০০৭	বাকাউল আবুল হাসেম	মৃত কাসেম আলী বাকাউল	শ্রীপুর	দাদশী
০১১১০১০০০৮	মোঃ হেলাল উদ্দিন	মোঃ খোদা বক্স	লক্ষীকোল	পৌরসভা
০১১১০১০০০৯	মোঃ রুহুল আমিন	আঃ হান্নান শেখ	বাণীবহ	বাণীবহ
০১১১০১০০১০	অধীর কুমার শীল	মৃত কুঞ্জলাল শীল	হাট বাড়িয়া	খানগঞ্জ
০১১১০১০০১১	আবুল কালাম মোঃ মোস্তফা	মোঃ রমেজুদ্দিন শেখ	গোবিন্দপুর	খানগঞ্জ
০১১১০১০০১২	মোঃ শাহজাহান মিঞা	ঈমান আলী মিঞা	রামকান্তপুর	রামকান্তপুর
০১১১০১০০১৪	মোঃ তালেবুর রহমান	মৃত আব্দুল গফুর	রামচন্দ্রপুর	মিজানপুর
০১১১০১০০১৫	শহীদ ছাদেকুর রহমান	হোসেন আলী মোল্লা	চরসান নগর	সুলতানপুর
০১১১০১০০১৬	মোঃ শরীফ উদ্দিন চৌধুরী	মোঃ ফকর উদ্দিন চৌধুরী	সাংরেন্দ্রনাথপুর	দাদশী
০১১১০১০০১৭	জিতেন্দ্রনাথ কুন্ড	জতিন্দ্রনাথ কুন্ড	খানখানাপুর	খানখানাপুর
০১১১০১০০১৮	মোঃ খোরশেদ আলম খান	মৃত মৌঃ মোঃ ওমর খান	ভবানীপুর	রাজ বাড়ী
০১১১০১০০১৯	সুধীর কান্তনাগ	মৃত অমিয় কান্ত নাগ	বিনোদপুর	রাজবাড়ী
০১১১০১০০২১	মোঃ ইলিয়াছ মিয়া	মৃত মোঃ ইব্রাহীম	লক্ষীকোল	রাজবাড়ী
০১১১০১০০২২	এ,বি,এম, আঃ রউফ	মৃত ডাঃ আবদুর রহমান	সজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী
০১১১০১০০২৩	মোঃ পবন মন্ডল	মৃত দাগু মন্ডল	ধুনচী	রাজবাড়ী
০১১১০১০০২৫	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত জেনত খান	চাঁদপুর	চন্দনী
০১১১০১০০২৬	মোহাম্মদ আলী	মৃত হাজী সোনাউল্লাহ মন্ডল	মহেন্দ্রপুর	খানগঞ্জ
০১১১০১০০২৭	মোঃ আলাউদ্দিন খান	মৃত মোঃ আলিমুজ্জান খান	সুলতানপুর	সুলতানপুর
০১১১০১০০২৮	আঃ ওহাব মন্ডল	মৃত আঃ মজিদ মন্ডল	সুলতান পুর	সুলতান পুর
০১১১০১০০২৯	মৃত আঃ ছাত্তার খান	মৃত আঃ রহমান খান	আহলাদীপুর	শহীদ ওহাব পুর
০১১১০১০০৩০	মোঃ আবদুল জলিল	মৃত জাকের আলী ফকির	ধুনচী	মিজানপুর
০১১১০১০০৩১	মোঃ মোবারক হোসেন	মৃত আবদুল জলিল খাঁ	নয়নদিয়া	মিজানপুর
০১১১০১০০৩২	মোঃ আবদুল হাই	মৃত হাজী হাফেজ কাজেম	বাগমারা	মিজান পুর
০১১১০১০০৩৩	মোঃ আবদুস সোবাহান	মৃত ছানু শেখ	আড়াবাড়ীয়া	রামকান্তপুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০১০০৩৪	শ্রী শুনিল চন্দ্র বিশ্বাস	মৃত অশ্বিনী বিশ্বাস	সুলতান পুর	সুলতানপুর
০১১১০১০০৩৫	আঃ ওহাব মন্ডল	মৃত আবদুল মজিদ মন্ডল	সুলতান পুর	সুলতান পুর
০১১১০১০০৩৬	মোঃ আলাউদ্দিন	মৃত আলী বক্সখান খান	সুলতান পুর	৩ নং সুলতানপুর
০১১১০১০০৩৭	মোঃ ওমর আলী তালুকদার	মৃত নিয়াজদ্দীন	সুলতান পুর	সুলতান পুর
০১১১০১০০৩৮	মোঃ নাজির হোসেন মন্ডল	মৃত হাচেন মন্ডল	সুলতান পুর	সুলতানপুর
০১১১০১০০৩৯	সিরাজুল মৃধা	মৃত আকমল হোসেন মৃধা	আহলাদী পুর	শহীদ ওহাবপুর
০১১১০১০০৪০	হোসেন আলী দেওয়ান	মৃত মেলু দেওয়ান	আহলাদী পুর	শহীদ ওহাবপুর
০১১১০১০০৪১	মোঃ সুরুজ শেখ	মৃত ইদ্রিস আলী শেখ	কল্যাণপুর	শহীদ ওহাবপুর
০১১১০১০০৪২	মোঃ লোনা মিঞা	মৃত বেহাজ উদ্দিন মিঞা	কল্যাণপুর	শহীদ ওহাবপুর
০১১১০১০০৪৩	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত জয়নাল আবেদীন	চরঝিকড়ী	হাবাসপুর
০১১১০১০০৪৪	মোঃ হাই মিঞা	মৃত আঃ গনি মিঞা	কাচরদ্র বরাট	বরাট
০১১১০১০০৪৫	মোঃ ছাইদুল ইসলাম	মৃত মেজাহার আলী মন্ডল	সজ্জনকান্দা	২ নং পৌরসভা(রাজবাড়ী)
০১১১০১০০৪৬	মোঃ আকরামুজ্জামান	মোঃ জহুরুল হক	সজ্জনকান্দা	৩ নং পৌরসভা(রাজবাড়ী)
০১১১০১০০৪৭	মোঃ শহিদুল্লা	মৃত ছোরহাব আলী	লক্ষীকোল	১ নং পৌরসভা(রাজবাড়ী)
০১১১০১০০৪৮	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	মৃত মকবুল হোসেন	সজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০০৪৯	মোঃ আলী হোসেন	মৃত বেলায়েত মন্ডল	লক্ষীকোল রাজবাড়ী	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০০৫১	মোঃ শুকুর আলী বিশ্বাস	মৃত এনাতুল্লা বিশ্বাস	সুলতান পুর	৩ নং সুলতান পুর
০১১১০১০০৫২	ডাক্তার কামরুল আহাম্মদ	মৃত ডাঃ আঃ লতিফ মিয়া	সজ্জন কান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০০৫৩	আঃ ছালাম তালুকদার	মৃত কেলু তালুকদার	খলিসা রামকান্তপুর	সুলতানপুর
০১১১০১০০৫৪	মোঃ আকবর আলী	মৃত এম এ আঃ লতিফ	মুছিদাহ	বসন্তপুর
০১১১০১০০৫৫	মোঃ খালেক মিয়া	আঃ গফুর মিয়া	মহারাজপুর	বসন্তপুর
০১১১০১০০৫৭	হাফিজুল ইসলাম	মৃত আলেক উদ্দিন খান	নরভাঙ্গা	পাঁচুরিয়া
০১১১০১০০৫৯	মৃত মেজেক আলী	মৃত ইমান আলী সরদার	ভবদিয়া	বরাট
০১১১০১০০৬১	মোঃ আঃ গফুর	মৃত আঃ কাদের মন্ডল	মধুরদিয়া	বরাট ৩ নং ওয়ার্ড
০১১১০১০০৬২	মৃত আঃ রশিদ	আঃ গফুর মিয়া	বিনোদপুর	পৌরসভা ওয়ার্ড ৩ রাজবাড়ী
০১১১০১০০৬৩	মোঃ এনায়েত মন্ডলা	মোঃ আবদুল কাদের	ভবদিয়া	বরাট
০১১১০১০০৬৪	মোঃ আবু বক্কর	মোঃ মনছুর উদ্দিন মোল্লা	জৌকুড়া	চন্দনী
০১১১০১০০৬৫	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত রওশন আলী	জৌকুড়া	চন্দনী ১ নং ওয়ার্ড
০১১১০১০০৬৭	এ. এস. এম.এরশাদুন্নবী	আলঃ মৌঃ সৈয়দ আশরাফ আলী আলকাদরী	তবানী পুর	৩ নং ওয়ার্ড রাজবাড়ী
০১১১০১০০৬৮	আঃ কুদ্দুস ফকির	মৃত আঃ রহমান ফকির	কাচরদ্র	বরাট
০১১১০১০০৬৯	সৈয়দ আলী শেখ	হুদন আলী শেখ	লক্ষী নারায়ন পুর	বাণীবহ ৩ ং
০১১১০১০০৭০	মোঃ নকবুল হোসেন খান	মৃত মমিন খান	আটদাপুনিয়া	বাণীবহ
০১১১০১০০৭১	শেখ এম. এ মাজেদ	মৃত শেখ মোঃ মোছলেহ উদ্দিন	বেড়াভাঙ্গা	২ নং (রাজবাড়ী)

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০১০০৭৩	মোঃ আঃ হান্নান	তমিজ উদ্দিন মিয়া	লক্ষীনারায়ন পুর	বাণীবহ ৩ নং
০১১১০১০০৭৪	মোঃ জাবেদ আলী শেখ	মৃত বাচ্চু শেখ	খলিসা রামকান্তপুর	সুলতান পুর
০১১১০১০০৭৫	আঃ আজিজ	মোঃ হারেজ উদ্দিন	রেলওয়ে হাসপাতাল কলোনি	রাজবাড়ী
০১১১০১০০৭৭	কাজী আঃ মতিন	কাজী আঃ লতিফ	সজ্জনকান্দা	২ নং ওয়ার্ড রাজবাড়ী
০১১১০১০০৭৮	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত লাল চাঁদ মিয়া	বেড়াডাঙ্গা	২ নং ওয়ার্ড রাজবাড়ী
০১১১০১০০৭৯	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত মোঃ কায়েম উদ্দিন	এলাইল	বরাট
০১১১০১০০৮০	আহমেদ নিজাম মন্টু	আলহাজ্ব আব্দুল মাজেদ মোল্লা	সজ্জনকান্দা	২ নং ওয়ার্ড রাজবাড়ী
০১১১০১০০৮১	সিরাজ আহমেদ	আলহাজ্ব আব্দুল মাজেদ মোল্লা	সজ্জনকান্দ বড়পুল	২ নং ওয়ার্ড রাজবাড়ী
০১১১০১০০৮২	ডাঃ সেলিম আহমেদ	আলহাজ্ব আব্দুল মাজেদ মোল্লা	সজ্জনকান্দা	২ নং ওয়ার্ড রাজবাড়ী
০১১১০১০০৮৩	শহীদুন্নবী আলম	আলহাজ্ব সৈয়দ আশরাফ আলী আল কাদেরী	ভবানীপুর	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০০৮৫	আবু বকর	মৃত কেলু সরদার	চরখানখানাপুর	খানখানাপুর ২ নং ওয়ার্ড
০১১১০১০০৮৬	রেজাউল করিম	মৃত তেলাফ হোসেন মিয়া	খানখানাপুর	খানখানাপুর ১ নং ওয়ার্ড
০১১১০১০০৮৭	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত মৌলবী জাহির হোসেন	সজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী ২ নং
০১১১০১০০৮৯	মোঃ নুরুদ্দিন মিয়া	মৃত মোজাহার উদ্দিন মিয়া	ভবানীপুর	রাজবাড়ী ৩ নং ওয়ার্ড
০১১১০১০০৯০	মৃত হামিদুল হক	মৃত ফজলুল হক	সজ্জন কান্দা	রাজবাড়ী
০১১১০১০০৯১	মৃত বজলুল হোসেন	মৃত হাফেজ রহমান আলী	সজ্জন কান্দা	রাজবাড়ী
০১১১০১০০৯২	মৃত আনোয়ার হোসেন	মৃত সাহাজুদ্দিন ফকির	লক্ষীকোল	রাজবাড়ী
০১১১০১০০৯৩	ফকীর আব্দুল জব্বার	মৌঃ ফকীর আমির উদ্দিন	বেড়াডাঙ্গা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০০৯৪	মৃত আলতাফ হোসেন চৌধুরী	মৃত দেলবার হোসেন চৌধুরী	সজ্জন কান্দা	রাজবাড়ী ২ নং
০১১১০১০০৯৫	মোঃ তাজুল ইসলাম খান	মৃত জৈনত খান	বেলগাছি চালাহর	চন্দনী
০১১১০১০০৯৬	মোঃ আরিফ উদ্দিন খান	মৃত কাওসার হোসেন খান	সজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০০৯৮	তোফাজ্জেল হোসেন (আনসার)	মোঃ কলিমদ্দিন মন্ডল	সোনাকান্দর	মিজানপুর/৩ নং
০১১১০১০১০০	শহীদ আবুল হোসেন (আনসার)	মৃত মোঃ ইব্রাহিম	লক্ষীকোল	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১০১	মোঃ মতিয়ার রহমান(আনসার)	মৃত মোফাজ্জেল আলী	এলাইল	বরাট/৩ নং
০১১১০১০১০২	মোঃ সৈয়দ আলী শেখ (আনসার)	যদু শেখ	লক্ষী নারায়ন পুর	৩ নং বাণীবহ
০১১১০১০১০৩	আঃ জলিল শেখ(আনসার)	মৃত বাহের শেখ	সুলতান পুর	সুলতানপুর/৩ নং
০১১১০১০১০৪	শহীদ বকু চৌধুরী (আনসার)		মহেন্দ্রপুর	খানগঞ্জ
০১১১০১০১০৫	মৃত মোঃ কেরামত আলী (আনসার)	মোঃ মুজাহার শেখ	কাছরন্দ	বরাট ৩ নং
০১১১০১০১০৬	মোঃ দানেজ আলী সরদার (আনসার)	মোঃ লালন আলী সরদার	রামকান্তপুর	রামকান্তপুর
০১১১০১০১০৭	মোঃ মোহন শেখ(আনসার)	মৃত ইমান শেখ	বড় ভাকলা	বড় ভাকলা
০১১১০১০১০৮	শহীদ হাসমত আলী(আনসার)	মৃত জালাল সরদার	ধুলদী কেন্দপুর	দাদশী
০১১১০১০১০৯	মৃত সৈয়দ জাবেদ আলী (আনসার)	মৃত সৈয়দ আত্তাব আলী	বেথুলিয়া	রামকান্তপুর
০১১১০১০১১২	আঃ রাজ্জাক মিয়া(আনসার)	মৃত আবুল হোসেন মিয়া	রায়নগর	রামকান্তপুর
০১১১০১০১১৩	মোঃ আবদুল লতিফ লাল (ই,পি,আর)	মৃত ওসমান গনি খান	চরখানখানাপুর	খানখানাপুর/২নং

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০১০১১৪	মোঃ নুরুল ইসলাম (ই,পি,আর)	কলন্দর খাঁ	আকড়া	চন্দনী
০১১১০১০১১৫	মহসীন উদ্দিন বতু	আঃ মাজেদ মোল্লা	সাজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১১৬	মোঃ আঃ হাকিম শেখ	হাকিম উদ্দিন শেখ	নিয়াতপুর	দাদশী
০১১১০১০১১৭	মৃত এস,এম সফি উদ্দীন	এস,এম আইনউদ্দিন সরদার	মহেন্দ্রপুর	রতন দিয়া
০১১১০১০১১৮	মোঃ মোবারক হোসেন	মোঃ কোকিল উদ্দিন মিয়া	কোমর পাড়া	আলীপুর
০১১১০১০১১৯	ফরিদ আহমেদ	আলহাজ আবদুল মাজেদ মোল্লা	সজ্জন কান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১২০	কাজী নজরুল ইসলাম	এম,এফ, জামান	জোনাপুর	মহেশপুর ১নং ওয়ার্ড
০১১১০১০১২১	এম,এ, মজেজ	আঃ আজিজ মোল্লা	আসমাবই	দাদশী
০১১১০১০১২২	মৃত আমরাক হক খান মজলিশ	আঃ আজিজুল হক খান মজলিশ	খোদবাড়ী	খানগঞ্জ ৩নং
০১১১০১০১২৪	মৃত মৌঃ সাদেক	কটিক শেখ	চর বারবাকপুর	আলীপুর
০১১১০১০১২৫	শহীদ নায়েক খলিলুর রহমান	সৈয়দ আলী সিরাজী	কল্যাণপুর	আলীপুর
০১১১০১০১২৬	মোঃ মোস্তাক আহমেদ(সেনাবাহিনী)	মৃত যাকের আলী	নবগ্রাম	বরাট
০১১১০১০১২৮	খন্দকার নুরুল হক	মৃত খোদা বক্স	লক্ষীকোল	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৩০	মোঃ সহিদুল ইসলাম	মৃত মোজাহার আলী মন্ডল	সজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৩১	মীর শরীফুল হক	মৃত মীর তোফাজ্জেল	লক্ষীকোল	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৩২	মোঃ ইদ্রিস মিয়া	মৃত মোঃ ইব্রাহিম মিয়া	লক্ষীকোল	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৩৪	মৃত আঃ হান্নান মিয়া	মৃত আঃ আজিজ মিয়া	চর লক্ষীপুর	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৩৫	মৃত সামছুল হক	মৃত মোঃ ইব্রাহিম মিয়া	লক্ষীকোল	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৩৬	মৃত কওসার উদ্দিন	মৃত খোরশেদ তালুকদার	বিনোদপুর	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৩৭	মৃত এনামুল হক	মৃত মোঃ ইব্রাহিম মিয়া	লক্ষীকোল	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৩৯	মোঃ মোশাররফ হোসেন	মৃত মকবুল হোসেন	সজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৪০	আব্দুল মুন্নাফ	মৃত আব্দুস সামাদ	বেড়াডাঙ্গা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৪১	মোঃ আক্তার হোসেন	মৃত আবেদ আলী মিয়া	ধুনচী	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৪৩	খায়রুজ্জামান আক্তার	এম.এ মোক্তার	দঃ ভবানী পুর	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৪৫	শহীদ আঃ লতিফ মুন্সী	মৃত শরন উল্যা মুন্সী	নূরপুর	দাদশী
০১১১০১০১৪৬	মোঃ আব্দুর রশিদ	মরহুমপরশ উল্যা মুন্সী	নূর পুর	দাদশী
০১১১০১০১৪৮	মীর হাতেম আলী	মৃত মীর সেরন আলী	রঘনাথপুর	দাদশী
০১১১০১০১৪৯	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত আজগর মন্ডল	ধুঞ্চি	মিজান পুর
০১১১০১০১৫০	মোঃ ছাত্তার রহমান	মৃত মোঃ ফয়েজদ্দিন মল্লিক	মহাদেবপুর	মিজানপুর
০১১১০১০১৫১	মোঃ আব্দুল গফুর	রাইজদ্দিন ব্যাপারি	নৌকুড়ী	মিজানপুর
০১১১০১০১৫৩	বিষ্ণুপদ কুন্ডু	মৃত রাখাল চন্দ্রকুন্ড	খানখানাপুর	খানখানাপুর
০১১১০১০১৫৪	আবুল খায়ের মিয়া	মৃত মাছেম আলী মিয়া	কালিচরন পুর	আলী পুর
০১১১০১০১৫৫	শহীদ ওহাব খান	মৃত আঃ রহমান খান	আহলাদীপুর	শহীদ ওহাব পুর
০১১১০১০১৫৬	মোঃ নুরুজ্জামান	আঃ মতিন শেখ	শালী পুর	শহীদ ওহাব পুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০১০১৫৭	মোঃ মোস্তফা খান	মোঃ লতিফ খান	শাদী পুর	শহীদ ওহাব পুর
০১১১০১০১৫৮	আব্দুস ছামাদ চৌধুরী	মৃত ফকর উদ্দিন চৌধুরী	রঘুনাথপুর	দাদশী
০১১১০১০১৫৯	আবুল খায়ের	মৃত হায়দার আলী ব্যাপারী	পাঁচথুপী	আলীপুর
০১১১০১০১৬০	মোঃ ওসমান শেখ	মৃত আলিমদ্দিন শেখ	কল্যাণপুর	আলীপুর
০১১১০১০১৬১	আলিফ শেখ	মৃত আকুল শেখ	আলাদিপুর	আলীপুর
০১১১০১০১৬৩	এম.গোলাম মোস্তফা	মৃত মহব্বত উল্লা মিয়া	কাজী কান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৬৪	রোকন উদ্দিন চৌধুরী	মৃত ফকর উদ্দিন	রঘুনাথপুর	দাদশী
০১১১০১০১৬৫	মৃত মোঃ ইদ্রিস মোল্লা	আব্দুল গনি মোল্লা	কল্যাণপুর	আলীপুর ৩ নং
০১১১০১০১৬৬	মোঃ মাইনউদ্দিন মন্ডল	মৃত মোঃ আয়ন উদ্দিন	বিনোদপুর	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৬৭	সুশান্ত কুমার সাহা	ক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা	বিনোদপুর	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৬৮	মৃত মোঃ আবু বকর মিয়া	আঃ করিম মিয়া	নবগ্রাম	বরাট ৩
০১১১০১০১৭০	মোঃ রুস্তম আলী	মৃত নিমাই মন্ডল	দক্ষিণ ভবানী পুর	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৭২	শহীদ ছাদেক আলী মোল্লা	মোঃ হোসেন আলী মোল্লা	চরশ্যামনগর	সুলতানপুর
০১১১০১০১৭৪	মৃত মকছের আলী	মৃত নূর বক্স	নবগ্রাম	বরাট
০১১১০১০১৭৫	মৃত মোঃ আবুল হাসান	ফাজেল সরদার	গোপালবাড়ী	বরাট
০১১১০১০১৭৬	মৃত মেজেক আলী	মৃত ইমান সরদার	সাতার	বরাট
০১১১০১০১৭৭	মোঃ ছাদেক আলী মোল্লা	মৃত আঃ হামিদ মোল্লা	বাদিয়া	মূলঘর
০১১১০১০১৭৮	মোঃ আঃ জলিল বেগ	মৃত জনাব আলী বেগ	গোপালপুর	মূলঘর
০১১১০১০১৮১	মোহাম্মদ আলী শেখ	মৃত হোসেন আলী শেখ	নিজপাড়া	বাণীবহ
০১১১০১০১৮৩	মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা	মৃত আলীমুদ্দীন মোল্লা	ভবদিয়া	বরাট
০১১১০১০১৮৪	মৃত আলাউদ্দিন খান	মৃত হোসেন আলী খান	কাজীকান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৮৬	মোঃ আবুল খায়ের	মৃত আসমত আলী মল্লিক	কোলাইল	পাঁচুরিয়া
০১১১০১০১৮৭	অসীম চৌধুরী	শহীদ বকু চৌধুরী	মহেন্দ্রপুর	খানগঞ্জ
০১১১০১০১৮৮	আঃ মজিদ মৃধা	মোঃ আরশেদ আলী মৃধা	বাদিয়া	মূলঘর
০১১১০১০১৮৯	মোঃ আঃ রশিদ	মৃত মোঃ নাইম শেখ	বিলনওয়াবাদ	মূলঘর
০১১১০১০১৯০	ফাতেমা জিনাত	মোজাহের হোসেন	সজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৯১	মোঃ আবুল বাসার	কলন্দর খাঁ	আকড়া	চন্দনী
০১১১০১০১৯২	মোঃ আঃ ছানাদ খাঁ	হন্দার হোসেন	রানগর	২ নং সুলতান পুর
০১১১০১০১৯৩	মোঃ আব্দুর রহিম মোল্লা	মৃত করম আলী মোল্লা	সজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০১৯৪	মোঃ হোসেন মোল্লা	মৃত মদন মোল্লা	সুলতানপুর	সুলতানপুর
০১১১০১০১৯৫	মোঃ নাছিরউদ্দিন সরদার	হাফেজ জয়নাল আবেদীন	সুলতান পুর	সুলতান পুর
০১১১০১০১৯৬	মোঃ নিজাম উদ্দিন	হাফেজ জয়নাল আবেদীন	সুলতান পুর	সুলতান পর
০১১১০১০১৯৭	মৃত আবুল কাশেম মিয়া	মোঃ কালু মিয়া	কোলা	বসন্তপুর
০১১১০১০১৯৮	শহীদ আঃ লতিফ মোল্লা	মৃত গোলাপ মোঃ	মহারাজপুর	বসন্তপুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০১০২০০	মোঃ আবুল কাশেম মোল্লা	মৃত রহমত আলী মোল্লা	কোলা	বসন্তপুর
০১১১০১০২০১	জি. এম.এ মন্নান	আঃ গফুর গাজী	উদয়পুর	বসন্তপুর
০১১১০১০২০৩	আঃ মজিদ শেখ	মৃত দুলাই শেখ	মজলিসপুর	মজলিজপুর
০১১১০১০২০৪	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	মৃত আইনুদ্দিন	সুলতানপুর	সুলতানপুর
০১১১০১০২০৫	আঃ মন্নান মিয়া	মৃত মোক্তার হোসেন মিয়া	খোনরপাড়া	রাতইল/ ৩ নং ওয়ার্ড
০১১১০১০২০৬	কবির আহমেদ	আব্দুল মাজেদ মোল্লা	সজ্জনকান্দা	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০২০৭	মোঃ আব্দুল হাই মিয়া	মৃত আব্দুল গনি মিয়া	কাঁচরন্দ	বরাট
০১১১০১০২০৯	মোঃ জালাল উদ্দিন শেখ	মৃত সাহাজদ্দিন শেখ	চর খানখানাপুর	খানখানাপুর
০১১১০১০২১৩	মুন্সী আঃ লতিফ	মৃত মুন্সী আবুল হোসেন	চর খানখানাপুর	খানখানাপুর
০১১১০১০২১৪	মোঃ আঃ আজিজ শেখ	মৃত কোরমান শেখ	লক্ষীপুর	বসন্তপুর
০১১১০১০২১৫	মৃত আব্দুল হান্নান	আব্দুল জব্বার	মাধব লক্ষীকোল	দাদশী
০১১১০১০২১৬	মোঃ মোকছেদ আলী দেওয়ান	মৃত দানেছ দেওয়ান	রামনগর	সুলতান পুর
০১১১০১০২১৭	মোঃ আঃ হান্নান মোল্লা	মৃত মোঃ বানু মোল্লা	পায়সাদিপুর	মূলঘর
০১১১০১০২১৮	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মোঃ মোকছেদ আলী গাজী	রশোড়া	মূলঘর
০১১১০১০২১৯	আঃ মজিদ মিয়া	মোঃ তমিজ উদ্দিন মিয়া	বাদিয়া	মূলঘর
০১১১০১০২২১	মোঃ আসাদুজ্জামান	মৃত আব্দুল খালেক মিয়া	ভবানীপুর	রাজবাড়ী পৌরসভা
০১১১০১০২২৩	আঃ লতিফ	মৃত বাহাদুর উল্লাহ সরদার	রামচন্দ্র পুর	মিজানপুর
০১১১০১০২২৫	শহীদ গফুর আলী	মোঃ কোবাদ আলী	ধুনচী	মিজানপুর
০১১১০১০২২৭	শহীদ আব্দুস সালাম মোল্লা	মৃত সেজামুদ্দিন মোল্লা	বাগমারা	মিজানপুর
০১১১০১০২২৯	আহাম্মদ আলী	মৃত দাউদ আলী মল্লিক	খোদাদাদপুর	খানগঞ্জ
০১১১০১০২৩০	মোঃ আজহার হোসেন মিয়া	মৃত আবুল হোসেন মিয়া	মহিষ বাথান	বাণীবহ

থানাঃ-পাংশা   জেলাঃ-রাজবাড়ী   বিভাগঃ-ঢাকা

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০০০১	কাজী শফিকুর রহমান	কাজী মজিবর রহমান	কলিমহর	কলিমহর
০১১১০৩০০০২	মোঃ আলাউদ্দীন	মোঃ হেলু শেখ	পারানারায়নপুর	পাংশা
০১১১০৩০০০৩	মোঃ জয়নাল আবেদীন	মৃত মজ্ঞাজ আলী প্রামানিক	কাচারী পাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০০০৪	মোঃ আজিজুল ইসলাম	মৃত আব্দুল গফুর বিশ্বাস	চরঝিকড়ি	হাবাসপুর
০১১১০৩০০০৫	খোন্দকার নওয়াব আরী	মৃত খন্দকার হাতেম আলী	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০০০৬	মোঃ মন্তাজ উদ্দীন	রমজান আলী মোল্লা	আথরজানী	মৃগী
০১১১০৩০০০৭	মোঃ ছাদেক আলী	মোঃ গহের উদ্দীন	চরঝিকড়ি	হাবাসপুর/২নং
০১১১০৩০০০৮	এবাদত হোসেন	মোঃ আমানত উদ্দিন প্রামানিক	চরপাড়া	হাবাসপুর/৩নং

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০০০৯	মোঃ আব্দুস সোবহান	মৃত আঃ মজিদ	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০০১০	মোঃ আব্দুল মতিন	মৃত হারু মন্ডল	বকশীপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০১১	মোঃ সামসুদ্দিন	সেকেন্দার আলী মোল্লা	জয়কৃষ্ণপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০১২	মৃত মোঃ মহরম মিয়া	মোঃ আঃ বারেক মিয়া	আরহাট	পাট্টা ৩নং
০১১১০৩০০১৩	মোঃ সাহাব উদ্দিন	মোঃ আলিম উদ্দিন	পুইজোর	পাট্টা
০১১১০৩০০১৪	মৃত মোঃ নুরুল ইসলাম	আয়জউদ্দিন বিশ্বাস	পাট্টা	পাট্টা ২নং
০১১১০৩০০১৫	মৃত জিতেন্দ্র নাথ মন্ডল	তুলাল মন্ডল	জোনা	পাট্টা ১নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০০১৬	মৃত শাহ মোঃ রবিউল ইলসাম	গোলাম ছামদানী	উঃ বিঃ মাজাইল	পাট্টা
০১১১০৩০০১৭	মোঃ আছমত আলী	মোঃ আঃ গনি বিশ্বাস	পালেরডাঙ্গা	শরিকল ২নং
০১১১০৩০০১৮	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মোঃ আবুল কালাম	কাচারীপাড়া	হাবাসপাড়া
০১১১০৩০০১৯	মোঃ নাজেম সরদার	হাছিনাতুল্লা সরদার	চরচিলকা	বোয়ালিয়া
০১১১০৩০০২০	আবু হোসেন সরদার	মৃত চাদ আলী সরদার	মহিমশাহী কালিকাপুর	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০০২১	মোঃ আঃ গনি	মৃত মেরাপ মোল্লা	চরশ্রীপুর	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০০২২	মোঃ নুরুল ইসলাম	মস্তাজ মন্ডল	মহিমশাহী কালিকাপুর	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০০২৩	মোঃ আব্দুস সাত্তার	মোঃ চান আলী মন্ডল	কুষ্টিয়াডাঙ্গী	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০০২৪	মোঃ আজাহার আলী	ইস্তাজ আলী মন্ডল	কুষ্টিয়াডাঙ্গী	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০০২৫	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত সজির উদ্দিন	পূর্ব ফুলকাউন্নাইর	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০০২৬	সরদার আঃ বারি	মৃত চাদ আলী সরদার	রতনদিয়া	রতনদিয়া
০১১১০৩০০২৭	মোঃ ফজলুল হক	মোঃ গনিরুদ্দিন বিশ্বাস	রতনদিয়া	রতনদিয়া
০১১১০৩০০২৮	বিমল কুমার প্রামানিক	পাতামন প্রামনিক	গঙ্গানাদপুর	রতনদিয়া
০১১১০৩০০২৯	মৃত মোঃ আনছার উদ্দিন	মৃত কিয়াম উদ্দিন বিশ্বাস	নিশ্চিন্তপুর	বাবুপাড়া
০১১১০৩০০৩০	মৃত জলিল ফকির	আজিমদ্দিন ফকির	কুড়িপাড়া	বাবুপাড়া
০১১১০৩০০৩১	আব্দুস সোবহান দেওয়ান	মৃত ছুবত দেওয়ান	সুজানগর	বাবুপাড়া
০১১১০৩০০৩২	মৃত গোলাম জিলানী	মৃত গোলাম রব্বানী	পাংশা	বাবুপাড়া
০১১১০৩০০৩৩	মোঃ ইস্তাজ উদ্দিন	মৃত প্রধান মোল্লা	গোপিনাথপুর	১নং বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০৩৪	মোঃ ইমান আলী	মৃত চাদ আলী	রঘুনন্দনপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০৩৫	মোঃ হামিদ মন্ডল	মৃত গোলাম আলী মন্ডল	বকসীপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০৩৬	ইউনুছ আলী	মৃত হুকমত আলী	সাতটা	কালিকাপুর
০১১১০৩০০৩৭	মোঃ মোকাররম হোসেন	মৃত হোচেন ফকির	বৃগোপালপুর	কালিকাপুর
০১১১০৩০০৩৮	মোঃ ছানোয়ার হোসেন	মৃত হোসেন ফকির	বৃগোপালপুর	মদাপুর
০১১১০৩০০৩৯	শষ্টি চরন প্রামানিক	মৃত পঞ্চানন প্রামানিক	দামুকদিয়া	মদাপুর
০১১১০৩০০৪০	মোঃ আঃ মন্নান মন্ডল	ইনাতুল্লা মন্ডল	বৃগোপালপুর	মদাপুর
০১১১০৩০০৪১	মোঃ আঃ খালেক মন্ডল	মৃত আঃ হামিদ মন্ডল	কাঠাবাড়ীয়া	মদাপুর
০১১১০৩০০৪২	শহীদ শফিকুল ইসলাম	মৃত কিয়ামউদ্দিন বিশ্বাস	নিশ্চিন্তপুর	বাবুপাড়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০০৪৩	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত আঃ করিম বিশ্বাস	কসবামাজাইল	কসবামাজাইল
০১১১০৩০০৪৫	মৃত ছামছুল আলম	সাহাদত হোসেন মন্ডল	ছোট কলকলিয়া	মৃগী
০১১১০৩০০৪৬	মৃত আঃ রাজ্জাক মন্ডল	এবাদ আলী মন্ডল	মেড়রা	মৃগী/১নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০০৪৭	মৃত মোঃ মুনছার আলী	দনু মন্ডল	পাচুরিয়া	মৃগী
০১১১০৩০০৪৮	মোঃ আজদুল হক	মোঃ সামছুল হক বিশ্বাস	পাট্টা	পাট্টা/২নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০০৪৯	মোঃ দেলোয়ার আলী	মুক্তাজ আলী	বহলাডাঙ্গা	হাটবনগ্রাম
০১১১০৩০০৫০	মৃত শহীদ রফিক উদ্দিন	সিদ্দিক ভুঁইয়া	জাগবীষ্ণুপুর	কলিমহর
০১১১০৩০০৫১	দীপক কুশর দত্ত	হেম চন্দ্র দত্ত	গঙ্গানোদপুর	কলিমহর
০১১১০৩০০৫২	আনোয়ার হোসেন	মৃত মজিবর রহমান	কলিমহর	কলিমহর ২নং
০১১১০৩০০৫৩	মোঃ সামসুজ্জামান মিয়া	মোঃ আঃ হাই মিয়া	কসবামাজাইল	কসবামাজাইল
০১১১০৩০০৫৪	খাঁন আব্দুল হাই	মৃত আঃ লতিফ খাঁন	যশাই	যশাই/১নং
০১১১০৩০০৫৫	মোঃ শামসুল হক	মোঃ ঈমান আলী বিশ্বাস	পারনারায়নপুর	পাংশা
০১১১০৩০০৫৬	নাজিমউদ্দিন আহঃ	মোঃ তনু মন্ডল	মাগুড়াডাঙ্গী	পাংশা
০১১১০৩০০৫৭	মোঃ আরশেদ আলী	মৃত ছেন্যাতুল্লা প্রাং	গুধীবাড়ী	পাংশা
০১১১০৩০০৫৮	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত জয়েন উদ্দিন শেখ	মাছপাডা	মাছপাড়া
০১১১০৩০০৫৯	মোঃ মকছেদ আলী খান	মৃত তাহের আলী খান	রামকোল বাহাদুরপুর	মাছপাড়া
০১১১০৩০০৬০	মৃত মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত হাসা-উল-ইসলাম	রামকোল বাহাদুরপুর	মাছপাড়া
০১১১০৩০০৬১	মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া	মৃত লোকমান হোং	রামকোল বাহাদুরপুর	মাছপাড়া ২নং
০১১১০৩০০৬২	মোঃ ফজল খাঁ	মৃত মোঃ কেতু খাঁ	বরুরিয়া	মাছপাড়া
০১১১০৩০০৬৩	মোঃ এনামুল বারী	মৃত আবেদ আলী মল্লিক	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০৬৪	মোঃ আঃ কাদের	মৃত ইয়াকুব আলী মল্লিক	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০৬৫	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত এমান আলী প্রামানিক	মৃগীবাড়ী	মৃগী/৩নং
০১১১০৩০০৬৬	মোঃ আজিজ জোয়ার্দার	মৃত আঃ মজিদ জোয়ার্দার	আড়কান্দী	মৃগী/৯নং
০১১১০৩০০৬৭	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মৃত ইসমাইল হোসেন	বাগদুলী	মৌরাট
০১১১০৩০০৬৮	মৃত আঃ জলিল বিশ্বাস	মৃত জয়ধর বিশ্বাস	বাগদুলী	মৌরাট
০১১১০৩০০৬৯	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত জিয়ারত আলী মন্ডল	বাগদুলী	মৌরাট
০১১১০৩০০৭০	দেবব্রত রায়	মৃত শৈলেন্দ্র নাথ রায়	শাওরাইল	শাওরাইল
০১১১০৩০০৭১	মোহাম্মদ আলী	মৃত অহেদ আলী মন্ডল	বিশই শাওরাইল	সাওরাইল
০১১১০৩০০৭২	মোঃ দিয়ানত আলী	মোঃ কফিল উদ্দিন খান	বড় পাতুরিয়া	সাওরাইল
০১১১০৩০০৭৩	মোঃ মনছুর আলী	মোঃ হামছেল আলী মোল্লা	পাতুরিয়া	সাওরাইল/৩নং
০১১১০৩০০৭৪	সিদ্দিকুর রহমান	মহিউদ্দিন	ভিটি	সাওরাইল
০১১১০৩০০৭৫	মোঃ আমজাদ হোসেন	আফতাব উদ্দিন	গুধিবাড়ী	পাংশা
০১১১০৩০০৭৬	মোঃ সামসুদ্দিন	সেকেন্দার আলী মোল্লা	জয়কৃষ্ণপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০৭৭	মোঃ আজিজুল ইসলাম	মোঃ মোহন খান	চন্দনিকাড়ী পূর্ব পাড়া	হাবাসপুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০০৭৮	মোঃ ছাদেক আলী	মোঃ গহের উদ্দিন	চরঝিকড়ী	হাবাসপুর
০১১১০৩০০৭৯	মোঃ ছাবেদ আলী জোয়াদ্দার	মোঃ আবেদ আলী	সুবর্ন কোলা	কশবা মাজাইল
০১১১০৩০০৮০	মোঃ খয়বর আলী বিশ্বাস	আঃ জব্বার বিশ্বাস	নাদুরিয়া	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০০৮১	নীল মনি পাল	মৃত লোহারাম পাল	নারায়নপুর	১নং পৌরসভা
০১১১০৩০০৮২	স্বপন বিশ্বাস	গুরু প্রসাদ বিশ্বাস	কুড়াপাড়া	পাংশা
০১১১০৩০০৮৩	মোঃ আঃ গফুর	মৃত মনসুর আলী প্রাঃ	মাছপাড়া	মাছপাড়া ৩নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০০৮৪	শ্রী গনেশ চন্দ্র দাস	মৃত গবিন্দ লাল দাস	মৌকুড়ী	পাংশা
০১১১০৩০০৮৫	মৃত সুকুমার অধিকারী	মৃত সুবির কুমার অধিকারী	কালিকাপুর	কালিকাপুর
০১১১০৩০০৮৬	শহীদ আঃ কাদের	মৃত হাফেজ উদ্দীন প্রামানিক	চরঝিকড়ী	হাবাসপুর
০১১১০৩০০৮৭	মোঃ আব্দুল্লাহ	মৃত আব্দুস সাত্তার শেখ	যশাই	যশাই ওয়ার্ড নং১
০১১১০৩০০৮৮	মোঃ আবু জাফর	মৃত মস্তাজ উদ্দিন বিশ্বাস	যশাই	যশাই ১নং
০১১১০৩০০৮৯	আব্দুল কাদের	মৃত কালু প্রামানিক	বলরামপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০৯০	মৃত মতিউল ইসলাম	মৃত মোসলেম উদ্দীন মৃধা	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০৯১	কাজী নুরুল আমিন	মৃত কাজী আব্দুল লতিফ	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০০৯২	মোঃ নাসিরুল হক	মৃত ডাঃ বজলুল হক	নারায়নপুর	পাংশা
০১১১০৩০০৯৩	মোজাম্মেল হক	মৃত বানু বিশ্বাস	শন্তিকোলা	কসবামাজাইল ১নং
০১১১০৩০০৯৪	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মৃত ইব্রাহীম বিশ্বাস	লক্ষীপুর	কসবামাজাইল
০১১১০৩০০৯৫	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত ওছমান গনী বিশ্বাস	বিঃ কয়া	সাওরাইল১নং
০১১১০৩০০৯৬	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আব্বাস আলী মোল্লা	কাচারীপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০০৯৭	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত তাইজুদ্দিন মোল্লা	চরঝিকড়ীপাঃ পাড়া	হাবাসপুর ২নং
০১১১০৩০০৯৮	খলিলুর রহমান	আলিম উদ্দিন	কাচারীপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০০৯৯	মোঃ আফতাব উদ্দিন	মৃত ছকির উদ্দিন বিশ্বাস	হাবাসপুর	হাবাসপুর ১নং
০১১১০৩০১০০	একে এম জয়নাল আবেদীন	মৃত গিয়াগ উদ্দিন	কাচারীপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১০১	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত আফতাব উদ্দিন বিশ্বাস	ঝিকড়ী	হাবাসপুর
০১১১০৩০১০২	মোঃ লৎফর রহমান	মৃত ছাকেন আলী মোল্লা	বি. সাওরাইল	সাওরাইল
০১১১০৩০১০৩	মোঃ আঃ কুদ্দুছ	মোঃ আঃ আলী মোল্লা	পাতুরিয়া	সাওরাইল
০১১১০৩০১০৪	মৃত আবু বক্কার	নজর আলী মন্ডল	তিটি	সাওরাইল
০১১১০৩০১০৫	মোঃ আরশেদ আলী	মৃত হাচেন আলী	খামার ডাঙ্গা	শরিষা
০১১১০৩০১০৬	জয়প্রকাশ কুন্ডু	মৃত জগবন্ধু কুন্ডু	মাগুড়াডাঙ্গী	২নং পাংশা
০১১১০৩০১০৭	মোঃ আনোয়ারুল হক	মোঃ ইয়াকুব আলী মিয়া	কলিমহর	কলিমহর
০১১১০৩০১০৮	মোঃ ইয়ার আলী	মৃত জমির উদ্দিন সরকার	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১০৯	মোঃ কফিলুদ্দিন মন্ডল	মৃত অমেদ আলী মন্ডল	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১১০	মোঃ হাসান আলী	মোঃ মালু মন্ডল	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১১১	মোঃ সেকেন্দার আলী প্রাঃ	মোঃ ফজলুর রহমান প্রাঃ	কাচারীপাড়া	হাবাসপুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০১১২	মোঃ লিয়াকত আলী	মৃত আয়নদ্দিন খান	কাচারীপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১১৩	মোঃ আলী আহম্মদ	মোঃ শুকুর আলী সরদার	কাচারীপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১১৪	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত হায়দার আলী মন্ডল	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১১৫	মোঃ কফিলুদ্দিন	মৃত গোলাম আলী মন্ডল	গঙ্গানন্দদিয়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১১৬	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	মোঃ ছামেদ আলী মন্ডল	গঙ্গানন্দদিয়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১১৭	মোঃ আঃ মাজেদ মন্ডল	মৃত কবির মন্ডল	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১১৮	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত ইব্রাহিম হোসেন	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১১৯	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত পাচু শেখ	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১২০	মোঃ নুরুল হক	মোঃ আবেদ আলী সরদার	চরপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১২১	মোঃ আলাউদ্দিন	মৃত আকতার আলী মন্ডল	চরকিকড়ী পূর্ব পাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১২২	মৃত মির্জা মোঃ হারুন	মির্জা মোঃ আঃ হোসেন	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১২৩	শহীদ আরশেদ আলী	মোঃ কাশেম আলী সরদার	গঙ্গানন্দদিয়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১২৪	মোঃ ওমর আলী	মৃত বশরত আলী মন্ডল	উদয়পুর	যশাই
০১১১০৩০১২৫	আঃ মালেক বিশ্বাস	মোঃ আজিমদ্দিন বিশ্বাস	হেলুঞ্চা	মৃগী ৩নং
০১১১০৩০১২৬	মোঃ মান্নান ফকির	মৃত মাদারী ফকির	কুড়িপাড়া	বাবুপাড়া
০১১১০৩০১২৭	মোঃ আঃ খালেক ফকির	মোঃ আজিম উদ্দিন	পাংশা	বাবুপাড়া/২নং
০১১১০৩০১২৮	ইউছুপ আলী	মৃত ইসমাইল মন্ডল	পাংশা চাদপুর	বাবুপাড়া
০১১১০৩০১২৯	মোঃ ওসমান গনি	মৃত বক্স আলী মন্ডল	পাংশা চাদপুর	বাবুপাড়া/২নং
০১১১০৩০১৩০	মোঃ আমিরুল ইসলাম	শাহাদৎ হোসেন	পাংশা চাদপুর	বাবুপাড়া
০১১১০৩০১৩১	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত আজিমদ্দীন সেখ	মেড়রা	মৃগী/১নং
০১১১০৩০১৩২	মোঃ আঃ মান্নান খাঁ	মৃত ইসলাম উদ্দীন খাঁন	মেড়রা	মৃগী ১নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০১৩৩	মোঃ মোরসেদ আলী	মৃত এন্তাজ সেখ	পবন পাঁচবাড়ীয়া	মৃগী ৩নং
০১১১০৩০১৩৪	মোঃ আঃ রহমান মুন্সী	মৃত এদন মুন্সী	বাগছল্লী	শরিষা ২নং
০১১১০৩০১৩৫	খোঃ গোলাম কিবরিয়া	মৃত খোঃ দেলোয়ার হোঃ	বহলাডাঙ্গা	শরিষা ২নং
০১১১০৩০১৩৬	মোঃ আরশেদ আলী	মৃত হাচেন আলী মন্ডল	খামারডাঙ্গা	শরিষা ২নং
০১১১০৩০১৩৭	সিরাজুল ইসলাম	মৃত মোঃ আতাউর রহমান	বহলাডাঙ্গা	শরিষা ২নং
০১১১০৩০১৩৮	শেখ মোঃ মকবুল হোসেন	মৃত জোনাব আলী শেঃ	বেলপদুনিয়া	শরিষা ২নং
০১১১০৩০১৩৯	আঃ মান্নান	মোঃ সামছুদ্দিন বিশ্বাস	বহলাডাঙ্গা	শরিষা ২নং
০১১১০৩০১৪০	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মোঃ আমিরুল ইসলাম	বহলাডাঙ্গা	শরিষা
০১১১০৩০১৪১	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	মৃত আঃ মজিদ তাং	খামারডাঙ্গা	তোমাটিয়া
০১১১০৩০১৪২	গোলাম মহম্মদ	মৃত হোসেন আলী বিশ্বাস	বহলাডাঙ্গা	শরিষা ২নং
০১১১০৩০১৪৩	মোঃ আমদাজ হোসেন	মৃত মাদারী মন্ডল	বহলাডাঙ্গা	শরিষা ২নং
০১১১০৩০১৪৪	মোঃ আবুল হোসেন	গোলাম রহমান মৃধা	পার ভেমনামারা	শরিষা ৩নং
০১১১০৩০১৪৫	গোলাম বাকী	মোঃ বদর উদ্দিন আহাং	পার ভেমনামারা	শরিষা ৩নং

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০১৪৬	শরাফত উদ্দিন	মৃত নঈমদ্দিন জোয়াং	বহলাভাঙ্গা	শরিষা ২নং
০১১১০৩০১৪৭	এ.বি.এম মজিবর রহমান	মৃত আব্দুল কুদ্দুস	মৈনালা	পাংশা
০১১১০৩০১৪৮	মোঃ নওয়াব আলী	মৃত ওমেদ আলী মন্ডল	বরুরিয়া	মাছপাড়া
০১১১০৩০১৪৯	খঃ জাহাঙ্গির হোসেন	মৃত খন্দকার মোকবুল হোসেন	রামকোল বাহাদুরপুর	মাছপাড়া
০১১১০৩০১৫০	খঃ আঃ রাজ্জাক	মৃত খঃ হাতেম আলী	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১৫১	মাহবুবুর রহমান মিয়া	মোঃ নুরুল ইসলাম মিয়া	কলিমহর	কলিমহর
০১১১০৩০১৫২	আতিকুর রহমান	মৃত মহসিন মিয়া	কলিমহর	কলিমহর/২নং
০১১১০৩০১৫৩	সুকুমার প্রামানিক	উপেন্দ্র নাথ প্রামানিক	মুরারীখোলা	রতনদিয়া/৩নং
০১১১০৩০১৫৪	শহীদ দিয়ানত আলী	মৃত আঃ ছামাদ	ভিটি	সাওরাইল
০১১১০৩০১৫৫	মৃত আবুল কালাম আজাদ	আঃ লতিফ খান	উদয়পুর	যশাই
০১১১০৩০১৫৬	মোঃ শাহজাহান আলী	মৃত ফজলুর রহমান	গঙ্গানন্দদিয়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১৫৭	মোঃ সফিউর রহমান	মৃত আব্দুর রহমান প্রামানিক	গুরুচন্ডী	যশাই ১নং
০১১১০৩০১৫৮	মৃত নিখিল রঞ্জন বাগচী	কালিচরন বাগচী	স্বর্নগড়	মৌরাট
০১১১০৩০১৫৯	মোঃ মনজুর মোরশেদ	গওহার উদ্দিন	শুধীবাড়ী	পাংশা ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০১৬০	মোঃ আব্দুল আলী মিয়া	মৃত আসমত আলী মিয়া	রামকোল বাহাদুরপুর	মাছপাড়া ২নং
০১১১০৩০১৬১	মোঃ আব্দুল মতিন মিয়া	মোঃ আব্দুল গফুর মিয়া	রামকোল বাহাদুরপুর	মাছপাড়া
০১১১০৩০১৬২	মোঃ ওমর আলী	মৃত আকবর আলী	সাতোটা	কালিকাপুর
০১১১০৩০১৬৩	মোঃ মোকাররম হোসেন	মৃত দোরল আলী মন্ডল	সাতোটা	কালিকাপুর
০১১১০৩০১৬৪	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত গহের আলী	চরপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১৬৫	রাতুল কৃষ্ণ হালদার	যোগেন্দ্র নাথ হালদার	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১৬৬	মোঃ আব্দুল গফুর	মৃত নামদার আলী প্রামানিক	বলরামপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০১৬৭	মোঃ খলিলুর রহমান	মোঃ আলীমদ্দিন	কাচারিপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১৬৮	মোঃ আকবর হোসেন	মৃত আরজান আলী মন্ডল	সাবেক নারায়নপুর	২নং পাংশা
০১১১০৩০১৬৯	কবিরাজ আবুল কালাম	মৃত সোনাতন আহম্মদ	চরনারায়নপুর	৩নং বোয়ালীয়া
০১১১০৩০১৭০	এ.কে. এম নুরুন্নবী	মৃত কেছেম উদ্দিন বিশ্বাস	কালিকাপুর	কালিকাপুর
০১১১০৩০১৭১	মোঃ আব্দুল করিম	মৃত দীনু মোল্লা	শুধিবাড়ী	২নং পাংশা
০১১১০৩০১৭২	শহীদ রুহুল ইসলাম মিয়া	এম. এ. ওহাব মিয়া	বয়রাট	পাট্টা
০১১১০৩০১৭৩	আঃ সাত্তার বিশ্বাস (আনসার)	মৃত আহম্মদ আলী বিশ্বাস	মৌরাট	মৌরাট
০১১১০৩০১৭৪	মোঃ আয়েন উদ্দিন মল্লিক (আনসার)	মৃত জয়ধর মল্লিক	হাজরাপাড়া	বাবুপাড়া
০১১১০৩০১৭৫	মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক (আনসার)	মোঃ এবাদত আলী মন্ডল	আখরজানী	মৃগী
০১১১০৩০১৭৬	মোঃ হাবিবর রহমান (আনসার)	মৃত দরবারী মন্ডল	ঠাকুরপাড়া	কালিকাপুর
০১১১০৩০১৭৭	মোঃ ইউছুফ আলী খাঁ (আনসার)	মৃত আবেদ আলী খাঁ	বিল মানুষমারী	মদাপুর
০১১১০৩০১৭৮	মোঃ তাইজদ্দিন শেখ (আনসার)	মৃত দেয়াজ তুল্লা শেখ	সংগ্রামপুর	মদাপুর
০১১১০৩০১৭৯	মোঃ আঃ রব শেখ (আনসার)	মৃত আঃ রহমান শেখ	রাউকুড়ী	মদাপুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০১৮০	মোঃ আতর আলী বিশ্বাস (আনসার)	সমশের আলী বিশ্বাস	বিল মানুষমারী	মদাপুর
০১১১০৩০১৮১	মোঃ খবিরুদ্দিন খাঁ (আনসার)	মৃত তমেজ খাঁ	সগ্রামপুর	মদাপুর
০১১১০৩০১৮২	মোঃ আমদাজ হোসেন (আনসার)	মৃত রোস্তম আলী শেখ	বিল মানুষমারী	মদাপুর
০১১১০৩০১৮৩	মোঃ আব্দুল কালের বিশ্বাস (আনসার)	মৃত হাজী দানেজ বিশ্বাস	রাইপুর	মদাপুর
০১১১০৩০১৮৪	মৃত ইয়াদুর রহমান (আনসার)	মৃত সোনাউল্লা বিশ্বাস	বহলাডাঙ্গা	শরিষা
০১১১০৩০১৮৫	সফিউদ্দিন শেখ (আনসার)	মৃত ছফির উদ্দিন শেখ	বোয়ালীয়া	বোয়ালীয়া
০১১১০৩০১৮৬	মোঃ আজাহার আলী (আনসার)	মৃত জাকের মোল্লা	বোয়ালীয়া	বোয়ালীয়া
০১১১০৩০১৮৭	মোঃ আকরাম মোল্লা (আনসার)	মৃত তাহের মোল্লা	বোয়ালীয়া	বোয়ালীয়া
০১১১০৩০১৮৮	শহীদ আব্দুল কুদ্দুস (আনসার)	আব্দুল খালেক	কোনরপুর	বোয়ালীয়া
০১১১০৩০১৮৯	মোঃ আবুল কাসেম (পুলিশ)	মৃত মোঃ এবাদত হোসেন বিশ্বাস	জোনা	গাট্টা
০১১১০৩০১৯০	মোঃ আলিম উদ্দিন (পুলিশ)	মৃত ধেনাই উদ্দিন	গাঁড়াল	মাছপাড়া
০১১১০৩০১৯১	মৃত মোঃ আঃ গনি (ই.পি.আর)	মৃত আছির উদ্দিন	হাগশপুর	যশাই
০১১১০৩০১৯২	মোঃ আব্দুল হামিদ সরদার	মৃত আব্দুল গফুর সরদার	সাজড়িয়া	কলিমহর
০১১১০৩০১৯৩	কামরুজ্জামান	মৃত খবিরউদ্দিন	ফলিমারা	কলিমহর
০১১১০৩০১৯৪	মোঃ আঃ রহমান	মৃত ভোলাই	ফলিমারা	কলিমহর
০১১১০৩০১৯৫	মোঃ শাহাদৎ হোসেন	মৃত ইজুৎ মিয়া	নাচনা মুরাদপুর	কলিমহর
০১১১০৩০১৯৬	আনোয়ার হোসেন	মোঃ আবুল হোসেন বিশ্বাস	নাচনা মুরাদপুর	কলিমহর
০১১১০৩০১৯৭	মোঃ আলিমুজ্জামান	মোঃ আজাহার আলী খাঁন	চরঝিকড়ী পাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০১৯৮	মোঃ আলাউদ্দিন শেখ	মৃত হেলু শেখ	নারায়নপুর	পাংশা
০১১১০৩০১৯৯	মোঃ সামসুদ্দিন	মোঃ ইয়াকুব আলী বিশ্বাস	ভেমনামারা	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২০০	মোঃ আজিজুল ইসলাম	মৃত এজেম আলী	নারায়নপুর	পাংশা
০১১১০৩০২০১	মোঃ আব্দুল জলিল	মৃত খোরশেদ আলী বিশ্বাস	লক্ষীপুর	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২০২	মোঃ আলি হোসেন	মোঃ এতাহার হোসেন	লক্ষীপুর	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২০৩	মোঃ রেজাউল করিম	মোঃ এতাহার হোসেন	দীঘলহাট	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২০৪	মোঃ আরশাদ আলী	মোঃ জলিমদ্দিন বিশ্বাস	ভেমনামারা	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২০৫	মোঃ ইউসুফ হোসেন	মৃত খুদি মন্ডল	চর আকড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০২০৬	কাজি কবিরুজ্জামান	মৃত কাজি আব্দুস ছোবহান	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০২০৭	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	আঃ গনি বিশ্বাস	লক্ষীপুর	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২০৮	মোঃ বাবর আলী মল্লিক	মৃত শাহাবাৎ মল্লিক	স্বর্ণপাড়া	মৌরাট
০১১১০৩০২০৯	মোঃ ঈমান আলী খান	মৃত ময়েন উদ্দিন	ধুলিয়াট	মৌরাট
০১১১০৩০২১০	মোঃ ছবেদ আলী ভুইয়া	মৃত আব্দুল কুদ্দুস ভুইয়া	স্বর্ণপাড়া	মৌরাট
০১১১০৩০২১১	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত তাজু মন্ডল	স্বর্ণপাড়া	মৌরাট
০১১১০৩০২১২	মৃত নজর আলী সরদার	মৃত পতন সরদার	মৌরাট	মৌরাট
০১১১০৩০২১৩	মোঃ আকবর আলী	মৃত আনোয়ার উদ্দিন বিশ্বাস	সাওরাইল	সাওরাইল

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০২১৪	মৃত আবুল হোসেন	মৃত বাহাদুর শেখ	নাচনা মুরাদপুর	কলিমহর
০১১১০৩০২১৫	মোঃ আজিজুর রহমান	আব্দুল জলিল মন্ডল	মাশালিয়া	কলিমহর
০১১১০৩০২১৬	মোয়াজ্জেম হোসেন	মৃত ইয়াদ আলী বিশ্বাস	ডেমনামারা	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২১৭	মোঃ গোলাম সরোয়ার	মোঃ আবেদ আলী শেখ	স্বর্ণখোলা	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২১৮	মোঃ আঃ ছোবহান	মোঃ ইয়াকুব আলী বিশ্বাস	ডেমনামারা	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২১৯	মোঃ মতিয়ার রহমান	মোঃ আবসেদ আলী	লক্ষীপুর	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২২০	মোঃ আরব আলী	মোঃ জুলমত আলী মন্ডল	ডেমনামারা	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২২১	মোঃ আসাদুজ্জামান	মৃত এনাদং আলী	চৌমুখ	মৃগী
০১১১০৩০২২২	মৃত জহুরুল হক	জীবন মন্ডল	উদয়পুর	যশাই
০১১১০৩০২২৩	মোঃ ছামছুল মোল্লা	মৃত আমিন মোল্লা	নওপাড়া	মাছপাড়া
০১১১০৩০২২৪	বিমল কুমার মালাকার	মৃত নন্দী গোপাল মালাকার	নিভা এনায়েতপুর	মাছপাড়া
০১১১০৩০২২৫	মৃত মোয়াজ্জেম হোসেন	মৃত মোসলেম উদ্দীন মন্ডল	দেওয়ালী	মৃগী
০১১১০৩০২২৬	মৃত আবুল হোসেন	মৃত এসারত বিশ্বাস	হিমায়েত খালী	মৃগী
০১১১০৩০২২৭	মৃত জয়নাল আবেদীন	মৃত দেওয়ান আঃ গফুর	পারকুলা	মৃগী
০১১১০৩০২২৮	মোঃ তাইজুল ইসলাম খাঁ	মৃত জাইনুত খান	বেলগাছি চাঁদপুর	মদাপুর
০১১১০৩০২২৯	মোঃ হাবিবুর রহমান	মৃত জাইনুত খাঁন	বেলগাছি চাঁদপুর	মদাপুর
০১১১০৩০২৩০	মোঃ ফয়েজ আলী	মৃত মোসরেজ খাঁ	সুন্দর কান্দি	মদাপুর
০১১১০৩০২৩১	মোঃ আঃ মালেক বিশ্বাস	মৃত বজলুর রহমান বিশ্বাস	পাট্টা	পাট্টা
০১১১০৩০২৩২	মৃত আঃ মাজেদ	মৃত শাহজাহান শিকদার	কসবা মাজাইল	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২৩৩	মোঃ আঃ জব্বার	মৃত আহম্মদ আলী শেখ	বিলগজারিয়া	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০২৩৪	মোঃ আঃ মাজেদ	মৃত রমজান আলী মন্ডল	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০২৩৫	মোঃ আছমত আলী মন্ডল	মৃত মোঃ খয়েজ আলী মন্ডল	হাজরাপাড়া	বাবুপাড়া
০১১১০৩০২৩৬	মোঃ আতিয়ার রহমান	মোঃ আরসেদ আলী	লক্ষীপুর	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২৩৭	মোঃ আজগর আলী শেখ	মৃত মোঃ লটাই শেখ	হাজরাপাড়া	বাবুপাড়া
০১১১০৩০২৩৮	নিমাই চন্দ্র বসাক	পূর্নচন্দ্র বসাক	বাবুপাড়া	বাবুপাড়া
০১১১০৩০২৩৯	মোঃ আকমল হোসেন	মোঃ ইসমাইল হোসেন	কসবা মাজাইল	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০২৪০	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	মোঃ মেছের প্রামানিক	কালীপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০২৪১	আজিজুর রহমান	মৃত সোলেমান বিশ্বাস	নিশ্চিন্তপুর	বাবুপাড়া
০১১১০৩০২৪২	মোঃ আমিনুল হক	মৃত ডাঃ কায়েম উদ্দিন	হাবাসপুর	হাবাসপুর
০১১১০৩০২৪৩	মোঃ কফিলউদ্দিন বিশ্বাস	মৃত নিদু বিশ্বাস	গঙ্গানন্দদিয়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০২৪৪	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	মৃত আব্দুল গফুর বিশ্বাস	চরঝিকড়ী	হাবাসপুর
০১১১০৩০২৪৫	শহীদ আজগর আলী	আশুফকির	কাচারীপাড়া	হাবাসপুর
০১১১০৩০২৪৬	মোঃ সহিদুল ইসলাম	মৃত আঃ লতিফ খান	উদয়পুর	যশাই
০১১১০৩০২৪৭	এম হামিদুল হক	মৃত আব্দুল করিম	চরলক্ষীপুর	যশাই

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০২৪৮	মনোয়ার হোসেন	সোনা মিয়া	যশাই	যশাই
০১১১০৩০২৪৯	মোঃ আব্দুস সালাম	মৃত আব্দুল গফুর	চরলক্ষীপুর	যশাই
০১১১০৩০২৫০	মোঃ আবুল হোসেন	মোঃ মুন্সী জসিম উদ্দিন	চরলক্ষীপুর	যশাই
০১১১০৩০২৫১	আহমেদ আলী	মোঃ আবছার মন্ডল	যশাই	যশাই
০১১১০৩০২৫২	মোঃ আফতাব উদ্দিন	আলাউদ্দিন শেখ	সমসপুর	যশাই
০১১১০৩০২৫৩	মৃত আমিরুল ইসলাম	মৃত মোসলেম উদ্দিন মৃধা	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০২৫৪	মৃত মোসলেম উদ্দিন মৃধা	সুজা উদ্দিন মৃধা	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০২৫৫	শহীদ জিন্নাত আলী	মৃত খবির উদ্দিন বিশ্বাস	পাটীকা বাড়ি	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০২৫৬	মৃত মোহাম্মদ আলী	মৃত পচু প্রামানিক	পাটীকা বাড়ি	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০২৫৭	মোঃ আব্দুল খালেক মন্ডল	মৃত আলিমুদ্দিন শেখ	পাংশা বালেপাড়া	পাংশা
০১১১০৩০২৫৮	মতিউর রহমান	মৃত হাফেজ আলী মুন্সী	ভিটি	সাওরাইল
০১১১০৩০২৫৯	মোঃ আবদুল হাই	মৃত ইসহাক আলী	ভিটি	সাওরাইল
০১১১০৩০২৬০	মোঃ আফজাল হোসেন	মোঃ কেছমত আলী	বি. বনগ্রাম	সাওরাইল
০১১১০৩০২৬১	মোঃ ওমর আলী	মোঃ এতেম আলী	বি. বনগ্রাম	সাওরাইল
০১১১০৩০২৬২	মোঃ আইয়ুব আলী	মোঃ এতেম আলী	বি. বনগ্রাম	সাওরাইল
০১১১০৩০২৬৩	মৃত মোঃ আঃ আজিজ মন্ডল	মোঃ রজব আলী মন্ডল	গড়িয়ানা	মদাপুর
০১১১০৩০২৬৪	মৃত আঃ আছির উদ্দিন বিশ্বাস	মৃত ফয়েজ উদ্দিন বিশ্বাস	বাহাদুরপুর	মাছপাড়া
০১১১০৩০২৬৫	মোঃ আজিজুর রহমান	মোঃ জব্বার মন্ডল	মাছপাড়া	মাছপাড়া
০১১১০৩০২৬৬	রমজান আলী মোল্লা	মৃত ইমতাজ আলী মোল্লা	কালিনগর	মাছপাড়া
০১১১০৩০২৬৭	মোঃ ছাকেন আলী মন্ডল	মৃত আহেদ আলী মন্ডল	কালিনগর	মাছপাড়া
০১১১০৩০২৬৮	মোঃ ইয়াকুব আলী	মোঃ দিনু মোল্লা	কালিনগর	মাছপাড়া
০১১১০৩০২৬৯	আব্দুস সোবহান শেখ	কোরবান শেখ	রতন দিয়া	রতন দিয়া
০১১১০৩০২৭০	আব্দুল হাকিম মন্ডল	মৃত মধু মন্ডল	চরশ্রীপুর	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০২৭১	মোঃ মোসলেম মিয়া	মৃত মকবুল হোসেন মিয়া	পূর্ব ফুলকাউন্নার	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০২৭২	সুলতান উদ্দীন আহমেদ	মৃত হাজী আফছার উদ্দীন আহমেদ	কমলাপুর	লোলেন লোকাল
০১১১০৩০২৭৩	আঃ জাঃ মোঃ সাইফ উদ্দিন	মৃত বেলায়েত হোসেন মোল্লা	সাজুরিয়া	কলিমহর/৩
০১১১০৩০২৭৪	আবুজাফর মোহাম্মদ	মৃত বেলায়েত হোসেন মোল্লা	সাজুরিয়া	কলিমহর
০১১১০৩০২৭৫	মোঃ আব্দুল হামিদ সরদার	খুদি সর্দার	দুরগুনদীয়া	কলিমহর/৩নং
০১১১০৩০২৭৬	মোঃ রোকন উদ্দিন বিশ্বাস	মৃত খোদা বক্স বিশ্বাস	নাচনা মুন্নাদপুর	কলিমহর
০১১১০৩০২৭৭	মোঃ চাঁদ আলী খান	মোঃ দানেজ উদ্দীন খান	তর্তিপুর	কলিমহর/১নং
০১১১০৩০২৭৮	মোঃ মোতাহার হোসেন	মোঃ বেলায়েত হোসেন	প্রাণপুর	কলিমহর
০১১১০৩০২৭৯	শেখ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	মোঃ ছাকেন আলী শেখ	কুড়াপাড়া	পাংশা
০১১১০৩০২৮০	মোঃ হেকমত মন্ডল	সোনাউল্যা মন্ডল	মহিরশালী কালিকাপুর	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০২৮১	এস. এম হাশেমুল হক	আব্দুল কাদের মোল্লা	মহিরশালী কালিকাপুর	মাঝবাড়ী

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০২৮২	মোঃ আতিয়ার রহমান	মোঃ হাতেম আলী মোল্লা	পচাকুলটিয়া	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০২৮৩	এস.এম. এ জলিল	মৃত শেখ শের আলী	মহিনশাহী কালিকাপুর	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০২৮৪	মোঃ আবুল খায়ের মিয়া	মৃত আঃ জলিল মিয়া	কয়রেদী	২নং ওয়ার্ড মাঝবাড়ী
০১১১০৩০২৮৫	মোঃ ছানার উদ্দীন মন্ডল	মৃত কাউসার মন্ডল	রাইপুর	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০২৮৬	মোঃ হাফিজ উদ্দিন	মৃত আজিম উদ্দীন মন্ডল	কুষ্টিয়াডাঙ্গী	মাঝবাড়ী
০১১১০৩০২৮৭	মোঃ খালেক সরদার	মৃত বাহাদুর সরদার	বোয়ালিয়া	বোয়ালিয়া
০১১১০৩০২৮৮	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মৃত এতেম আলী	বি. এম. গ্রাস	শাওরাইল
০১১১০৩০২৮৯	মোঃ তোফাজ্জল	মুন্সী বছির উদ্দিন আহম্মদ	পাতুরিয়া	শাওরাইল/৩নং
০১১১০৩০২৯০	মোঃ শওকত আকবর	মৃত জোনাব আলী	ভিটি	শাওরাইল/৩নং
০১১১০৩০২৯১	আঃ রহিম শেখ	মৃত হাজী নজর আলী শেখ	বড় বহুগ্রাম	সরিষা ৩নং
০১১১০৩০২৯২	মোঃ আবু সাঈদ	মৃত সলিম উদ্দীন সরদার	বহলাভাঙ্গা	সরিষা ৩নং
০১১১০৩০২৯৩	মোঃ জলিল উদ্দিন	মৃত কোয়েদ আলী খাঁ	বহলাভাঙ্গা	সরিষা ২নং
০১১১০৩০২৯৪	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মোঃ হাতেম আলী	পাড় ভেমনাপাড়া	সরিষা ৩নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০২৯৫	এ.কে.এম ছামতুল্লাহ	মৃত আবুল হোসেন মিয়া	বহলাভাঙ্গা	সরিষ ২নং
০১১১০৩০২৯৬	আহাম্মদ আলী	মৃত আছমত আলী	বহলাভাঙ্গা	সরিষা ২নং
০১১১০৩০২৯৭	মোঃ খাইরুল ইসলাম	মৃত শাহাদাত হোসেন বিশ্বাস	পুঁইজোর	পাট্টা
০১১১০৩০২৯৮	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা	মৃত ফকির উদ্দিন মোল্লা	কৃষ্ণপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০২৯৯	আহাম্মদ আলী মৃধা	মৃত লহাতুল্লাহ মৃধা	বহলাভাঙ্গা	সরিষা ২নং
০১১১০৩০৩০০	ওবায়দুর রহমান	ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম	পারভেমনাপারা	সরিষা ৩নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০৩০১	মোঃ শামসুল হক	মোঃ আবের আলী মন্ডল	আধারকোটা	সরিষা ২নং
০১১১০৩০৩০২	মোঃ খায়রুল ইসলাম	মৃত লুৎফর রহমান বিশ্বাস	জোনা	পাট্টা ১নং
০১১১০৩০৩০৩	ইমারত হোসেন	চৌধন উদ্দিন খাঁ	নিয়ামতপুর	মৃগী ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০৩০৪	মোঃ মজিবুর রহমান বিশ্বাস	মৃত রুস্তম আলী বিশ্বাস	হেলেঞ্চা	মৃগী ৭নং
০১১১০৩০৩০৫	মোঃ ইমান আলী	মৃত তারু সরদার	ছোট কলকলিয়া	মৃগী ২নং
০১১১০৩০৩০৬	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত জালাল উদ্দিন বিশ্বাস	হেলেঞ্চা	মৃগী ৭নং
০১১১০৩০৩০৭	মোঃ আঃ সালাম	মৃত সামসুদ্দিন বিশ্বাস	পাট্টা	পাট্টা ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০৩০৮	মো জবেদ আলী মন্ডল	মৃত ইসমাইল মন্ডল	কানুখালী	মাছপাড়া
০১১১০৩০৩০৯	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	মৃত ছমেদ আলী বিশ্বাস	বানকোল বাহাদুরপুর	মাছপাড়া
০১১১০৩০৩১০	মোঃ আবুল ফজল	মৃত তোবাজ মন্ডল	গাড়াল	মাছপাড়া ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০৩১১	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	মোঃ ইসমাইল হোসেন মন্ডল	বলরামপুর	১নং বাহাদুরপুর
০১১১০৩০৩১২	কাজী ইউছুফ হোসেন	মৃতকাজী এয়াকুব হোসেন	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০৩১৩	আবুবকর সিদ্দিক	মৃত হাফেজ ফজলুল করিম	চৌমুখ	মৃগী
০১১১০৩০৩১৪	সামসুদ্দিন আহম্মদ	মৃত দেলোয়ার হোসেন জর্দ্দার	সুবর্ণ খোলা	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০৩১৫	মোঃ মনোয়ার হোসেন	মোঃ আরশেদ আলী বিশ্বাস	লক্ষীপুর	কসবা মাজাইল

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৩০৩১৬	সিরাজুল ইসলাম	মোঃ নুরুল ইসলাম সিকদার	কসবা মাজাইল	কসবা মাজাইল
০১১১০৩০৩১৭	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত এ.কে এম আসাদুল্লা	বহলাডাঙ্গা	সরিষা ২নং
০১১১০৩০৩১৮	মোঃ শফিউজ্জামান মৃধা	মৃত আঃ জব্বার মৃধা	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০৩১৯	মোঃ লোকমান হোসেন	মৌঃ মোঃ আবুল কাশেম মল্লিক	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০৩২০	মোঃ ওবায়দুল্লাহ	আঃ হামিদ মল্লিক	বাহাদুরপুর	বাহাদুরপুর
০১১১০৩০৩২১	মোঃ আমির আলী খান	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন খান	বি.বনগ্রাম	সাওরাইল
০১১১০৩০৩২২	মোঃ এনায়েত হোসেন	মৃত ছবেদ আলী মন্ডল	মনিরমনপুর	যশাই/১নং ওয়ার্ড
০১১১০৩০৩২৩	মোঃ আজিজুর রহমান	মোঃ লুৎফর রহমান	আখরজানী	মৃগী
০১১১০৩০৩২৪	মোঃ মনোয়ার হোসেন	মৃত জয়েন উদ্দিন শেখ	নওপাড়া	মাছপাড়া
০১১১০৩০৩২৫	মোঃ মোসলেম উদ্দিন	মৃত আদর আলী	খামারডাঙ্গা	সরিষা

থানাঃ গোয়ালন্দ জেলাঃ রাজবাড়ী বিভাগঃ ঢাকা

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৪০০০১	মোঃ আঃ রহিম	কাছিম উদ্দিন সেখ	পশ্চিম উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০০২	মোঃ আমিনুল ইসলাম	মৃত মোঃ পানজু আলী মোল্লা	উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০০৩	মোঃ ইদ্রিস আলী মোল্লা	মোঃ ফাইজ উদ্দিন মোল্লা	পশ্চিম উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০০৪	কিরামত আলী মন্ডল	মৃত ছবেদ আলী মন্ডল	উজানচর বিপেন রাজের পাড়	উজানচর ১নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০০৫	আহম্মদ আলী সরদার	মৃত মোঃ জামাল সর্দার	উজানচর বানিয়াডাঙ্গা	উজানচর ১নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০০৬	মোঃ ছফির উদ্দিন বিশ্বাস	মৃত মোঃ শুকুর আলী বিশ্বাস	চরবারকীপাড়া	ছোটভাকলা ১নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০০৭	মোঃ আকবর হোসেন মিয়া	মৃত গেন্দু মিয়া	চরপাচুরিয়া	দেবগ্রাম
০১১১০৪০০০৮	মোঃ আজিজুল হক	মৃত নফিজ উদ্দিন সর্দার	বাঘাবাড়ী	দেবগ্রাম
০১১১০৪০০০৯	মোঃ রবিউল হক চৌধুরী	মৃত আরশেদ আলী চৌধুরী	চরপাচুরিয়া	দেবগ্রাম ৩নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০১০	এস.এম আবদুর রব	মৃত আবেদ আলী শেখ	উত্তর ধোঁপাগাথী	দৌলতদিয়া
০১১১০৪০০১১	মোঃ তমিজ উদ্দিন	মোহন মিএগ্র	ছোটভাকলা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০১২	মোঃ আজিজুর রহমান	মোঃ মহিজউদ্দীন মোল্লা	টেংড়াপাড়া	ছোট ভাকলা ১নং
০১১১০৪০০১৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত মোঃ মোকসেদ আলী	চরবারকীপাড়া	ছোট ভাকলা
০১১১০৪০০১৪	মোঃ আঃ রাজ্জাক বিশ্বাস	মৃত মোঃ আজগর আলী বিঃ	চরবারকীপাড়া	ছোট ভাকলা ১নং
০১১১০৪০০১৫	মোঃ আঃ মান্নান মিয়া	মৃত মোঃ ওমেদ আলী মিয়া	চরবারকীপাড়া	ছোট ভাকলা ১নং
০১১১০৪০০১৬	একেএম মোস্তফা	মোঃ ছবদার হোসেন	বিষ্ণুপুর	ছোট ভাকলা
০১১১০৪০০১৭	মোঃ আঃ মান্নান মিয়া	মৃত মোঃ ইমান আলী	জুড়ান মোল্লাপাড়া	১নং উজানচর
০১১১০৪০০১৮	মোঃ ওমর আলী শেখ	মৃত কিয়ামউদ্দিন সেখ	ছোটভাকলা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০১৯	মোঃ আঃ গফুর	মোঃ আঃ আলী	ছোটভাকলা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০২০	মোঃ মোজাম্মেল হক	মৃত জোনাব আলী	চাকির তালুক	ছোটভাকলা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৪০০২১	মৃত সিদ্দিকুর রহমান	লালু মোল্লা	তেনাপচা	দেবগ্রাম ৩নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০২২	মোঃ আবুল	মৃত কিয়ামদ্দিন শেখ	ছোটভাকলা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০২৩	মৃত সিরাজ সেখ	মৃত ইনাতুল্লাহ সেখ	২নং স্থায়ান মোল্লাপাড়া	উজানচর
০১১১০৪০০২৪	মোঃ জাহাঙ্গীর মৃধা	মৃত আফছার আলী মৃধা	পঃ উজানচর দেবাজ	উজানচর
০১১১০৪০০২৫	আবুল বাসার মিয়া	আঃ আজিজ মিয়া	বাহাদুরপুর	উজানচর ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০২৬	মোঃ শুকুর মোল্লা (আনসার)	মৃত আছান মোল্লা	দক্ষিণ উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০২৭	মোঃ আঃ ছাত্তার মিয়া (আনসার)	মৃত মোঃ আঃ খবির মিয়া	গোয়ালন্দ বাজার (কুলিপট্টি)	উজানচর
০১১১০৪০০২৮	মোঃ বেলায়েত হোসেন (আনসার)	মৃত গেরানী শেখ	দক্ষিণ উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০২৯	মোঃ কাউয়ুম খান (আনসার)	মৃত দুঃখী	দক্ষিণ উজানচর কসিমুদ্দিন পাড়া	উজানচর
০১১১০৪০০৩০	মোঃ নুরুল ইসলাম (আনসার)	মৃত ইসহাক শেখ	পরগ্রাম কবিরের পাড়া	উজানচর
০১১১০৪০০৩১	হুজুর আলী শেখ (আনসার)	জনাব আলী শেখ	ছোট ভাকলা	উজানচর
০১১১০৪০০৩২	মোঃ কছিমদ্দিন (আনসার)	আঃ রহিম শেখ	পশ্চিম উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০৩৩	আঃ হাকিম শেখ (আনসার)	মৃত খোদাবক্স শেখ	উজানচর কুমড়াকান্দি	উজানচর
০১১১০৪০০৩৪	জুলমত আলী শেখ (আনসার)		উজানচর কুমড়াকান্দি	উজানচর
০১১১০৪০০৩৫	মোঃ আলতাবুর রহমান	মোঃ আব্দুল কাদের মোল্লা	চর কাচকা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৩৬	মোঃ আমির আলী শেখ	মৃত আব্দুল গফের শেখ	চরবারকীপাড়া	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৩৭	মোঃ রুস্তম আলী	মৃত মোঃ জয়দর মিস্ত্রি	চরবারকীপাড়া	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৩৮	মিনহাজ উদ্দিন শেখ	মৃত আজগর আলী শেখ	কেউটিল	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৩৯	মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া	মৃত আব্দুল গফুর সরদার	চরবারকীপাড়া	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৪০	মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া	মৃত বছির উদ্দিন মিঞা	চর আক্কার মানিক	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৪১	মোঃ হেকমত আলী মোল্লা	মৃত রেকাত আলী মোল্লা	চরবারকীপাড়া	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৪২	মোঃ মোস্তাজ আলী মোল্লা	মৃত আদু মোল্লা	কাশিমা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৪৩	মোঃ জলিল খাঁ	মৃত মোঃ হারান খাঁ	অদলপুর	ছোটভাকলা ১নং
০১১১০৪০০৪৪	মোঃ ছাদেক আলী বিশ্বাস	মৃত মোঃ আলী মুন্সীন বিশ্বাস	উজানচর	সরদারপাড়া
০১১১০৪০০৪৫	মৃত মোঃ আকবর আলী শেখ	মৃত আনসার আলী শেখ	উঃ উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০৪৬	মোঃ আজিজুল হক মোল্লা	মৃত আছান মোল্লা	এবাদুল্লা মিস্ত্রীপাড়া	উজানচর ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০৪৭	মোঃ নেকবর আলী শেখ	মোঃ মহিদ্দিন শেখ	বেলুরী	দেবগ্রাম ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০৪৮	জাব্বার শেখ	হোসেন আলী শেখ	চরপাচুরিয়া	দেবগ্রাম
০১১১০৪০০৪৯	মোঃ আবুল কাসেম	মৃত শাহজদ্দীন শেখ	দক্ষিণ উজানচর বাহাদুরপুর	উজানচর
০১১১০৪০০৫০	মোঃ হায়দারুল আলম	মৃত ইয়াদ আলী শেখ	উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০৫১	ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান	মনজুর আলী সরদার	বাঘাবাড়ী	দেবগ্রাম ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০৫২	ডাঃ মোঃ ফজলুল হক	মৃত মোঃ আজগর আলী	চরগোপালপুর	দেবগ্রাম ২নং ওয়ার্ড

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০৪০০৫৩	মোঃ দীন ইসলাম	মৃত মেহের আলী মুন্সি	উজানপুর নদাপাড়া	উজানচর
০১১১০৪০০৫৪	মোঃ কেরামত আলী	মোঃ কাইম উদ্দিন প্রামানিক	দঃ উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০৫৫	মোঃ আব্দুল হক	মোঃ মোসলেম উদ্দিন মন্ডল	উজানচর	উজানচর ১নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০৫৬	মোঃ খাদেম আলী	মৃত জোনাব আলী	চাকির তালুক	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৫৭	মোঃ মতিয়ার রহমান	মৃত কেফাতুল্লা	কেউটিল	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৫৮	শ্রী সুবাস চন্দ্র বিশ্বাস	মৃত শ্রী সূর্য কুমার বিশ্বাস	দৈদাডাঙ্গা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৫৯	মোঃ আক্তার হোসেন	মোঃ আতর আলী মন্ডল	পঃ উজানচর	উজানচর ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০৬০	মোঃ সোহরাব হোসেন	মৃত নইমদ্দিন মন্ডল	শীতলপুর	দেবগ্রাম ১নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০৬১	মোঃ আফজাল হোসেন	মৃত ফৈজদ্দীন সরদার	দঃ চরপাচুরিয়া	দেবগ্রাম ৩নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০৬২	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত দুঃখী সরদার	ছোটভাকলা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৬৩	মোঃ আঃ আজিজ শেখ	মৃত কিয়ামুদ্দিন শেখ	ছোটভাকলা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৬৪	মোঃ তবিবুর রহমান	মৃত শমসের মোল্লা	কেউটিল	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৬৫	হাসমত আলী শেখ	মৃত কছিম উদ্দিন	বিষ্ণুপুর	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৬৬	মোঃ মজিবুর রহমান	আব্দুল জলিল সরদার	বাঘাবাড়ী	দেবগ্রাম ২নং ওয়ার্ড
০১১১০৪০০৬৭	মোঃ আমজাদ হোসেন	মৃত নাদের হোসেন	বড় মসজিদ পাড়া	উজানচর
০১১১০৪০০৬৮	হাজী নূর ইসলাম মিয়া	মৃত ঈমান আলী মিয়া	জুয়ানপাড়া	উজানচর
০১১১০৪০০৬৯	মোঃ জালাল উদ্দিন মিয়া	মৃত আফছার উদ্দিন মিয়া	কাশিমা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৭০	মোঃ ইউসুফ আলী শেখ	মৃত বাহাদুর শেখ	ছোটভাকলা	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৭১	মৃত আকতার হোসেন	মৃত আনছার আলী	টেংরাপাড়া	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৭২	মোঃ তমছের আলী ফকির	মৃত শীতল ফকির	টেংরাপাড়া	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৭৩	মোঃ খাদেম আলী	মৃত জোনাব আলী	চাকির তালুক	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৭৪	মোঃ জয়েন উদ্দিন মিয়া	মৃত মোঃ জয়নাল আবেদীন	চাকির তালুক	ছোটভাকলা ১নং
০১১১০৪০০৭৫	আঃ জব্বার সরদার	মৃত মোঃ পিরু সরদার	চরকার্টবন্দ	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৭৬	মোঃ জামাল হোসেন	মোঃ আক্তার আলী মোল্লা	চরপাচুরিয়া (আলমপুর)	দেবগ্রাম ৩নং
০১১১০৪০০৭৭	মোঃ আঃ করিম	কছিমদ্দিন শেখ	পঃ উজানচর	উজানচর
০১১১০৪০০৭৮	মোঃ সেকেন্দার আলী	মৃত মোঃ হাচান আলী	চরকার্টবন্দ	ছোটভাকলা
০১১১০৪০০৭৯	মোঃ মোজাফফর খন্দকার	মৃত আঃ গফুর খন্দকার	কাশিমা	ছোটভাকলা

থানাঃ বালিয়াকান্দি　　জেলাঃ রাজবাড়ী　　বিভাগঃ ঢাকা

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০২০০০১	আব্দুল মোমিন	মৃত মোবারক আলী	মধুপুর	নারুয়া
০১১১০২০০০২	মোঃ আলী আকবর	মৃত কালু লস্কর	নারুয়া	নারুয়া
০১১১০২০০০৩	মৃত মোঃ সৈয়দ আলী	মোঃ তেলাম হোসেন	গাড়াকোলা	নারুয়া
০১১১০২০০০৪	মোঃ আনোয়ার হোসেন	মৃত আপু মন্ডল	শোলাবাড়ীয়া	নারুয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০২০০০৫	মোঃ ইউছুফ আলী	মৃত আছমত আলী	শহীদ নগর খালকুলা	ইসলামপুর
০১১১০২০০০৬	মোঃ খোয়াজ শেখ	মৃত মোঃ জেন্টু শেখ	শহীদ নগর	ইসলামপুর
০১১১০২০০০৭	মোঃ আঃ করিম শেখ	মৃত তেজারত শেখ	রাজধরপুর	ইসলামপুর
০১১১০২০০০৮	মোঃ লিয়াকত আলী মন্ডল	মৃত নিজাম উদ্দিন মন্ডল	বারমল্লিকা	ইসলামপুর
০১১১০২০০০৯	মোঃ লিয়াকত আলী খান	মোঃ বিন কাশিম খান	গঙ্গারামপুর	নারুয়া/৩নং
০১১১০২০০১০	মোঃ আতিয়ার রহমান	মৃত হায়দার আলী শেখ	গাড়াকোলা	নারুয়া/৩নং
০১১১০২০০১১	মোঃ মনির উদ্দিন মোল্লা	মৃত এরোন মোল্লা	বিলটাকা পোড়া	নারুয়া/২নং
০১১১০২০০১২	আব্দুল হামিদ শেখ	মৃত আনছার উদ্দিন শেখ	গাড়াকোলা	নারুয়া/৩নং
০১১১০২০০১৩	আব্দুল করিম মোল্লা	মৃত আব্দুল কাদের মোল্লা	গাড়াকোলা	নারুয়া
০১১১০২০০১৪	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত মোনছের আলী মন্ডল	গাড়াকোলা	নারুয়া/৩নং
০১১১০২০০১৫	মোঃ আকতারুজ্জামান	মৃত আব্দুল গফুর	নারুয়া	নারুয়া/২নং
০১১১০২০০১৬	মোঃ আতাউর রহমান খান	মৃত ইত্তাজ আলী খান	তালুকপাড়া	নারুয়া/১নং
০১১১০২০০১৭	মোঃ আবুল হোসেন খান	মোঃ এত্তাজ উদ্দিন খান	শহীদ নগর ইসলামপুর	ইসলামপুর
০১১১০২০০১৮	শেখ মোঃ আজিম উদ্দিন	মোঃ পাচু শেখ	কাউন্নাইর	ইসলামপুর
০১১১০২০০১৯	মোঃ করম আলী শেখ	মৃত মোঃ কহি উদ্দিন শেখ	খালকুলা	ইসলামপুর/৩নং
০১১১০২০০২০	মোঃ আঃ ছত্তার খান	মৃত হাচান আলী খান	খোদ্দ মেগচামী	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০২১	মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা	মৃত মোঃ ইউছুফ হোসেন মোল্লা	খোদ্দ মেগচামী	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০২২	মোঃ খোরশেদ আলী	মৃত বাছের মন্ডল	নিশ্চিন্তপুর	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০২৩	মোঃ আনছার আলী মোল্লা	মৃত শের আলী মোল্লা	শালমারা	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০২৪	আঃ লতিফ বিশ্বাস	আজিমউদ্দিন বিশ্বাস	হলুদবাড়ীয়া	ইসলামপুর
০১১১০২০০২৫	মোঃ রেজাউল করিম	মৃত মুন্সি আঃ রাজ্জাক	সাঙ্গুয়া	জামালপুর
০১১১০২০০২৬	শহীদ রোকন উদ্দিন সরকার	মৃত আয়েন উদ্দিন সরকার	স্বর্পবেতাঙ্গ	জামালপুর
০১১১০২০০২৭	মোঃ আবুল কাশেম	মৃত ইদু মন্ডল	কামারদাহ	নবাবপুর
০১১১০২০০২৮	মোঃ আঃ লতিফ বিশ্বাস	মোঃ হামিদুর রহমান বিশ্বাস	চর দক্ষিণ বাড়ী	নবাবপুর
০১১১০২০০২৯	মোঃ কাজী আঃ রাজ্জাক	মৃত কাজী আহম্মদ উল্যা	সোনাপুর	নবাবপুর
০১১১০২০০৩০	মোঃ আবুল খায়ের	এম. এম. ইত্তাজ উদ্দিন	সোনাপুর	নবাবপুর
০১১১০২০০৩১	মোঃ কাওসার উদ্দিন	মৃত মোঃ সহাতুল্যাহ মল্লিক	ভীমনগর	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০৩২	ইস্রাইল মোল্যা	মৃত ইত্তাজ মোল্যা	সাঙ্গুড়া	জামালপুর
০১১১০২০০৩৩	মোঃ হাফিজুর রহমান	মৃত জুলমত আলী মোল্লা	নিশ্চিন্তপুর	ভুমাইন
০১১১০২০০৩৪	মোঃ ইয়াসিন শেখ	মৃত জুলমত আলী মোল্লা	তুলসীবরাট	জামালপুর
০১১১০২০০৩৫	মোঃ আঃ জলিল খাঁন	মৃত মোঃ রুস্তম আলী খাঁন	আলুকদিয়া	জামালপুর
০১১১০২০০৩৬	শহীদ আবুল হোসেন মোল্লা	মোঃ হানু মোল্লা	আলুকদিয়া	জামালপুর
০১১১০২০০৩৭	মোঃ আকমল হোসেন	মৃত জমারত আলী	ইলিশকোল	বহরপুর
০১১১০২০০৩৮	শহীদ মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়া	মৃত হাবিবুল ইসলাম	শোলাকুড়া	জামালপুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০২০০৩৯	মোঃ সিদ্দিক শেখ	মৃত বাহাদুর শেখ	গোসাইগবিন্দপুর	জামালপুর
০১১১০২০০৪০	মোঃ আবুল কালাম সরদার	মোঃ মোয়াজ উদ্দিন সরদার	স্বর্পবেতাঙ্গা	জামালপুর
০১১১০২০০৪১	মোঃ আব্দুস সাত্তার শেখ	মৃত আলী আহম্মদ শেখ	গোসাইগোবিন্দপুর	জামালপুর
০১১১০২০০৪২	মোঃ মতিয়ার রহমান মিয়া	মোঃ আক্তার উদ্দিন মিয়া	গোবিন্দপুর	জামালপুর
০১১১০২০০৪৩	মোঃ নুরুল আমিন ভূইয়া	আঃ খালেক ভূইয়া	শোলাকুড়া	জামালপুর
০১১১০২০০৪৪	ইসমাইল শেখ	মৃত দেয়াজতুল্লা শেখ	গোবিন্দপুর	জামালপুর
০১১১০২০০৪৫	মোঃ আঃ আজিজ	মৃত মোঃ গয়জ উদ্দিন মন্ডল	বাধুলী খালকুলা	জামালপুর ১নং ওয়ার্ড
০১১১০২০০৪৬	মোঃ আঃ রাজ্জাক মিয়া	মোঃ লোকমান আলী মিয়া	কোমরদিয়া	জামালপুর
০১১১০২০০৪৭	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	মোঃ সামসুর রহমান	দুর্গাপুর	জামালপুর
০১১১০২০০৪৮	মোঃ খোয়াজ মন্ডল	মৃত মোঃ খয়জ উদ্দিন মন্ডল	বাধুনী খালকুলা	জামালপুর
০১১১০২০০৪৯	আঃ ওয়াহেদ শিকদার	মৃত তাজু শিকদার	বাধুনী খালকুলা	জামালপুর
০১১১০২০০৫০	নবিয়াল মিয়া	মৃত মোঃ নছউদ্দিন মিয়া	বুমাগুড়া	জামালপুর
০১১১০২০০৫১	ওমর আলী মন্ডল	মৃত বাদল মন্ডল	ভাটিখালকুলা	জামালপুর
০১১১০২০০৫২	শেখ ওয়াহাব আলী	শেখ আনেছ আলী	বাঘশাডাংগা	নারুয়া
০১১১০২০০৫৩	বেলায়েত হোসেন	মৃ: মোঃ সৈয়দ আলী শেখ	বহরপুর	বহরপুর
০১১১০২০০৫৪	মোঃ আলী রেজা	মোকাম্মেল হোসেন	গোহাইলবাড়ী	বহরপুর ২নং
০১১১০২০০৫৫	মোঃ আঃ জব্বার মোল্লা	আঃ আজিজ মোল্লা	তেতুলিয়া	বহরপুর ২নং
০১১১০২০০৫৬	আব্দুল বারী মোল্লা	মৃত আব্দুল করিম মোল্লা	পাটকিয়াবাড়ী	নারুয়া
০১১১০২০০৫৭	মোঃ আব্দুল খালেক মোল্লা	মোঃ মোজাহার উদ্দিন মোল্লা	জাবরকোল	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০৫৮	মোঃ খলিলুর রহমান'	মৃত হাছেন আলী মন্ডল	চর দক্ষিণবাড়ী	নবাবপুর
০১১১০২০০৫৯	আবু সাঈদ বিশ্বাস	মৃত ছানাউদ্দিন	চর দক্ষিণবাড়ী	নবাবপুর
০১১১০২০০৬০	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মৃত আঃ ওহাব বিশ্বাস	চর দক্ষিণবাড়ী	নবাবপুর
০১১১০২০০৬১	সৈয়দ নুর ইসলাম	সৈয়দ বায়তুল্লা	দক্ষিণবাড়ী	নবাবপুর
০১১১০২০০৬২	ফকির আঃ রাজ্জাক	মৃত ফকির আঃ সামাদ	দক্ষিণবাড়ী	নবাবপুর
০১১১০২০০৬৩	এ.এ.এম আব্দুল মতিন	মৃত আব্দুস ছামাদ	নলমদী	নবাবপুর
০১১১০২০০৬৪	মোঃ আঃ খালেক	মৃত আঃ করিম মোল্লা	পাটকিয়া বাড়ী	নারুয়া ১নং
০১১১০২০০৬৫	মোঃ মোকছেদ আলী	আলহাজ্জ কিছমত আলী	ইলিশকোল	বহরপুর
০১১১০২০০৬৬	হারুন অর রশিদ	মোঃ পবন সেখ	ডাঙ্গাহাতী মোহন	জামালপুর ৩নং
০১১১০২০০৬৭	মোঃ আব্দুল কাদের	মৃত আব্দুল করিম মোল্লা	পাটকিয়া বাড়ী	৪নং নারুয়া
০১১১০২০০৬৮	মোঃ আব্দুল বারেক	মৃত আব্দুল করিম মোল্লা	পাটকিয়া বাড়ী	৪নং নারুয়া
০১১১০২০০৬৯	মোঃ আঃ খালেক (আনসার)	মৃত আরশাদ আলী শেখ	বাকসাডাঙ্গী	নারুয়া
০১১১০২০০৭০	শহীদ আজমল হোসেন (পুলিশ)	মৃত এনাতুল্লা মোল্লা	সাঙ্গুড়া	জামালপুর
০১১১০২০০৭১	মোঃ মমিন উদ্দিন মিয়া (পুলিশ)	মোঃ নাজিম উদ্দিন মিয়া	সাঙ্গুড়া	জামালপুর
০১১১০২০০৭২	মোঃ গিয়াস উদ্দিন মিয়া (পুলিশ)	মৃত আলাউদ্দিন মিয়া	সাঙ্গুড়া	জামালপুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০২০০৭৩	মো লুৎফর রহমান (পুলিশ)	মৃত খেজের আহম্মদ মোল্লা	সাঙ্গুড়া	জামালপুর
০১১১০২০০৭৪	শেখ মোঃ রোস্তম আলী (আনসার)	মৃত শেখ আখিল উদ্দিন	সোলাবাড়ীয়া	নারুয়া
০১১১০২০০৭৫	মোঃ নুরুউদ্দিন মোল্লা (সেনাবাহিনী)	মোঃ তছির উদ্দিন মোল্লা	বিলকাটাগোড়া	নারুয়া
০১১১০২০০৭৬	মোঃ হোসেন আলী মোল্লা (সেনাবাহিনী)	মৃত জহির উদ্দিন মোল্লা	বেরুলা	নবাবপুর
০১১১০২০০৭৭	মোঃ হারেজ আলী শেখ (আনসার)	মৃত আছির উদ্দিন শেখ	ফাউন্নাইর	ইসলামপুর
০১১১০২০০৭৮	মোঃ ইসমাইল হোসেন (আনসার)	মৃত রফিকুল ইসলাম	তিলচাঁনপুর	নবাবপুর
০১১১০২০০৭৯	মোঃ খায়রুল বাসার (আনসার)	মৃত আঃ গফুর খান	খোদ্দমেগচামী	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০৮০	জালাল আহমেদ (সেনাবাহিনী)	মৃত নুরুল হক মিয়া	জাবরকোল	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০৮১	খন্দকার মোজাফফর হোসেন (আনসার)	খন্দকার আব্দুল খালেক	বালিয়াকান্দি	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০৮২	শহীদ আঃ মমিন (সেনাবাহিনী)	মৃত মোবারক হোসেন মোল্লা	গোহাইলবাড়ী	বহরপুর
০১১১০২০০৮৩	মোঃ আলাউদ্দিন (সেনাবাহিনী)	মোঃ আজাহার আলী মল্লিক	বেরুলী	নবাবপুর
০১১১০২০০৮৪	মোঃ আঃ হালিম (সেনাবাহিনী)	মৃত ইমান আলী মোল্লা	নলিয়া	নলিয়া জামালপুর
০১১১০২০০৮৫	মোঃ আঃ রহমান মিয়া (সেনাবাহিনী)	মৃত সিরাজ উদ্দিন মিয়া	পদমদী	নবাবপুর
০১১১০২০০৮৬	আব্দুস সামাদ মোল্লা (আনসার)	মৃত শমসের আলী মোল্লা	বামারবেতাঙ্গা	বহরপুর
০১১১০২০০৮৭	আঃ জব্বার মোল্লা (আনসার)	মৃত নজির মোল্লা	ভাঙ্গাহাতি মোহন	জামালপুর
০১১১০২০০৮৮	শেখ আব্দুল আজিজ (আনসার)	মৃত ইয়ারদ্দিন	খদ্দমেগচামি	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০৮৯	শফিকুল আলম খান (সেনাবাহিনী)	মৃত ইদ্রিস আলী খান	নলিয়া গ্রাম	জামালপুর
০১১১০২০০৯০	মোঃ নুরুল আমিন (ই.পি.আর)	মৃত আঃ সোবহান	ত্রিলচানপুর	নবাবপুর
০১১১০২০০৯১	সৈয়দ আহম্মদ চৌধুরী (ই.পি. আর)	মৃত সুজায়েত উল্যা চৌধুরী	সোনাপুর	নবাবপুর
০১১১০২০০৯২	মোঃ ইয়াছিন শেখ (সেনাবাহিনী)	মৃত সিরাজ শেখ	তুলসিবরাট	জামালপুর
০১১১০২০০৯৩	মোঃ সিরাজুল ইসলাম (সেনাবাহিনী)	মৃত শেখ আখিল উদ্দিন	শোলাবাড়ীয়া	নারুয়া
০১১১০২০০৯৪	ফারুক আহমদ (সেনাবাহিনী)	মৃত ডাঃ এ. কে. এম আজিজুল ইসলাম	গোহাইলবাড়ী	বহরপুর
০১১১০২০০৯৫	আহাদ আলী	মৃত আছমত আলী মন্ডল	তালতলা	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০৯৬	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত ধতু লস্কর	অলংকারপুর	জঙ্গল ১ নং ওয়ার্ড
০১১১০২০০৯৭	গোলাম মোস্তফা	মৃত আফসার উদ্দিন মোল্লা	অলংকারপুর	জঙ্গল ১নং ওয়ার্ড
০১১১০২০০৯৮	শহীদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত হারেজ মোল্লা	পাইককান্দি	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০০৯৯	শহীদ মোঃ আঃ মোতালেব মিয়া	মৃত মোবারক হোসেন মিয়া	পাইককান্দি	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০১০০	মোঃ আব্দুল জলিল মিয়া	মোঃ হায়দার আলী মিয়া	শালমারা	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০১০১	মোঃ তোফাজ্জল	মোঃ জোনাব আলী মন্ডল	শোলাবাড়ীয়া	নারুয়া
০১১১০২০১০২	মোঃ আঃ হাই	মৃত মুন্সী ইয়ার উদ্দিন	নারুয়া	নারুয়া ৪নং
০১১১০২০১০৩	এস. এম. আজাহার আলী	এস. এম. এমারত হোসেন	ছোটঘিকমলা	নারুয়া
০১১১০২০১০৪	মোঃ আব্দুল খালেক	মৃত কমরদ্দিন মন্ডল	ঘিকমলা	নারুয়া
০১১১০২০১০৫	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত মুন্সি ইয়ার উদ্দিন আহম্মেদ	নারুয়া	নারুয়া

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০২০১০৬	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	আঃ গফুর	নারুয়া	নারুয়া
০১১১০২০১০৭	আঃ রব মোল্লা	মঙ্গল মোল্লা	দিয়ারা	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০১০৮	আঃ হান্নান মোল্লা	মৃত আছমত মোল্লা	দিয়ারা	বালিয়াকান্দি ৫নং ওয়ার্ড
০১১১০২০১০৯	মোঃ ফজলুর রহমান	মৃত সাহিদুর রহমান মিয়া	শামুকখোলা	ইসলামপুর
০১১১০২০১১০	মোঃ অখিল উদ্দিন বিশ্বাস	মৃত গাওছোল আজম বিশ্বাস	চরদক্ষিন বাড়ী	নবাবপুর
০১১১০২০১১১	আক্কাছ আলী মৃধা	মৃত মাছিম মৃধা	খোদমেগচামী	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০১১২	আঃ বারেক শেখ	মৃত করিম শেখ	ইলিশকোল	নবাবপুর
০১১১০২০১১৩	নৃপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	মৃত উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	ঢোলজানী	জঙ্গল
০১১১০২০১১৪	মোঃ ওমর আলী	মৃত গওহার উদ্দিন	অলংকারপুর	জঙ্গল
০১১১০২০১১৫	মৃত মোঃ সামছুল আলম	মৃত আছমত আলী ফকির	শালমারা	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০১১৬	মোঃ নওশের মিয়া	মৃত মফিজ উদ্দিন মিয়া	ডোখাকমলা	নারুয়া
০১১১০২০১১৭	নরেনুদ্দিন আহম্মদ	মৃত আখের আলী মন্ডল	শোলাবাড়ীয়া	নারুয়া
০১১১০২০১১৮	আঃ রাজ্জাক মোল্লা	মোঃ ইয়াদ আলী মোল্লা	নারুয়া	নারুয়া
০১১১০২০১১৯	মোঃ আঃ মাজেদ	মৃত মোঃ কুরাত আলী শেখ	নারুয়া	নারুয়া
০১১১০২০১২০	মোঃ আতাউর রহমান	মৃত বাছের আলী মন্ডল	চাষাবিলা	নারুয়া
০১১১০২০১২১	আফতাব উদ্দিন মিয়া	মৃত আবুল হোসেন মিয়া	শামুকবেলা	ইসলামপুর
০১১১০২০১২২	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মোঃ দরবেশ মোল্লা	বারাদী	ইসলামপুর ৩
০১১১০২০১২৩	আঃ জব্বার শেখ	মৃত অছির উদ্দিন	বাওপাড়া	বালিয়াকান্দি
০১১১০২০১২৪	মৃত এস. এম আলম	মৃত মোঃ আজগর আলী	খালকুলা	ইসলামপুর
০১১১০২০১২৫	শহীদ মোঃ আনোয়ার	মৃত তারিক উল্যা মোল্লা	রাজধরপুর	ইসলামপুর
০১১১০২০১২৬	কে. এম. আল. মামুনুর রশিদ	মৃত কে. এম সামছুল হক	বাওপাড়া	ইসলামপুর ২
০১১১০২০১২৭	মোঃ ওজি উল্যা সিকদার	দুদু মোঃ সিকদার	চরদক্ষিণ বাড়ী	নবাবপুর
০১১১০২০১২৮	ফরহাদ হোসেন	ফখরুদ্দিন আহমেদ	সোনাপুর	নবাবপুর
০১১১০২০১২৯	শ্রী অখিল কুমার রায়	মৃত অনাথ বন্ধু রায়	সোনাপুর	নবাবপুর ১
০১১১০২০১৩০	মোঃ ওয়াছের মোল্লা	মোঃ ফাগু মোল্লা	চরদক্ষিণবাড়ী	নবাবপুর
০১১১০২০১৩১	মৃত আঃ জলিল মিয়া	মৃত মোঃ তুজাম্বর মিয়া	আলোকদিয়া	জামালপুর ৩
০১১১০২০১৩২	মোঃ জমারত শেখ	মৃত কছিল উদ্দিন শেখ	সাঙ্গুরা	জামালপুর
০১১১০২০১৩৩	মোঃ আঃ গফুর	মহিউদ্দিন মোল্লা	রাজধরপুর	ইসলামপুর
০১১১০২০১৩৪	মোঃ আকবর আলী	মৃত আছমত আলী মোল্লা	দিয়ারা	ইসলামপুর
০১১১০২০১৩৫	মোঃ মোখলেছুর রহমান	মৃত সাইদুর রহমান মিয়া	শামুকখোলা	ইসলামপুর
০১১১০২০১৩৬	আবু জাফর	মৃত মোঃ নওসের আলী শেখ	রাজধরপুর	ইসলামপুর
০১১১০২০১৩৭	মোঃ বেলায়েত হোসেন	মোঃ চান মিয়া মোল্লা	রাজধরপুর	ইসলামপুর
০১১১০২০১৩৮	মোঃ ফজলুল হক মিয়া	মৃত আঃ করিম মিয়া	শাওনাড়ী	ইসলামপুর ২
০১১১০২০১৩৯	মোঃ আঃ হান্নান	মৃত আঃ মজিদ	রাজধরপুর	ইসলামপুর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	গ্রাম/মহল্লা	ইউপি/ পৌরসভা
০১১১০২০১৪০	মোঃ আবুল কালাম মিয়া	মোঃ রফিক উল্যা মিয়া	বেড়াডাঙ্গা	ইসলামপুর
০১১১০২০১৪১	মোঃ আঃ গফুর	মৃত মহিরউদ্দিন	রাজধরপুর	ইসলামপুর
০১১১০২০১৪২	শাহ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	মৃত শাহ মহরব আলী	হরিফোল	ইসলামপুর ১
০১১১০২০১৪৩	মোঃ আবুল হোসেন শেখ	মোঃ মেছের শেখ	রাজধরপুর	ইসলামপুর
০১১১০২০১৪৪	মোঃ আঃ জলিল শেখ	মৃত তেজারত শেখ	রাজধরপুর	ইসলামপুর
০১১১০২০১৪৫	মোঃ আঃ গফুর মোল্লা	বাবু আলী মোল্লা	দিয়ারা	ইসলামপুর
০১১১০২০১৪৬	আকবর আলী মন্ডল	মৃত ঝড়ু মন্ডল	বাঁধুনীখালপুর	জামালপুর ১
০১১১০২০১৪৭	আবুল কাসেম মোল্লা	মৃত জছি মোল্লা	গোসাইগবিন্দপুর	জামালপুর
০১১১০২০১৪৮	মোঃ আবু তালেব	মৃত মোঃ কলিমউদ্দিন শেখ	সোনাপুর	নবাবপুর
০১১১০২০১৪৯	মোঃ আলী	মৃত গোলফাত মন্ডল	সোনাপুর	নবাবপুর
০১১১০২০১৫০	মোঃ আসকর আলী	মৃত সাজরউদ্দিন শেখ	সোনাপুর	নবাবপুর
০১১১০২০১৫১	সুলতান উদ্দিন আহমেদ	মৃত হাজী আবসার উদ্দিন আহমেদ	কমলাপুর	২নং ঝিলটুলী
০১১১০২০১৫২	মোঃ আকতারুজ্জামান	মৃত আকবর হোসেন বিশ্বাস	সোনাপুর	নবাবপুর
০১১১০২০১৫৩	মোঃ নুরুল ইসলাম	মৃত লোকমান মিয়া	গুগুলফণ দিয়া	জামালপুর
০১১১০২০১৫৪	মোঃ লোকমান শেখ	মৃত কাসেম শেখ	খামারমাগুড়া	জামালপুর
০১১১০২০১৫৫	হারুন অর রশিদ মিয়া	মৃত আঃ অহেদ মিয়া	দাবনীপাড়া	জামালপুর
০১১১০২০১৫৬	মোঃ ফজলুর রহমান	মৃত জয়ধর আলী	বাকসিরডাঙ্গী	জামালপুর
০১১১০২০১৫৭	মোঃ নাদের হোসেন মিয়া	মৃত হাতেম আলী মিয়া	গোবিন্দপুর	জামালপুর
০১১১০২০১৫৮	মোঃ সিরাজ খান	মৃত মোঃ আব্দুল কাদের খান	স্বর্পবেতাঙ্গা	১নং/জামালপুর
০১১১০২০১৫৯	মোঃ আব্দুল রাজ্জাক খান	মৃত ডাঃ মোঃ আফসার উদ্দিন খান	স্বর্পবেতাঙ্গা	জামালপুর ১
০১১১০২০১৬০	কাজী জুমারত	মৃত মতি কাজী	গোবিন্দপুর	জামালপুর ১
০১১১০২০১৬১	মোঃ আঃ আজিজ মোল্লা	মৃত বিত্ত সেখ	হাতিমোহন	জামালপুর
০১১১০২০১৬২	মোঃ খলিলুর রহমান	মৃত গোলাম রহমান মিয়া	বাকসিরডাঙ্গী	জামালপুর
০১১১০২০১৬৩	আঃ ওহেদ শেখ	মৃত হাকিম শেখ	জাঙ্গাহাতি মোহন	জামালপুর
০১১১০২০১৬৪	মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	মৃত খোরশেদ শেখ	গোসাইগোবিন্দপুর	জামালপুর
০১১১০২০১৬৫	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মৃত হাবিবুল ইসলাম	শোলাকুড়া	জামালপুর ১
০১১১০২০১৬৬	মোঃ গিয়াস উদ্দিন মৃধা	বিলায়েত মৃধা	বাধুলীখালবুলা	জামালপুর
০১১১০২০১৬৭	মোছাঃ আলেয়া বেগম	স্বামী মুন্সি রেজাউল করিম	সান্দুরা	জামালপুর ২
০১১১০২০১৬৮	মৃত আনোয়ার হোসেন মোল্লা	মৃত মোনসার উদ্দিন মোল্লা	সান্দুরা	জামালপুর ২
০১১১০২০১৬৯	মৃত মোঃ মকসুল মোল্লা	মৃত মাহমুদ মোল্লা	দাবনীপাড়া	জামালপুর
০১১১০২০১৭০	মৃত আমজাদ হোসেন	মৃত মোঃ আছির উদ্দিন	সোনাইডাঙ্গী	জামালপুর ৩
০১১১০২০১৭১	আঃ হাই মিয়া	মৃত আঃ হাকিম মিয়া	দাবনীপাড়া	জালিয়াকান্দি
০১১১০২০১৭২	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মৃত আব্দুল হোসেন	বাকসিরডাঙ্গী	জামালপুর ২
০১১১০২০১৭৩	খন্দকার আমজাদ আলী	মৃত খন্দকার আহসান আলী	পদমলী	নবাবপুর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী শক্তি.'শান্তি কমিটি' গঠনঃ-

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর কতিপয় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল পাকিস্তান সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসে। ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭১ নুরুল আমিনের নেতৃত্বে গোলাম আজম ও খাজা খয়ের উদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজনৈতিক সহায়তা দানের আশ্বাস প্রদান করেন এবং 'নাগরিক কমিটি' গঠন করার প্রস্তাব পেশ করেন। ৬ই এপ্রিল গোলাম আজম ও হামিদুল হক চৌধুরী টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'নাগরিক শান্তি কমিটি' গঠনের প্রস্তাব দেন। ৯ই এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে ১৪০ সদস্য নিয়ে ঢাকায় 'নাগরিক শান্তি কমিটি' গঠন করা হয়। মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে এই কমিটি তার কার্যকলাপ শুরু করে। ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১ এই কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'শান্তি কমিটি' রাখা হয় এবং দেশের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। রাজাকার নির্বাচন, নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব ছিল।[৫]

রাজাকার বাহিনী গঠনঃ- লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স' ৭১, জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্সের ক্ষমতা বলে ১৯৫৮ সালের আনসার এ্যাক্ট বাতিল ঘোষণা করা হয়। আনসার মুজাহিদ বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য মুক্তিযুদ্ধে অংগ্রহণ করায় সরকার নতুন আইন জারি করতে বাধ্য হয়। এই ক্ষমতা বলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল সক্ষম ব্যক্তিকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অস্ত্রে সজ্জিত করা হবে বলে জানানো হয়। আনসার বাহিনীর সরকার অনুগত অফিসারবৃন্দ "রাজাকার অফিসার" বলে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞে অবতীর্ণ হওয়ার পর সেনাবাহিনী, ই. পি. আর. পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, শ্রমিক, যুবক ও সকল স্তরের দেশপ্রেমিক দেশবাসীর সমন্বয়ে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। জানা যায় যে, ৪ঠা এপ্রিল জামায়াতে ইসলামী নেতা গোলাম আজম পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খানের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং ৯ই এপ্রিল পুনরায় টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি ছাত্র-যুবক সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি সহযোগী বাহিনী সৃষ্টির পরামর্শ দেন এবং পাকিস্তান সরকার গোলাম আজমের পরামর্শ গ্রহণ করে রাজাকার বাহিনী গঠন অধ্যাদেশ জারি করে। ১৯৭১ সালের মে মাসে মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফের নেতৃত্বে ৯৬ জন জামাত কর্মী নিয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে প্রথম এই বাহিনী গঠিত হয়। মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ এই বাহিনীর নামকরণ করেন "রাজাকার"। জুন মাসের সরকারী অধ্যাদেশে এই নাম রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান মোঃ ইউসুফকে রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়।

৫। এ. এস. এম সামছুল আরেফিন "মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান" (ঢাকা ১৯৯৫),

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক অবস্থায় দশটি জেলায় ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতাদের রাজাকার বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়। এ্যাডজুট্যান্ট বা কোম্পানি কমান্ডার থেকে নিচের স্তরের সকলেই রাজাকার কমান্ডারদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। কিন্তু উপরের স্তরের সকলেই ছিল ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। শান্তি কমিটির মাধ্যমে রাজাকারদের রিক্রুট করা হতো। এই বাহিনীর বেশির ভাগ সদস্যই মাদ্রাসার মোহাদ্দেস ও মোদাছেছর ছিল। দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য ছাড়াও বহু গ্রামের যুবককেও এই বাহিনীতে ভর্তি করা হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাজাকার বাহিনীর প্রশিক্ষণ পরিচালিত হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের মাঠ ও ফিজিক্যাল কলেজের মাঠে মূলতঃ রাজাকারদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল দেড় থেকে দুই সপ্তাহ ছিল। প্রশিক্ষণ শেষে রাজাকারদের হাতে ৩০৩ রাইফেল তুলে দেয়া হতো। শুধু উচচ স্তরের কমান্ডারদের জন্য ষ্টেনগান বরাদ্দ দেয়া হতো।[৫]

রাজাকারদের শপথ নামা

Form of Oath
(Rule-16)

. . . . . S/o . . . . . Address . . . . . .
vill : . . . . . P.O: . . . . . Dist. . . . . .

do solemnly declare that from this moment I shall faithfully follow the injunctions of my religion, and dedicate my life to the service of my society and country . I shall obey and carryout all lawful orders of my superiors. I shall bear true allegience to the constitution of Pakistan as formed by law and shall defend Pakistan, if necessary with my life.[৬]

Signature

পৃষ্ঠা-৮৪।

৬। এ. এস. এম সামছুল আরেফিন "মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান" (ঢাকা-১৯৯৫), পৃষ্ঠা-৪০৬,৪০৯।

৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ক। **বাংলা গ্রন্থ** ঃ-

১। আবুল কাশেম ফজলুল হক, মুক্তি সংগ্রাম, (ঢাকা-১৯৯৪)

২। আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, (ঢাকা-১৯৯৪)

৩। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, (ঢাকা-১৯৯৪)

৪। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী, (ঢাকা-১৯৯১)

৫। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও সাহিদা বেগম(সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী, (ঢাকা-১৯৯৮)

৬। আবু তালেব মিঞা, বাংলার গুণীজন, (ঢাকা-১৯৯৪)

৭। আসাদ চৌধুরী ও এনামুল কবির (সম্পাদিত), যাদের রক্তে মুক্ত এদেশ, (ঢাকা-১৯৯১)

৮। আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে (১৯৯০)।

৯। আসাদুজ্জামান আসাদ, মুক্তির সংগ্রামে বাংলা, (ঢাকা-১৯৯৭)।

১০। আ.ন.ম.রইছ উদ্দিন (সম্পাদিত), মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস, (১৯৮৭)।

১১। আ.ন.ম. আবদুস সোবহান, ফরিদপুরের কবি সাহিত্যিক, (ঢাকা-১৩৭৬ B.S)

১২। এ.এফ. সালাহ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, (ঢাকা-১৯৯১)।

১৩। এ.এফ.সালাহ উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নানা প্রসঙ্গ, (ঢাকা-১৯৯৬)।

১৪। এম.আর.আখতার মুকুল, আমি বিজয় দেখেছি, (অগ্রহায়ন-১৩৯১)।

১৫। এমাজ উদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, (ঢাকা-)

১৬। এ.এস.এম.সামছুল আরেফিন, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, (ঢাকা-১৯৯৫)

১৭। কমান্ডো মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধ ও নৌকমান্ডো অভিযান, (ঢাকা-১৯৯৭)

১৮। কামরুদ্দিন আহমদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি।

১৯। তমিজ উদ্দিন খান, কালের পরীক্ষা ও আমার জীবনের দিনগুলি, (ঢাকা-১৯৯৩)

২০। তপন কুমার দে, মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ, (ঢাকা-১৯৯৮)।

২১। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলিকাতা।

২২। বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি।

২৩। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, (অষ্টম খন্ড)।

২৪। মেজবাহ কামাল, শ্রেণী দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, (ঢাকা-১৯৭৪)।

২৫। মৈত্রেয়ী দেবী, এত রক্ত কেন, (কলকাতা-১৯৮৫)।

২৬। রেহমান সোবহান, বাংলাদেশের অভ্যুদয়-একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, (ঢাকা-১৯৯৪)

২৭। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস(প্রথম খন্ড), (ঢাকা-১৯৯৩)

২৮। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা, (ঢাকা-১৯৮২)

খ। **ইংরেজী গ্রন্থ** ঃ-

1. Abdul Momin chowdhury, Dynastic History of Bengal (Dhaka-1967)
2. Ayub khan, Friends not Masters, (Lahore-1967)
3. Bangladesh District Gazetteers, Faridpur, 1977
4. Gautam Chattopadhyah (Editor), Bengal: Early Nineteenth Century (Calcutta-1978)

Dhaka University Institutional Repository

5. J. C. Jack, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Faridpur, (Calcutta-1916)
6. Muzaffar Ahmed Chowdhury, Rural Government in East Pakistan, (Dhaka-1969)
7. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, vol.v-Districts of Dhaka , Bakarganj, Faridpur and Maimansing (London-1875)

(গ) সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত পুস্তিকা ঃ-

১। বাংলাদেশ পপুলেশন সেনসাস (রাজবাড়ী জেলা), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৯৫।
২। ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, কৃষি মন্ত্রণালয়।

(ঘ) স্মরণিকা

১। চন্দনা, পাংশা থানা সমিতি, ১৯৯৯
২। প্লাটিনাম জুবিলী সংখ্যা, হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ উচ্চ বিদ্যালয়-১৯৯৩
৩। রাজবাড়ী দর্পণ, রাজবাড়ী জেলা সমিতি, ১৯৮৯
৪। স্মরণিকা, রাজবাড়ী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষ পুর্তিসংখ্যা -১৯৯৩

(ঙ) পত্র-পত্রিকা

১। জনকণ্ঠ (দৈনিক), ২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৯ সংখ্যা
২। ভোরের কাগজ (দৈনিক), ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যা
৩। সহজ কথা (দৈনিক), রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত, ৫ই এপ্রিল, ১৯৯৬ সংখ্যা
৪। রাজবাড়ী কণ্ঠ (সাপ্তাহিক), রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৯ সংখ্যা
৫। অনুসন্ধান (সাপ্তাহিক), রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সংখ্যা
৬। মুক্তি বার্তা (সাপ্তাহিক), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ সংখ্যা

(চ) সাক্ষাৎকার

১। জনাব শাহ মোহাম্মদ ফরিদ, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২। জনাব আকবর হোসেন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিসিক, রাজবাড়ী
৩। বাবু চিত্তরঞ্জন গুহ, সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি, রাজবাড়ী
৪। জনাব ফকীর আব্দুল জব্বার, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, রাজবাড়ী
৫। জনাব কাজী ইরাদত আলী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রাজবাড়ী
৬। বাবু সমীরেন্দ্র মোহন গুহ রায় (রাজা সূর্যকুমারের পৌত্র), রাজবাড়ী
৭। জনাব আবু তালেব, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, রাজবাড়ী

Dhaka University Institutional Repository

৮। জনাব বাকাউল আবুল হালেম, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, রাজবাড়ী
৯। জনাব খেলাফত হোসেন , বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, রাজবাড়ী
১০। জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ, রাজবাড়ী
১১। জেলা আনসার এ্যাডজুট্যান্ট রাজবাড়ী
১২। জেলা তথ্য অফিস কর্তৃপক্ষ, রাজবাড়ী
১৩। জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ, রাজবাড়ী
১৪। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ, রাজবাড়ী
১৫। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা ইউনিট কমান্ড কর্তৃপক্ষ, রাজবাড়ী
১৬। উপাধ্যক্ষ, বালিয়াকান্দি কলেজ, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী
১৭। হাবাসপুর কাশিম বাজার রাজ উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পাংশা, রাজবাড়ী